তুর্কীদের অবস্থান ছিল সেই য়ূরোপ ভূখণ্ডে নিকট ভবিষ্যতে যে ভূখণ্ডটি বিরাট গুরুত্ব ও অবস্থানগত মর্যাদা লাভ করতে যাচ্ছিল। জীবনের শক্তি-সামর্থ্য ও উন্নতি-অগ্রগতির যাবতীয় উপাদান-উপকরণ তার মধ্যে উথাল-পাতাল করছিল। যদি আল্লাহ্ পাক তৌফিক দিতেন তাহলে তুর্কীদের পক্ষে ইল্‌ম ও আক্‌ল তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে অগ্রসর হয়ে য়ূরোপের খ্রিস্টান জাতিগোষ্ঠীর বিজয়ী হয়ে বিশ্ব নেতৃত্বের বাগডোর হাতে তুলে নেবার আগেই বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়ে গোটা দুনিয়াকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো এবং তাকে সত্য ও হেদায়েতের প্রশস্ত মনযিল অভিমুখে পরিচালিত করা সম্ভব ছিল-যে সত্য ও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা (হেদায়েত)-এর উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা তারা ইসলামের বদৌলতে লাভ করেছিল।

## তুর্কীদের অধঃপতন

কিন্তু তুর্কী জাতির বরং মুসলিম জাতির ততোধিক দুর্ভাগ্য যে, উন্নতি-অগ্রগতি ও উত্থান যুগেই তুর্কীদের পতন শুরু হয়ে যায় এবং প্রাচীন জাতিগুলোর পুরাতন রোগ-ব্যাধিতে তারাও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের পরস্পরের ভেতর হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা দেখা দিল। সুলতান স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে লাগলেন। শাসকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিগড়ে যায়। চারিত্রিক অধঃপতন শুরু হয়ে যায়। প্রশাসকবৃন্দ ও সিপাহসালার জাতি ও সাম্রাজ্যের সঙ্গে বেঈমানী ও গাদ্দারী করতে থাকে। জাতির মধ্যে আরামপ্রিয়তা ও আয়েশী জীবনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হতে থাকে। মোটের ওপর পতনোন্মুখ জাতির সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি হয়ে যায় যে সবের বিস্তারিত বিবরণ তুর্কিদের ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে মিলবে। এখানে সেসব পেশের সুযোগ নেই।[১]

## তুর্কী জাতির স্থবিরতা ও পশ্চাদ্‌পদতা

সবচে' বড় যে রোগটি তুর্কীদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা হল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে জড়তা ও স্থবিরতা এবং সমরশাস্ত্র, সামরিক সংগঠন ও উন্নতি-অগ্রগতির ক্ষেত্রে তারা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল কুরআন মজীদের আয়াতঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ - اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ -

"তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে; এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং

১. ফালসাফা-ই তারীখুল ইসলামী, মুহাম্মদ জামীল বেইহামকৃত, ২৮০-১ পৃ.।



এ ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না। আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন।" (সূরা আনফাল : ৬০)

এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের এই বাণীও যেন তাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছিল ঃ الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو احق بها। "প্রজ্ঞা মু'মিনের হারানো সম্পদ: যেখানে তা পাবে সেই হবে তার সর্বাধিক হকদার।"[১] এমতাবস্থায় যখন তারা য়ূরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রসমূহ ও জাতি-গোষ্ঠীগুলোর মাঝে ঘেরাও অবস্থায় ছিল তখন তাদের মিসর বিজয়ী হযরত আমর ইবনু'ল-আস (রা)-এর সেই উপদেশ সব সময় স্মরণ রাখা দরকার ছিল যা তিনি মিসরের মুসলমানদের দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা কখনো এ কথা ভুলবে না, তোমরা কিয়ামত অবধি বিপদের মুখোমুখী অবস্থায় রয়েছে এবং এক গুরুত্বপূর্ণ পথের প্রান্তদেশের ওপর দাঁড়িয়ে আছ। এজন্য তোমাদেরকে সব সময় হুঁশিয়ার থাকতে হবে, সদাসতর্ক থাকতে হবে, সশস্ত্র অবস্থায় থাকতে হবে। কেননা তোমাদের চতুর্দিকে শত্রু। তাদের শ্যেন দৃষ্টি রয়েছে তোমাদের ওপর, তোমাদের দেশের ওপর।"

কিন্তু নিতান্তই আফসোসের বিষয়, তুর্কীরা নিশ্চিন্তে বসে রইল। স্বস্থানে নিশ্চেষ্ট গয়ে আসন গেড়ে রইল। অপর দিকে য়ূরোপীয় জাতিগোষ্ঠী কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌঁছল।

প্রখ্যাত তুর্কী মনীষী খালেদা এদীব খানম তুর্কীদের এই জ্ঞান ও শিক্ষারাজ্যের স্থবিরতা সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করেছেন। তিনি বলেনঃ

"পৃথিবীর ওপর যতদিন মুতাকাল্লিম (কালামশাস্ত্রবিদ)-দের দর্শনের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল তুরস্কের জ্ঞানী-গুণী ও উলামায়ে কিরাম নিজেদের কাজ নেহায়েত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে থাকেন। সুলায়মানিয়া মাদরাসা ও সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ মাদরাসা সে সময় প্রচলিত সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিষয় শাস্ত্রের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জগত কালাম শাস্ত্রের শেকল ভেঙে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তি স্থাপন করল যা দুনিয়ার জীবনে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল তখন আলিম-উলামা সম্প্রদায় শিক্ষকতার দায়িত্বপালনের আর যোগ্য রইলো না। তারা মনে করতেন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান যেই অবস্থানে ছিল সেখান থেকে তা আর এক-কদমও সামনে অগ্রসর হয়নি। এ ধরনের ধারণা ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় জেঁকে বসে থাকে। তুরস্ক এবং অপরাপর মুসলিম দেশগুলোর আলিম-উলামার এ ধরনের ধ্যান-ধারণা ইসলামী প্রেরণার সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ রাখে না। কালাম শাস্ত্রীয় দর্শন কিংবা ইলমে

১. তিরমিযী-ইলম: হাদীস ২৮২৭।

কালাম চাই তা খ্রিস্টানদের হোক অথবা মুসলমানদের– গ্রীক দর্শনের ওপর স্থাপিত। এর ওপর কমবেশি এরিস্টোটলের চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা প্রভাব জাঁকিয়ে আছে। এরিস্টোটলের এই দর্শন ছিল পৌত্তলিক দর্শন। এখানে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে খ্রিস্টান পণ্ডিত ও মুসলিম আলিম-উলামার চিন্তাধারা ও পদ্ধতির পারস্পরিক তুলনার প্রয়োজন অনুভব করছি।

"কুরআনুল করীমে প্রাকৃতিক জগত সৃষ্টি সম্পর্কে কোথাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা নেই। এর শিক্ষায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নৈতিক ও সামাজিক জীবনের ওপর। এর বিশেষ লক্ষ্য হল ভাল-মন্দ এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে প্রভেদ তুলে ধরা। কুরআনুল করীম পৃথিবীর মানুষদের জন্য একটি কর্ম-বিধান একটি জীবন-বিধান নিয়ে এসেছে। মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি সম্পর্কে যা কিছু এতে বলা হয়েছে সেখানেও কোন প্রকার জটিলতা কিংবা ঘোরপ্যাঁচ নেই। এর বুনিয়াদী শিক্ষা হলো তৌহীদের শিক্ষা, একত্ববাদের শিক্ষা। আর এজন্যই ইসলাম অত্যন্ত সহজ সরল ধর্ম এবং ইসলামে অপর ধর্মের তুলনায় প্রকৃতিগত সম্পর্কে নতুন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার অনেক বেশি অবকাশ ছিল। কিন্তু অনাড়ম্বর, সহজ সারল্য ও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি যা নতুন জ্ঞানগত গবেষণার জন্য এতটা অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে বেশি দিন থাকতে পারে নি। নবম শতাব্দীর আলিম-উলামা ও কালামশাস্ত্রবিদগণ কেবল ফিক্‌হ শাস্ত্রকেই নয় বরং ঐশী দর্শন তথা ধর্মতত্ত্বকেও মূলনীতি ও আইনের শেকলে বেঁধে ফেলে। ফলে গবেষণা ও ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক সে সময় মুসলিম দর্শনের মধ্যে এরিস্টোটলীয় দর্শন ও ধ্যান-ধারণা অনুপ্রবিষ্ট হয়।

"এর বিপরীতে খ্রিস্ট ধর্মে যাকে ঈসা মসীহ (আ)র ধর্ম না বলে সেন্ট পলের ধর্ম বলাই অধিকতর সঙ্গত– পৃথিবী সৃষ্টির ভেতর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্তমান। খ্রিস্টানরা একে আল্লাহ্‌র বাণী হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল। এজন্য তাদের ওপর এই দায়িত্ব বর্তাত যে, এই বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যার সত্যতা তারা প্রমাণ করবে। এই মনগড়া ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ লব্ধ সত্য তাদের ব্যাখ্যা সমর্থন করত না। এ জন্যই তাদেরকে প্রমাণপঞ্জীর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। দার্শনিক এরিস্টোটলের দ্বারস্থ তাদেরকে এ জন্যই হতে হয় যে, তাদের যুক্তি ইন্দ্রজালের বেশি কিছু ছিল না।

"পাশ্চাত্য জগত যখন প্রকৃতির অধ্যয়ন পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে করতে শুরু করল তখন গির্জার পোপ-পাদরীদের হুশ-জ্ঞান লোপ পাবার দশা। এদিকে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য বড় বড় আবিষ্কার-উদ্ভাবন হতে লাগল আর ওদিকে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের মনে ভীতির সৃষ্টি হলো যে, এবার গির্জার রাজত্ব শেষ হবার পালা।



অনন্তর পাশ্চাত্য জগতে এমন এক যুগের সূচনা হলো যে যুগে বড় বড় বিজ্ঞানী যারা প্রকৃতি জগতের গণ্ডীর মধ্যে থেকে গবেষণায় মগ্ন ছিলেন– হত্যা করা হতো।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টান গির্জাকেই আপোষকামিতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। গির্জা তার স্কুল ও ধর্মীয় পাঠশালা-গুলোর সিলেবাসে বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, যা আগে একেবারেই ইসলামী মাদরাসাগুলোর মতই ছিল বিজ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু এরই সাথে সাথে সে ইন্দ্রিয়াতীত দর্শনকেও পরিত্যাগ করেনি। ফল হলো এই যে, গির্জার প্রভাব শিক্ষিত শ্রেণীর ওপর ন্যূনতম পক্ষে একটি অংশের ওপর বহাল থাকে। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট পাদরীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই নতুন শাখাগুলোতে পারদর্শী হতেন এবং নতুন যুগের যুবকদের সঙ্গে যে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে পারতেন।

"উছমানীদের এখানে আলিম-উলামার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। তারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভের প্রতি আদৌ দৃকপাত করে নি বরং নতুন চিন্তাধারা ও ধ্যানধারণা তাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয়নি। যতদিন পর্যন্ত মুসলিম মিল্লাতের শিক্ষার চাবিকাঠি তাদের হাতে ছিল ততদিন সাধ্য কিযে নতুন কোন কিছু এর কাছে ঘেষে। ফল দাঁড়াল এই যে, তাদের জ্ঞানের ওপর স্থবিরতা ও জড়তা জেঁকে বসে। এদিকে পতন যুগে তাদের রাজনৈতিক ব্যস্ততা এতটা বৃদ্ধি পায় যে, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ঝামেলায় জড়াবার মত তাদের ফুরসত ছিল না। সোজা প্রেসক্রিপশন ছিল এই যে, এরিস্টোটলের দর্শনের ওপর আসন গেড়ে বস এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বুনিয়াদ দলীল-প্রমাণের ওপর থাকতে দাও। অনন্তর ইসলামী মাদরাসাগুলোর ঊনবিংশ শতাব্দীতেও সেই রঙই টিকে থাকে যা ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।"

## মুসলিম বিশ্বের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানগত অধঃগতি

জ্ঞানগত জড়তা ও স্থবিরতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাদপদতা সে সময় কেবল তুর্কীদের শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী ও ধর্মীয় মহলেরই বৈশিষ্ট্য ছিল না, বরং পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম বিশ্বই এক জ্ঞানগত বিপর্যয়ের শিকার ছিল। তাদের মস্তিষ্ক ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত এবং তাদের স্বভাব-প্রকৃতি নিভু নিভু প্রায় দৃষ্টিগোচর হতো। জড়তা ও বিষণ্নতা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আকাশকে ছেয়ে রেখেছিল। আমরা যদি সতর্কতার সাথে অষ্টম শতাব্দী থেকে এই বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাদ্পদতার সূচনা না ধরি, তবুও এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, হিজরী ৯ম শতাব্দীই ছিল শেষ শতাব্দী যখন চিন্তার ক্ষেত্রে নতুনত্ব, ইজতিহাদী তথা উদ্ভাবনী শক্তি এবং সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে ও শিল্পকলায় শ্রেষ্ঠত্ব ও সৃষ্টিশীলতার

চিহ্ন চোখে পড়ে। এটাই ছিল সেই শতাব্দী যেই শতাব্দীতে ইবনে খালদূনের মুকাদ্দিমার ন্যায় গ্রন্থ মুসলিম জাহান লাভ করে। হি. ১০ম শতাব্দীতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উদাসীনতা ও নির্জীবতা, অন্ধ আনুগত্য তথা তাকলীদ ও অনুকরণের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। এই উদাসীনতা ও পশ্চাৎপদতা কোন বিশেষ শাখা বা কোন বিশেষ শাস্ত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট ছিল না। ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, রচনা, ইতিহাস, শিক্ষা পাঠক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থা সব কিছুই কমবেশি এর দ্বারা প্রভাবিত দৃষ্টিগোচর হয়। বিগত শতাব্দীগুলোর আলিম-উলামার আলোচনা ও জীবনী গ্রন্থসমূহ পাঠ করুন, শত শত নামের মধ্যে এমন একজনের নাম মেলা ভার হবে যাঁকে ক্ষণজন্মা প্রতিভা হিসাবে আখ্যায়িত করা চলে কিংবা যিনি কোন বিষয়ে নতুন কিছু পেশ করেছেন অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন বিশেষ শাখায় কোন মূল্যবান সংযোজন ঘটিয়েছেন। বিগত শতাব্দীগুলোতে আমরা কয়েকজনকে এর বাইরে রাখতে পারি যাঁরা নিজেদের যুগে সাধারণ শিক্ষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক মানের দিক দিয়ে বহু উর্ধ্বে অবস্থান করতেন, যারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে কিংবা শিক্ষার ময়দানে বিরাট কোন বিপ্লবাত্মক অবদান রেখেছেন অথবা জ্ঞানের জগতে যুগান্তকারী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, ব্যতিক্রমী এই মনীষিগণের সকলেই ভারতীয় উপমহাদেশের। এঁদের অন্যতম হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফেছানী মৃ. ১০৩৪ হি.) যাঁর লিখিত মকতূবাত (পত্র সংকলন) ইসলামের ইলমী ও ধর্মীয় পুঁজির ভাণ্ডারে এক মূল্যবান সংযোজন ঘটিয়েছে এবং যিনি সমগ্র মুসলিম জাহানের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছেন। দ্বিতীয় জন হলেন হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (মৃ. ১১৭৬ হি.) যাঁর লিখিত হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগা, ইযালাতুল খিফা, আল-ফাওযুল-কাবীর ও রিসালাতুল-ইনসাফ নামক গ্রন্থ স্ব স্ব ক্ষেত্রে একক ও অনন্য। তৃতীয়জন তাঁরই পুত্র শাহ রফীউদ্দীন দেহলভী (মৃ. ১২৩৩ হি.) যাঁর 'তাকমীলুল আযহান' ও 'রিসালা আস্‌রারুল মুহব্বত' নামক গ্রন্থ কতক বিষয়ে নতুন চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা পেশ করেছে। চতুর্থ জন হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ দেহলভী (মৃ. ১২৪৬ হি.) যাঁর 'মানসাবে ইমামত' ও 'আবাকাত' নামক দু'টি গ্রন্থ ইজতিহাদী গ্রন্থের মর্যাদা দাবি করতে পারে এবং স্ব-স্ব বিষয়বস্তুর ওপর অতুলনীয় গ্রন্থ। তেমন ফিরিঙ্গী মহলের খান্দান ও যূরোপের কোন কোন শিক্ষাক্রমের ধারা আপন মেধা ও সৃষ্টিকুশলতার ক্ষেত্রে খুবই বিশিষ্ট দেখতে পাওয়া যায় এবং তাঁরা তাদের সমকালীন শিক্ষিত মহলের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছেন। কিন্তু তাঁদের মেধা ও পাণ্ডিত্য পাঠ্যসূচীর সীমা খুব কমই অতিক্রম করে।



কেবল ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, কাব্য ও সাহিত্যও তার পেলবতা ও সজীবতা হারিয়ে ফেলেছিল এবং এসবের ওপরও তাকলীদ তথা অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা জেঁকে বসেছিল। রচনা ও গদ্য সাহিত্যকেও কৃত্রিমতা, লৌকিকতা, ছন্দের তাবেদারী, শব্দের কচকচানি ও অলংকার বাহুল্য নিষ্প্রাণ ও নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল। বন্ধুদের কাছে লিখিত পত্র, ইতিহাস গ্রন্থ ও দাফতরিক লেখালেখি ও ফরমানগুলোও এই সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিল না। কোথাও কোথাও সাহিত্য ও রচনার এমন কোন নমুনা পাওয়া যেত যা সে যুগের সাধারণ রুচি থেকে স্বতন্ত্র ও নীচু মানের চেয়ে কিছুটা উন্নত দৃষ্টিগোচর হয়।

মাদরাসাগুলো ও অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোও কঠিন জড়তা ও অন্ধ আনুগত্যের শিকার এবং এক ধরনের জ্ঞানগত ও চিন্তাগত পতনের হাতে বন্দী দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগের আলিমগণের জ্ঞান-বিদ্যামণ্ডিত ও রুচি-সম্বলিত কিতাবগুলো পাঠ্যসূচী থেকে ক্রমান্বয়ে বাদ দেওয়া হয়। সেগুলোর স্থলে পরবর্তী যুগের আলিমগণের লিখিত ইজতিহাদী মর্যাদায় অনুত্তীর্ণ কিতাবাদি পাঠ্যসূচী ভুক্ত হয়। এসব গ্রন্থের লেখকরা ছিলেন পূর্ববর্তী যুগের আলিমগণের নিছক অন্ধ অনুকরণকারী, পাদটীকা রচয়িতা ও ভাষ্যকার। ফলে মতন তথা মূলপাঠের স্থান দখল করে টীকা-ভাষ্য যে সবের রচনায় ঐ সব লেখক গ্রন্থকার কাগজ সম্পর্কে অত্যন্ত মিতব্যয়িতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং সাধারণের পক্ষে বোধগম্য ও প্রাঞ্জল সুস্পষ্ট ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে ইশারা-ইঙ্গিত ও সূক্ষ্ম রহস্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। এ সবের থেকে সেই জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক পতনের পরিমাপ করা যাবে যা সমগ্র মুসলিম জাহানের ওপর ছেয়ে ছিল এবং যা থেকে তার কোন দিক ও জীবনের কোন শাখাই মুক্ত থাকে নি।

## তুর্কীদের সমসাময়িক প্রাচ্য সাম্রাজ্য

উছমানী সালতানাতের সমকালীন ও সমকক্ষ প্রাচ্যে দু'টো শক্তিশালী হুকুমত ছিল তন্মধ্যে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য এদের অন্যতম। ৯৩৩ হি./১৫২৬ খ্রি. সম্রাট বাবর তাঁর শক্তিশালী হাতে এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। সুলতান ১ম সলীম-এর তিনি ছিলেন সমসাময়িক। বাবরের পর একের পর এক কয়েকজন শক্তিশালী সম্রাট দিল্লীর মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তুর্কী সালতানাতের পর প্রাচ্যে এটাই ছিল সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য। এই বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গযীব আলমগীর যিনি সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি, বিজয়ের আধিক্য, দীনদারী ও ধর্মীয় জ্ঞানবত্তার দিক দিয়ে ভারতবর্ষের সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।

আওরঙ্গযীব নব্বই বছরের অধিককাল আয়ু পেয়েছিলেন এবং একাদিক্রমে পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন। হি. ১১১৮ সালে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে তিনি ইনতিকাল করেন। যুগটা ছিল যূরোপের পুনর্জাগরণ, জাতিগঠন ও উন্নতি-অগ্রগতির জন্য বিশেষভাবে খ্যাত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আওরঙ্গযীব পরবর্তী সকল মোগল বাদশাহই অযোগ্য, দুর্বল ও আরামপ্রিয় প্রমাণিত হওয়ায় তাদের পক্ষে যূরোপের পক্ষ থেকে আগত বিপদ-আপদের মুকাবিলা এবং মুসলিম উম্মাহর হেফাজত করাতো দূরে থাক, আপন দেশ ও সাম্রাজ্যও তারা রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। শেষ পর্যন্ত নিজেদের অযোগ্যতা, দুর্বলতা ও অনৈক্যের কারণে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং সুসংহত হয়। সেই সাথে ইংলন্ডের উন্নতি-অগ্রগতি, সম্পদের প্রাচুর্য ও শিল্প বিপ্লবের সূচনা সৃষ্টির কারণ হয় এবং পরোক্ষভাবে অধিকাংশ মুসলিম দেশের পরাধীনতা ও গোলামির হেতু হয়ে দাঁড়ায়।[১]

প্রাচ্য ভূখণ্ডে দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল ইরানের সাফাভী হুকুমত যা এক বিরাট সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী ও উন্নত সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু শী'আ মতবাদ নিয়ে বাড়াবাড়ি ও এর প্রতি অতিমাত্রায় স্পর্শকাতরতা প্রদর্শন, তদুপরি তুর্কী হুকুমতের সঙ্গে সংঘাত-সংঘর্ষ তাকে এই অবকাশ দেয়নি যে, ঠাণ্ডা মাথায় ও সুস্থ মস্তিষ্কে কোন গঠনমূলক চিন্তা করবে। ফলে তাদের সর্বোত্তম সময়টাই যেই মুহূর্তে যূরোপ দ্রুত গতিতে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলছিল, কখনো তুর্কী সীমান্তে হামলা, আবার কখনো নিজেদের হেফাজত ও প্রতিরোধ করতেই অতিবাহিত হয়ে যায়।

---

Brooks Adams তাঁর The Law of Civilization and Decay নামক গ্রন্থ বলেন ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বাংলার লুণ্ঠিত সম্পদ আসা শুরু হয় আর সত্বর এর ফল প্রকাশ পেতে শুরু করে। এতবড় বিরাট শিল্প বিপ্লব যার প্রভাবে পৃথিবীর প্রত্যন্ত কোণে কোণে অনুভূত হচ্ছে– সৃষ্টিই হতো না যদি পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত না হতো। কেননা ভারতবর্ষের সম্পদেই এই শিল্প বিপ্লব সৃষ্টির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষ থেকে সম্পদের পাহাড় যখন লণ্ডনে এসে আছড়ে পড়তে শুরু করল এবং পুঁজি বৃদ্ধি পেল তখন আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিযোগিতা শুরু হলো। তৃতীয়ত, পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে টাকা-পয়সার দ্বারা আজ পর্যন্ত এত বেশি মুনাফা অর্জিত হয় নি যতটা হয়েছে লুণ্ঠিত ভারতীয় সম্পদ দ্বারা। কেননা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এক্ষেত্রে ইংলণ্ডের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল না।

সার উইলিয়াম ডিগবী বলেন ঃ

"England's industrial supremacy owes its origin to the vast hoards of Bengal and the Karnatik being made available for her use ... Before Plassey was faught and own and before the ebb. "(Prosperous India; A Revolution , p. 30). tream of treasure began to flow to England, the industries of our country were at a very low ebb." (Prosperous India: A Revolution, p. 30)

"পলাশীর যুদ্ধের আগে যখন ভারতবর্ষের সম্পদ প্লাবনের বেগে ইংলণ্ডের বুকে আছড়ে পড়ে নি ততদিন আমাদের দেশের সৌভাগ্য সূর্য উদিত হয় নি। প্রকৃত ব্যাপার হলো, ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব বাঙলার বেশুমার সম্পদ এবং কর্নাটিকের বিপুল ভাণ্ডারের বদৌলতেই সম্ভব হয়েছিল" (মাহমুদ বাঙ্গালোরী)।



## ব্যক্তিগত প্রয়াস

এই হেমন্ত কালেও ইসলামরূপ বৃক্ষে সবুজ কিশলয়ের উন্মেষ ঘটেছে এবং হেমন্তেও তা এমন সব ফল-ফুলের উদ্গম ঘটিয়েছে যার দৃষ্টান্ত ইসলামের বসন্ত মৌসুমেও খুব একটা বেশি পাওয়া যায় না এবং এর উদাহরণ পেশ করতে অপরাপর জাতির ইতিহাস অক্ষম। এই যুগ জাতীয় অধঃপতন ও স্থবিরতার। কিন্তু সাথে সাথে তা কতিপয় প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের দৃঢ় সংকল্প, অটুট ইচ্ছা শক্তি, ব্যক্তিগত চেষ্টা-সাধনার যুগ হিসেবেও দৃষ্টিগোচর হয়। কয়েকটি দেশে এমন কয়েকজন অটুট ইচ্ছাশক্তি ও সংকল্প, অদম্য মনোবল ও জাগ্রত মস্তিষ্কের অধিকারী নেতা ও মুজাহিদের আবির্ভাব ঘটে যারা ঐসব পতনোন্মুখ ও অধঃমুখী জাতিগোষ্ঠী ও দেশের মাঝে কিছু কালের জন্য হলেও নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। ভারতবর্ষে সুলতান ফতহ আলী টিপুর মত উন্নত মনোবলসম্পন্ন সমুন্নত দৃষ্টির অধিকারী সিংহহৃদয় নেতার জন্ম হয় যিনি ভারতবর্ষকে বিদেশী বিপদাশংকা থেকে প্রায় মুক্তই করে ফেলতে চলেছিলেন। অপর দিকে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদের মত অটুট মনোবলসম্পন্ন ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দাঈ ও মুজাহিদ জন্ম নেন যিনি খেলাফতে রাশেদার মূলনীতির ওপর এমন একটি ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে চাইতেন যার গণ্ডী ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে বুখারা অবধি বিস্তৃত হবে। তাঁর দাওয়াত ও প্রশিক্ষণ হাজার হাজার সংখ্যায় এমন সব সমুন্নত চরিত্রের মুজাহিদ, অটুট মনোবলসম্পন্ন ও উৎসর্গিতপ্রাণ দাঈ, মুবাল্লিগ ও সিপাহী জন্ম দেয় যাঁরা নিজেদের ঈমান ও ইয়াকীন, লিল্লাহিয়াত ও ইখলাস এবং ধর্মীয় জোশ ও মর্যাদাবোধের সেই প্রাথমিক যুগগুলোর স্মৃতিকেই যেন জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু জাতীয় অধঃপতন, সামাজিক বিকৃতি ও বিশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক অসচেতনতা এই পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিল যে, এ রকম বিশাল ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বও মুসলমানদের অবস্থা এবং তাদের অবনতি ও অধঃপতনের গতির ভেতর কোন বড় রকমের পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হননি এবং মুসলিম উম্মাহ্ সামগ্রিকভাবে ঐসব মুজাহিদসুলভ ও পুনঃজাগরণমূলক কর্মপ্রয়াস থেকে উপকৃত হতে পারেনি

## যূরোপের শিল্প বিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই তুর্কীরা অবনতি ও অধঃপতন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা ও স্থবিরতার শিকার হয়ে গিয়েছিল। মানব ইতিহাসের এটাই সেই গুরুত্বপূর্ণ যুগ যার প্রভাব পরবর্তী শতাব্দীগুলোর ওপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। এই যুগেই যূরোপ তার দীর্ঘ নিদ্রা থেকে

আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠেছিল এবং প্রবল জোশে ও পাগলের ন্যায় উঠে পড়ে অলসতা ও অজ্ঞতার এই দীর্ঘ যুগের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চাইছিল। তারা জীবনের প্রতিটি শাখায় জ্যামিতিক গতিতে উন্নতি (گریز پاترقی) করছিল। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ আয়ত্ত, সৃষ্টি জগতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার পর্দা উন্মোচন এবং অজানা সমুদ্র ও ভূখণ্ড তারা আবিষ্কার করছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাদের বিজয় ও জীবনের প্রতিটি শাখায় তাদের আবিষ্কার-উদ্ভাবন অব্যাহত ছিল। এই সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে তাদের ভেতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র বড় বড় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, আবিষ্কারক ও উদ্ভাবকের জন্ম হয়। এঁদের মধ্যে কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও, কেপলার ও নিউটন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যাঁরা জ্যোর্তিবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। পর্যটক ও নাবিকদের মধ্যে কলম্বাস, ভাস্কো ডি গামা ও ম্যাগলিন-এর মত উদ্যমী, সাহসী ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা নতুন পৃথিবী, নতুন নতুন সাগর ও অজানা অনেক দেশ আবিষ্কার করেন।

জাতিসমূহের ইতিহাস এই যুগে নতুনভাবে বিন্যস্ত হচ্ছিল। এই আমলের এক একটি মুহূর্ত কয়েক দিনের এবং এক একটি দিন কয়েক বছরের সমতুল্য ছিল। এ যুগসন্ধিক্ষণে যে প্রস্তুতির একটি মুহূর্ত খুইয়েছে কার্যত তার সুদীর্ঘকাল নষ্ট হয়ে গেছে। নিতান্তই আফসোসের বিষয়, মুসলমানরা এ সময় কয়েকটি মুহূর্ত নয়, বরং কয়েকটি শতাব্দী নষ্ট করেছে। পক্ষান্তরে য়ূরোপীয় জাতিগোষ্ঠী এ সময় একটি মিনিট নয় এক একটি সেকেন্ডের মুল্য দিয়েছে এবং এর থেকে ফায়দা উঠিয়েছে এবং শতাব্দীকালের দূরত্ব বছরে অতিক্রম করেছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের ময়দানে তুর্কীদের পশ্চাৎপদতার পরিমাপ এখেকে করা যাবে যে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দীর পূর্বে তুরস্কে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সূচনাই হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রেস, মুদ্রণযন্ত্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ফৌজী প্রশিক্ষণের জন্য নতুন ধরনের স্কুলের সঙ্গে পরিচিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পর্যন্ত তুরস্ক নতুন নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও উন্নতি-অগ্রগতি সম্পর্কে এতটাই অপরিচিত ছিল যে, রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের অধিবাসীরা যখন তাদের রাজধানীর আকাশে বেলুন উড়তে দেখতে পেল তখন তারা একে যাদু কিংবা যাদুর ঘুড়ির বেশী ভাবতে পারেনি। এ সময় য়ূরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় তুরস্কের মুকাবিলায় অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। এমন কি মিসর পর্যন্ত কোন কোন উপকারী বিষয়ে উপকৃত হবার ক্ষেত্রে অনেকটাই অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। তুরস্কের চার বছর আগেই মিসরে রেল যোগাযোগ



ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাক টিকেটের প্রচলনও তুরস্কের কয়েক মাস আগে মিসরে ঘটেছিল।[১]

মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন তুরস্কের অবস্থাই যখন এই, তখন তুর্কী সালতানাতের অধীন কিংবা প্রভাবাধীন অন্যান্য আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রের অবস্থা সহজেই পরিমাপ করা যেতে পারে। ঐসব দেশে তখন পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের প্রচলন ঘটেনি। মঁসিয়ে ভলনে নামক জনৈক ফরাসী পর্যটক যিনি অষ্টাদশ শতকে মিসর ভ্রমণ করেন এবং চার বছর সিরিয়ায় অবস্থান করেন॥ তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখেছেন, "এ দেশ শিল্পে এতটাই অনগ্রসর যে, যদি তোমার ঘড়ি খারাপ হয়ে যায় তাহলে কোন বিদেশী ছাড়া ঘড়ি ঠিক করার জন্য কাউকে পাবে না।"[২]

This country (Syria) is so backward in the matter of industry that if your watch goes wrong here, you will have to go to a foreigner to get it mended.

অতঃপর মুসলমানদের পতন কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রেই ছিল না, বরং এই পতন ছিল সাধারণ ও সর্বব্যাপী যা মুসলমানদের আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে রেখেছিল, এমন কি সমর বিজ্ঞান ও সামরিক নৈপুণ্যের দিক দিয়েও তারা য়ূরোপের তুলনায় পিছিয়ে গিয়েছিল, অথচ একদিন তারা এক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন ছিল এবং সমর ক্ষেত্রে তুর্কীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের স্বীকৃতি সারা দুনিয়া দিত। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও য়ূরোপ এগিয়ে যায়। তারা তাদের গবেষণা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও উন্নত ব্যবস্থাপনার বদৌলতে সমরশাস্ত্রের ময়দানেও তুরস্কের তুলনায় অনেক এগিয়ে যায়। ফলে য়ূরোপ ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী ফৌজকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এতে করে দুনিয়ার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়, তুর্কীদের সামরিক শক্তি য়ূরোপের খ্রিস্টীয় জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক পিছিয়ে। এই পরাজয়ে তুরস্কের উছমানী হুকুমতের চোখ কিছুটা হলেও উন্মোচিত হয়। তারা কতিপয় য়ূরোপীয় সমর বিশেষজ্ঞের সহায়তায় সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠিত ও প্রশিক্ষিত করে তোলার কাজ শুরু করে। কিন্তু সংস্কার ও উন্নয়নের মূল পদক্ষেপের সূচনা করেন সুলতান তৃতীয় সলীম উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায়। শাহী প্রাসাদের বাইরে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুলতান নতুন ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কায়েম করেন যেখানে তিনি নিজেই ক্লাস নিতেন। "নিজাম-ই জাদীদ" নামে

---

১. نئ ایجادات کی تاریخ দারুল হেলাল, মিসর,
২. ড. আহমদ আমীনকৃত . زعماء الاصلاح فى العصر الحديث প. ৬।

তিনি এক নতুন ফৌজের ভিত্তি রাখেন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কিছুটা পরিবর্তন আনেন। কিন্তু তুর্কী জাতি ও সাম্রাজ্যের জড়তা ও স্থবিরতা এতটাই প্রকট ছিল যে, পুরাতন ফৌজ বিদ্রোহ করে সুলতানকেই হত্যা করে ফেলে। অতঃপর এই সংস্কারমূলক অভিযানে সুলতান ২য় মাহমুদ (শাসনকাল ১৮০৭-৩৯ খ্রি.) এবং তারপর সুলতান ১ম আবদুল মজীদ (১৮৩৯-৫১ খ্রি.) প্রতিনিধিত্ব করেন। তুর্কী জাতি অতঃপর উন্নতি-অগ্রগতির পথে কিছুটা অগ্রসর হয়।

অগ্রগতির ময়দানে তুকী মুসলমানেরা যে দূরত্বটুকু অতিক্রম করে তার সাথে য়ূরোপীয়দের দূরত্বের মুকাবিলা করুন যা তারা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে অতিক্রম করেছিল। উন্নতি-অগ্রগতির ময়দানের এ দুয়ের দৌড় প্রতিযোগিতা আমাদের কচ্ছপ ও খরগোশের দৌড়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে, খরগোশ (এখানে য়ূরোপ। - অনুবাদক) সদাজাগ্রত ও ধাবমান আর অপরদিকে কচ্ছপ (এখানে তুর্কীসহ সমগ্র মুসলিম জাহান। - অনুবাদক) তার ধীর গতি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তন্দ্রা ও নিদ্রার মাঝে কিছুটা বিশ্রাম খোঁজে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে মরক্কো, আলজিরিয়া, মিসর, ভারতবর্ষ ও তুর্কিস্তানে প্রাচ্যের মুসলিম জাতিগোষ্ঠী এবং পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠী ও শক্তিগুলোর মধ্যে যে সংঘাত-সংঘর্ষ দেখা দেয় তার ফয়সালা মূলত ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতেই হয়ে গিয়েছিল এবং এর ফলাফল কী হবে তার ভবিষ্যদ্বাণীও তখনই করে দেয়া যেতে পারত।

৫ম অধ্যায়

# বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে পাশ্চাত্য জগত ও তার ফলাফল

## পাশ্চাত্যের উত্থান

তুর্কীদের পতনের ফলে আর্ন্তজাতিক শক্তি ও ক্ষমতার চাবিকাঠি এবং সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব য়ূরোপের অমুসলিম জাতিগোষ্ঠীর হাতে চলে যায় যারা দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাদের সমকক্ষ ও সমপর্যায়ের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও তখন ময়দানে ছিল না। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের পর্যন্ত কোন দেশ কিংবা কোন রাষ্ট্রই তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী হয়তো বস্তুগত দিক দিয়ে অথবা রাজনৈতিকভাবে তাদের গোলাম ও অধীন ছিল অথবা মানসিক, জ্ঞানগত ও সাংস্কৃতিকভাবে তাদের প্রভাবাধীন ছিল।

আমরা সেই সব প্রভাব যা নেতৃত্ব ও ক্ষমতার এই হাত বদলের ফলে দুনিয়ার জাতিসমূহের মানসিকতা, নৈতিক চরিত্র, সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, মানবীয় ঝোঁক ও প্রবণতার ওপর ফেলেছিল তা পর্যালোচনা করবার আগে এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে যে, এই বিপ্লবের দ্বারা মানবতা লাভবান হয়েছে না কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এটা জরুরী যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকৃতি ও স্বভাব কি তা আমরা দেখব। আমরা তার অবয়ব ও স্পিরিট এবং সাথে সাথে তাদের দ্বারা প্রভাবিত জাতিগোষ্ঠীর জীবন-দর্শন বোঝবার চেষ্টা করব। আর এটাও দেখব, কিভাবে সেগুলো জন্ম নিয়েছে এবং কিভাবে লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছে।

## পাশ্চাত্য সভ্যতার বংশধারা

বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতা (যেমনটি কোন কোন ভাসা ভাসা দৃষ্টির অধিকারী মনে করেন) এমন কোন স্বল্প বয়সী সভ্যতা নয় বিগত কয়েক শতাব্দী যার জন্ম হয়েছে। মূলত এই সভ্যতার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরনো। এর পৈতৃক বংশগত সম্পর্ক গ্রীক ও রোমক সভ্যতার সঙ্গে। উক্ত দুই সভ্যতা আপন উত্তরাধিকার হিসেবে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক দর্শন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক পুঁজি রেখে গিয়েছিল তা তার ভাগে পড়ে। এর সমগ্র ঝোঁক-প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য সে বংশপরম্পরায় লাভ করে।

সর্বপ্রথম গ্রীক সভ্যতায় পাশ্চাত্য মন-মানসিকতার অভিব্যক্তি ঘটে। এটাই ছিল প্রথম কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যা নির্ভেজাল পাশ্চাত্য দর্শনের ভিত্তির ওপর কায়েম হয় এবং এর মধ্যে পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে। গ্রীক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের ওপর রোমক সভ্যতার প্রাসাদ গড়ে ওঠে যার মধ্যে একই পাশ্চাত্য স্পিরিট কাজ করছিল। পাশ্চাত্যের জাতিগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী এই দুই সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলো ও মেযাজ, তাদের দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও চিন্তাধারাসমূহে আঁকড়ে ধরে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে সেই সব বৈশিষ্ট্যসহ সেগুলো এক নতুন পোশাকে আবির্ভূত হয়। এই পোশাকের চাকচিক্যে তা নতুন বলে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। কিন্তু মূলত তার পুরোটা বুনন গ্রীক ও রোমকদের হাতেই সম্পন্ন হয়েছে।

এরই ভিত্তিতে আমরা জরুরী মনে করছি, আমরা প্রথমে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সাথে পরিচিত হব এবং উল্লিখিত দুই সভ্যতার মেযাজ ও স্পিরিট সম্পর্কে জানব যাতে করে আমরা নির্ভুল ও যথার্থভাবে বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্যায়ন করতে পারি।

## গ্রীক সভ্যতা

গ্রীক সভ্যতার চুলচেরা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা থেকে সেই সমস্ত অংশ বাদ দিয়ে যেগুলো মুখ্য নয়, বরং গৌণ ও ডালপালা পর্যায়ের ও নিছক দৃশ্যমান বস্তু এবং যেগুলো সাধারণ মানবীয় সভ্যতার মধ্যে সাজুয্যপূর্ণ তার একটি সুনির্দিষ্ট মেযাজের পরিচয় পাওয়া যায়। এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) যে সব ব্যাপার বা বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় সেগুলোর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন ও সেসবের প্রতি সন্দেহ পোষণ;

(২) ধর্মীয় অনুভূতির অভাব ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ঘাটতি;

(৩) ভোগবাদিতা ও পার্থিব আরাম-আয়েশের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ;

(৪) দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি।

আমরা এ সবের বিভিন্ন দিক ও শাখা-প্রশাখাকে যদি এক শব্দে প্রকাশ করতে চাই, তবে এর জন্য এককভাবে 'বস্তুবাদ' শব্দটিই যথেষ্ট হবে। অতএব গ্রীক সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বস্তুবাদ। গ্রীকদের দর্শনশাস্ত্র, কাব্য, এমন কি ধর্ম পর্যন্ত সব কিছুই তাদের বস্তুবাদী স্পিরিটের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলী ও তাঁর কুদরতের ধারণা বিভিন্ন দেবতার আকার-আকৃতি ব্যতিরেকে করতে পারেনি। তারা ঐ সব গুণের মূর্তি গড়েছে এবং সেসব দেবতার জন্য উপাসনালয় তৈরি করেছে যাতে করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য



পন্থায় সেগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা যায়। জীবিকার জন্য তাদের ছিল এক দেবতা, দয়া-মায়া ও করুণার আরেক দেবতা, আর এক দেবতা ছিল আযাব ও গযবের তথা শাস্তির। এরপর তারা সেগুলোর দিকে বস্তুগত দেহের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্কযুক্ত বিষয় সম্পর্কিত করে এবং সে সবের চতুর্পার্শ্বে কিসসা-কাহিনীর জাল বিছিয়ে দেয়। তারা অঙ্গবিহীন আবেগ-অনুভূতিকে পর্যন্ত দৈহিক ও আঙ্গিক কাঠামোরূপে পেশ করে। তাদের মতে প্রেমের ছিল এক দেবতা আর আরেক দেবতা ছিল সৌন্দর্যের। এ্যারিস্টোটলের দর্শনে দশ প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি (عقول عشره Ten kinds of Predication) ও নয় মহাশূন্যের যেই তালিকাসূচী পাওয়া যায় তাও এই বস্তবাদী বুদ্ধিবৃত্তিরই বিস্ময় ও চমৎকাররিত্ব যার প্রভাব থেকে গ্রীক প্রকৃতি ও মানস কখনো মুক্তি পায়নি।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরাও গ্রীক সভ্যতায় বস্তুবাদের প্রাধান্যকে মেনে নিয়েছেন এবং তাদের লিখিত গ্রন্থ ও পুঁথি-পুস্তকে এবং তাত্ত্বিক আলোচনায় এর দিকে তারা অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। কয়েক বছর আগে ড. হাস নামক জনৈক পাশ্চাত্য লেখক জেনেভায় What is European Civilization? শীর্ষক তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁরই একটি উক্তি খালেদা এদিব খানমের সূত্রে নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

"বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্র ছিল প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা। তাদের দৃষ্টিতে আসল কথা হচ্ছে মানুষের সমগ্র শক্তির সুসমন্বিত বিকাশ এবং সবচেয়ে বড় আদর্শ হচ্ছে সুন্দর, সুঠাম ও সুডৌল দেহধারী মানুষ। স্পষ্টত এতে সবচে' বেশী জোর দেয়া হয়েছে অনুভূতির ওপর। দৈহিক প্রশিক্ষণ (Physical Education) বা শরীর চর্চা, খেলাধুলা, নৃত্য ইত্যাদির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। মানসিক শিক্ষা যা কাব্য চর্চা, সঙ্গীত, নাটক, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি নির্ভর ছিল, একটি বিশেষ সীমার বাইরে অগ্রসর হতে পারেনি যাতে করে মননশীলতার উন্নতি দৈহিক উন্নতির ক্ষতির কারণ হতে না পারে। গ্রীসের ধর্মে না আধ্যাত্মিকতার কোন উপাদান আছে আর না আছে ধর্মীয় বিদ্যা বা ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা আর না আছে ধর্মীয় নেতাদের কোন শ্রেণী।"[1]

অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও লেখক গ্রীকদের ধর্মীয় দুর্বলতা ও তাদের ওপর কর্মের প্রভাবহীনতা এবং ধর্মীয় কাজকর্ম ও প্রথার মধ্যে যথাযথ গুরুত্বের অভাব এবং খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের আধিক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। History of European Morals-এর লেখক Lecky বলেন: The Greek spirit was essentially

1. Halide Edib: The conflict of East and West in Turkey, p. 226-227.

rationalistic and eclectic, the Egyptian spirit was essentially mystical and devotional. অর্থাৎ গ্রীকদের স্পিরিট ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক ও মস্তিষ্কনির্ভর পক্ষান্তরে মিসরীয়দের গোটাটাই ছিল আধ্যাত্মিক ও আত্মিক। তিনি Apuleius-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ The Egyptian deities were chiefly honoured by lamentations and the Greek divinities by dances. অথাৎ মিসরীয় দেবতারা তুষ্ট ও সম্মানিত হয় কান্নকাটি ও আহাজারিতে আর গ্রীক দেবতারা খুশী হয় নৃত্যে।

এরপর লেখক বলেন ঃ

The truth of that last part of this very significant remark appears in every page of Greek history. No nation has a richer collection of games and festivals growing out of its religious system; in none did a light, sportive and often licentious fancy play more fearlessly around, the popular creed in none was religiours terrorism more rare, The Divinity was seldom looked upon as holier than man, and a due observance of certain rites and ceremonies was demed an ample tribute to pay to him..

অর্থাৎ এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই উক্তির শেষ অংশের সত্যতা গ্রীসের ইতিহাসে পদে পদে পাওয়া যায়। বস্তুত কোন ধর্মের প্রথা-পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আনন্দ উৎসব, ক্রীড়া-কৌতুক ও খেল-তামাশার এতটা মিশ্রণ পাওয়া যায় না যতটা পাওয়া যায় এতে। আবার তেমনি কোন ধর্মে ভয়-ভীতির উপাদান এত কম পাওয়া যায় না যতটা পাওয়া যায় এতে। এই ধর্মে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা সম্পর্কে এতটাই ধারণা পাওয়া যায় যতটুকু ধারণা মানুষ কোন বুযুর্গ সম্পর্কে পোষণ করে থাকে। ব্যস, এর বেশি নয় এবং আল্লাহ্‌কে কতকগুলো মামুলী প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান সহকারে স্মরণ করা তাদের দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য ছিল যথেষ্ট।[১]

কিন্তু এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। পাশ্চাত্যের বস্তুপূজারী ও অনুভূতিপ্রবণ মেযাজ ও প্রকৃতি ছাড়াও গ্রীকদের ধর্মীয় দর্শন ও তাদের আকীদা-বিশ্বাসের অবয়বটাই এমন ছিল যে, ভয়-ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা-ভক্তি ও বিনয়, আল্লাহমুখী হওয়ার প্রবণতা তাদের ভেতর জন্মই নিতে পারত না। আল্লাহ্‌র যাবতীয় সিফাত তথা গুণাবলী, সর্বপ্রকার এখতিয়ার, কর্ম, নির্বাহী ক্ষমতা, সৃষ্টি ও আদেশ দানের ক্ষমতার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং তাঁকে একেবারেই নির্গুণ ও ক্ষমতা রহিত হিসাবে অভিহিত করা এবং এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনাকে নিজেদের মনগড়া ও কল্পিত সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তির দিকে সম্পৃক্ত করার স্বাভাবিক ও যৌক্তিক

1. W.E.H. Lecky: History of European Morals, London 1869. Vol-1.-P.344-45.



পরিণতি এটাই হতে পারে যে, জীবনে আল্লাহ্‌র কোন আবশ্যকতা এবং তাঁর সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক ও তাঁর প্রতি কোন আকর্ষণ কিংবা আগ্রহ থাকবে না, তাঁর প্রতি থাকবে না কোন আশাবাদ, তেমনি থাকবে না তাঁর সম্পর্কে কোন প্রকার ভয়, দিলে থাকবে না কোন ভীতি কিংবা ভালবাসা। প্রয়োজন মুহূর্তে ও বিপদের সময় তাঁর কাছে দোআ প্রার্থনা ও সকাতর অনুনয়-বিনয় করবে না, করার প্রয়োজন বোধও করবে না। কেননা এই দর্শন অনুসারে তিনি (আল্লাহ তা'আলা) এমন এক সত্তা যিনি অব্যাহতিপ্রাপ্ত ও নিষ্ক্রিয়। সমগ্র বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনায় যাঁর না কোন এখতিয়ার আছে আর না আছে কোন শক্তি ও ক্ষমতা। তিনি প্রথম বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি করার পর বিশ্বজগত থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ও সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন পরিপূর্ণরূপে। এজন্য যারা এমন আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে তাদের জীবন কার্যত এমনভাবে অতিবাহিত হয় এবং অতিবাহিত হওয়া উচিত যেন আল্লাহ বলতে কিছু নেই এবং যারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করেন তাদের জীবন থেকে এই ঐতিহাসিক বর্ণনা-বিবৃতি ব্যতিরেকে যে, আল্লাহ তা'আলা কেবল প্রথম বুদ্ধি সৃষ্টি করেছেন আর এছাড়া তিনি অন্য কোন দিক দিয়ে বিশিষ্ট নন। অনন্তর আমরা যখন শুনি, গ্রীকদের মধ্যে ভয়-ভক্তিমিশ্রিত বিনয় ও শ্রদ্ধার ঘাটতি ছিল এবং তাদের ইবাদত-বন্দেগী ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ নিষ্প্রাণ এক কাঠামোর অতিরিক্ত আর কিছু ছিল না এবং যখন আমরা এও শুনি, তারা খোদা তথা পরম স্রষ্টাকে একজন শ্রদ্ধাভাজন মুরুব্বী বা বুযুর্গের চেয়ে বেশী মূল্য দিত না, সম্মান করত না, তখন আমাদের আদৌও বিস্মিত হওয়া ঠিক হবে না এজন্য যে, ইতিহাসে মানুষ শত শত শিল্পী, কারিগর ও আবিষ্কারকদের জীবনী পাঠ করে কিন্তু কখনো তাদের প্রতি তাদের মনে ভয়-ভক্তিমিশ্রিত বিনয় ও শ্রদ্ধা এবং তাদের সঙ্গে বন্দেগী ও দাসত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না। বন্দেগীর সম্পর্ক তো সেই সময় সৃষ্টি হয় যখন মানুষ আল্লাহ্‌কে এই বিশ্বজগতের মালিক মুখতার তথা সর্বময় ক্ষমতার আধার মনে করে এবং নিজেকে তাঁর মুখাপেক্ষী ভাবে।

পার্থিব জীবনের প্রতি পরম আগ্রহ ও ভালবাসা, এর প্রতি সম্মান ও গুরুত্ব প্রদানের ওপর অত্যধিক জোর প্রদান ও বাড়াবাড়ি প্রদর্শন, ভাস্কর্য ও মূর্তির প্রতি আকর্ষণ, সুর ও গান-বাজনার মধ্যে নিমগ্নতা ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা এবং সীমাহীন ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর সীমাতিরিক্ত জোর প্রদানের ফলে গ্রীসের নৈতিক চরিত্র ও সমাজ জীবনের ওপর খারাপ আছর পড়ে। নৈতিক ও চারিত্রিক বেলেল্লাপনা, সব রকমের আইন-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ বিক্ষোভ নিত্য-দিনের ফ্যাশনে পরিণত হয়। প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার আনুগত্য, যতটা বেশি পারা যায় জীবনের আনন্দ ও স্বাদ-আহলাদ লুটে নেয়া এবং 'নগদ যা পাও

হাত পেতে নাও' অথবা 'আজ মরলে কাল দু'দিন' –অতএব পেছনের ভাবনা ভেবে নিজেকে বঞ্চিত না করে বর্তমানটাকে যতটা পারা যায় ভোগ করাকে মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীনতার সমার্থক ভাবা হতে থাকে। প্লেটো একজন গণতন্ত্রী যুবকের যেই জীবন-চরিত ও জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন সেই বর্ণনার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর একজন মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী টগবগে তরুণের আপাদমস্তক মিল রয়েছে। দুজনকে আদৌ ভিন্নতরো মনে হয় না।

"যদি তাকে বলা হয়, মানুষের সব রকমের আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা একই রূপ সম্মান ও পূরণযোগ্য নয়। কিছু কিছু কামনা-বাসনা পসন্দনীয় ও সম্মানযোগ্য এবং সেগুলো পূরণ করায় কোন ক্ষতি নেই। আর কিছু কিছু আছে যেগুলো পসন্দনীয় নয়। এগুলো এড়িয়ে চলাই উত্তম এবং এ সবের ওপর বাধা-নিষেধ ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা জরুরী, তখন সে এই সহী-শুদ্ধ আইন কবুল করে না, মেনে নেয় না, এমন কি সে এ ধরনের কথা শোনার জন্যও তৈরি হয় না। যখন তার সামনে এ ধরনের যুক্তিসঙ্গত কথা রাখা হয় তখন সে বিদ্রূপ ও উপহাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে এবং সজোরে এই বৃক্ততা দিতে শুরু করে যে, মানুষের সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাই একই রূপ সম্মানযোগ্য। সে মাফিক সে জীবনও যাপন করে এবং তার সর্বপ্রকার প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনাকে পরিতৃপ্ত করে, তার প্রতিটি আকাঙ্ক্ষাই সে চরিতার্থ করে, পূরণ করতে থাকে এবং যখন তার মন যা চায় তাই সে করে। কখনো তাকে মাতালে অবস্থায় গান-বাজনায় মত্ত দেখতে পাওয়া যাবে, আবার কখনো খেয়াল চাপল তো পণ করে কেবল পানি পানকেই যথেষ্ট ভাববে। কখনো সামরিক প্রশিক্ষণ ও তার নিয়মাবলী শিখতে দেখা যাবে, আবার কখনো একেবারে বেকার ও অলস জীবন যাপন করতে পাওয়া যাবে এবং সব কিছুকেই তাকে তুলে রাখবে। কখনো দার্শনিকসুলভ জীবন যাপন করতে থাকবে, আবার অন্য সময় রাজনৈতিক জীবনেও অংশ গ্রহণ করবে, রাজনৈতিক কার্যক্রমে যোগ দেবে এবং সময়ের চাহিদা মেটাতে রাজনৈতিক প্লাটফর্মে বৃক্ততা দিতেও দেখা যাবে, এমন কি তাকে সৈনিকদের প্রশংসা করতে শোনা যাবে এবং তাদের প্রতি তার আগ্রহ লক্ষ্য করা যাবে। কখনো-বা সফল ব্যবসায়ীর প্রতি ঈর্ষাপরবশ হয়ে ব্যবসা শুরু করে দেবে। মোটকথা, তার জীবনের কোন নিয়ম নেই, শৃঙ্খলা নেই, সুনির্দিষ্ট কোন বিধানের অনুসরণ নেই। মজার ব্যাপার হলো এই যে, সে এই জীবনকে খুবই আনন্দদায়ক, রসঘন ও অবাক মনে করে এবং শেষ পর্যন্ত এভাবেই সে জীবন কাটায়।"[১]

১. প্লেটোর রিপাবলিক।



পাশ্চাত্যের স্বভাব ও প্রকৃতির আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। এশিয়ার তুলনায় জাতীয়তাবাদী প্রেরণা যূরোপে অধিকতর শক্তিশালী ও ব্যাপক। এ ব্যাপারে কিছুটা ভৌগোলিক অবস্থানেরও ভূমিকা রয়েছে। এশিয়ায় প্রাকৃতিক এলাকা অধিক বিস্তৃত। বিভিন্ন প্রকারের আবহাওয়া, পাহাড়-পর্বত এবং মানুষের নানাবিধ কিসিমসংবলিত, অধিকতর উর্বর। তদুপরি জীবনোপকরণের ক্ষেত্রেও প্রাচুর্যের সমাহার। এশিয়া মহাদেশে রাজ্যের প্রবণতা স্বভাবতই বিস্তৃতি ও সাধারণ ব্যাপকতার দিকে এবং এশিয়া ভূখণ্ডে পৃথিবীর বিস্তৃততম সামাজ্য কায়েম হয়েছে। এর বিপরীতে যূরোপে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন সংগ্রাম ও সংঘর্ষ অব্যাহতভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। এর জনবসতি ঘন, এলাকা সংকীর্ণ এবং জীবন-উপকরণ সীমিত। পাহাড়-পর্বত ও নদী-নালার প্রাকৃতিক সীমানা পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীগুলোকে স্থায়ীভাবে সংকীর্ণ প্রাকৃতিক বৃত্তের মাঝে আবদ্ধ করে দিয়েছে, বিশেষত যূরোপের মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগ বিস্তৃত রাজ্যের লালন-পালন ও বিকাশের জন্য অনুকূল নয়। এজন্য প্রাচীন যূরোপেও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা নগর-রাষ্ট্রের (City-state) উর্ধ্বে অগ্রসর হতে পারেনি যার আয়তন কয়েক মাইলের বেশী বিস্তৃত হতো না। তথাপি তা সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসিত হতো। এর সর্বাপেক্ষা বড় নজীর গ্রীসে পাওয়া যাবে যেখানে প্রাচীন কাল থেকেই অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বায়ত্তশাসিত নগর-রাষ্ট্রের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

অতএব, এটা মোটেই বিস্ময়কর নয়, গ্রীসের লোকেরা জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণায় গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিল। বিজ্ঞানী লেকী স্বীকার করেন এবং বলেন, সক্রেটিস ও Anaxagorias যে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণার কথা কখনো কখনো ব্যক্ত করেছেন গ্রীসে তা কখনোই জনপ্রিয় ধারণা ও মতবাদ হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি এবং সেখানে তাদের কোন সমর্থকও ছিল না। এরিস্টোটলের System of Ethics তথা নৈতিক বিধি-ব্যবস্থা গ্রীক ও অগ্রীক-এর ভেদ রেখার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। দার্শনিক ও পণ্ডিত মহলের সম্মিলিত চেষ্টায় নৈতিকতার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলীর যে তালিকা তৈরি করা হয়েছিল তার শীর্ষে ছিল দেশপ্রেম। এরিস্টোটল তো এতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌছে ছিলেন যে, গ্রীসের লোকেরা বিদেশীদের (অর্থাৎ যারা গ্রীক নগর রাষ্ট্রের অধিবাসী নয়) সাথে সেই রূপ ব্যবহার ও আচরণ করবে যা তারা পশু ও জীব-জন্তুর সাথে করে। এ জাতীয় চিন্তাধারা গ্রীসের লোকদের ভেতর এমন বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল এবং এর প্রভাব এতদূর জেঁকে বসেছিল যে, যখন জনৈক দার্শনিক বললেন, আমার

সহানুভূতির পরিধি কেবল আমার নিজের দেশের মধ্যেই সীমিত নয় বরং সমগ্র গ্রীসব্যাপী আবর্তিত তখন লোকে তাঁকে বিস্ময়ভরে দেখতে লাগল।[১]

## রোমক সভ্যতা

রোমকরা গ্রীকদের স্থলাভিষিক্ত হল এবং শক্তিতে, রাজ্যের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিধানে, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিতে ও সামরিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে তারা গ্রীকদের ছাড়িয়ে গেল। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন, সাহিত্য ও কাব্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ময়দানে তারা গ্রীকদের পর্যায়ে পৌঁছুতে পারেনি। ওসব ক্ষেত্রে গ্রীকদের নেতৃত্ব ও প্রাধান্য দুনিয়াব্যাপী স্বীকৃত ছিল, এমন কি স্বয়ং বিজেতা রোমকদের অন্তর মানসের ওপরও এ ছাপ স্থায়ীভাবে বসে গিয়েছিল। রোমকরা তখনও তাদের সামরিক যুগের অবস্থান করছিল। এজন্য তারা স্বভাবতই মানসিক পরিপূর্ণতা, সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত বিষয়গুলোতে গ্রীকদেরকেই তাদের নেতা মেনে নেয় এবং তাদেরই দর্শণ শাস্ত্র ও ধ্যান-ধারণা চর্বন করে। লেকী বলেনঃ

"It is also evident that the Greeks having had for several centuries a splendid literature, at a time when the Romans had none, and when the Latin language was still too crude for literary purposes, the period in which the Romans first emerged from a purely military condition would bring with it an ascendancy of Greek ideas. Fabius Pictor and Cincius Alimentus, the earliest native historians, both wrote in Greek .......... After the conquest of Greece, the political ascendency of the Romans and the intellectual ascendancy of Greece were alike universal. The conquered people, whose patriotic feelings had been greatly enfeebled by the influences I have noticed, acquiesced readily in their new condition, and notwithstanding the vehement exertions of the conservative party, Greek manners, sentiments, and ideas soon penetrate all classes and moulded all forms of Roman life."

"গ্রীকরা তাদের মূল্যবান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য শত শত বছর ধরে লালন করে চলেছিল। বস্তুত রোমকরা সামরিক যুগেই অবস্থান করছিল যারা সাহিত্যের নামটুকুর সাথেও পরিচিত ছিল না, বরং তাদের ভাষা পর্যন্ত মর্ম প্রকাশে ও উচ্চতর ধ্যান-ধারণার প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রোমকদের এই দৈন্যের অনিবার্য পরিণতি ছিল এই যে, তারা গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা পরাভূত হয়ে যাবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় তাদের দ্বারা প্রভাবিত থাকবে। অনন্তর আমরা জানি, প্রাচীনকালের রোমক ঐতিহাসিকরা গ্রীক ভাষাতেই পুস্তকাদি লিখতেন এবং এই

1. History of European Morals, London 1809, Vol. p. 243



নিয়ম দীর্ঘকাল পর্যন্ত কায়েম ছিল। কেবল লেখালেখির কথাই বা বলি কেন, আচার-ব্যবহার, জীবন যাপন পদ্ধতি, আবেগ-অনুভূতি, মোটের ওপর জীবনের প্রতিটি শাখায় গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতি রোমক সংস্কৃতির ওপর জেঁকে বসেছিল। রোমকরা অবলীলায় ও নির্দ্বিধায় গ্রীকদের অনুকরণ করত এবং এজন্য তারা গর্ব করত।"[১]

আর এভাবেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, আচার-আচরণ ও অভ্যাসের মাধ্যমে গ্রীক জাতির দর্শন ও সংস্কৃতি নয়, বরং গ্রীক মন-মানস ও চিন্তা-চেতনা রোমকদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় এবং তাদের শিরা-উপশিরার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। এমনিতেও রোমকরা তাদের পশ্চিমা প্রকৃতি ও মেযাজের দরুন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এমন কিছু বেশি ভিন্ন ছিল না। জীবনের বহু দিকেই উভয়ের মধ্যে অনেকখানি সাদৃশ্য ছিল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ওপর বিশ্বাস করতে রোমকরাও অভ্যস্ত ছিল। জীবনের মান ও মূল্যের ব্যাপারে এখানেও ততটাই অতিরিক্ততা ও বাড়াবাড়ি ছিল। আকীদা-বিশ্বাস ও বাস্তবতা সম্পর্কে এরাও দুর্বল ঈমানের, উদার ও মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী ছিল। ধর্মীয় আইন-শৃঙ্খলা, আমল ও প্রথা-পদ্ধতির প্রতি বিশেষ কোন শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধ ছিল না। জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতাবোধের আতিশয্য রোমকদের মধ্যেও পাওয়া যেত এবং অধিকন্তু শক্তির প্রতি সম্মানবোধ ইবাদত ও পবিত্রতার পর্যায়ে পৌঁছে ছিল।

রোমক ইতিহাস থেকে জানা যায়, রোমকরা তাদের ধর্ম ও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল না। আর এ ব্যাপারে তাদের করারও কিছু ছিল না। কেননা যে সমস্ত শেরেকী ও কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম রোমে প্রচলিত ছিল তার দাবি ছিল এই যে, রোমকরা জ্ঞানের জগতে যে পরিমাণ উন্নতি করবে, তাদের মস্তিষ্ক যে পরিমাণ আলোকোজ্জ্বল হবে ঠিক ততটাই সেই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে ঘাটতি দেখা দেবে। তারা যেন প্রথম থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল যে, দেবতাদের রাজনৈতিক ও পার্থিব বিষয়াদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। সিসেরো বলেন, থিয়েটারে যখন এ ধরনের বিষয়বস্তুর ওপর কবিতা পাঠ করা হতো, দেবতাদের জাগতিক বিষয়াদিতে কোন ভূমিকা নেই, করার কিছু নেই তখন লোকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনত।[১] সেন্ট অগাস্টিন (Augustine) প্রমুখ বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, এই সব রোমান মূর্তিপূজক মন্দিরে তো দেবতাদের পূজা করত, আবার নাট্যমঞ্চে তাদের নিয়েই ঠাট্টা-মস্করা করত।[২] রোমান ধর্মের নিয়ন্ত্রণ তাদের অনুসারীদের ওপর এতটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং ধর্মীয় আবেগ-উদ্দীপনা এতটা শীতল হয়ে গিয়েছিল যে, লোকেরা কোন কোন সময়

1. Lecky: History of European Morals. London 1869.1. vol. P. 178
2. Lecky: History of European Morals, p. 179.

দেবতাদের সাথে বেয়াদবী ও উত্তেজিত হয়ে গোস্তাখী করতে এতটুকু ইতস্তত বা পরওয়া করত না। লেকী বলেন, ধর্মের নৈতিক প্রভাব প্রায় নিঃশেষই হয়ে গিয়েছিল, পবিত্রতার প্রেরণা প্রায় নিশ্চিহ্নই হয়ে যায় এবং এর দৃশ্য সবারই দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। অনন্তর অগাস্টাস-এর নৌবহর যখন নিমজ্জিত হয়ে যায় তখন সে ক্রোধান্বিত হয়ে সমুদ্র দেবতা নেপচুনের মূর্তি ভেঙে চুরে চুরমার করে দেয়। যখন জার্মানিকাসের মৃত্যু হলো তখন লোকে দেবতাদের পূজামণ্ডপে গিয়ে অবাধে প্রস্তর বর্ষণ করে।[১]

রোমকদের নৈতিক চরিত্র, আচার-আচরণ, রাজনীতি ও সমাজে ধর্মের কোন প্রভাব, তাদের অনুভূতি ও প্রবণতার ওপর এর কোন প্রকার কর্তৃত্ব অবশিষ্ট ছিল না। ধর্মের মধ্যেও কোন গভীরতা ছিল না, ছিল না কোন শক্তি-সামর্থ্য যে, তা দিলের গভীরে প্রবেশ করবে এবং আত্মার ওপর, রূহের ওপর রাজত্ব করবে। এ কেবলই এক অনুষ্ঠান সর্বস্ব প্রথায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রাজনীতি ও সামাজিক কল্যাণ উপযোগিতার দাবি ছিল এই, নামসর্বস্ব হলেও ধর্মের অস্তিত্ব কোন না কোনরূপে হলেও অবশিষ্ট থাকুক। লেকী আরও বলেন,

The Roman religion was purely selfish. It was simply a method of obtaining prosperity, averting calamity and reading the future. Ancient Rome prooduced many heroes but no saints. Its self-sacrifice was patriotic, not religious. Its religion was neither an independent teacher nor a source of inspiration.

"রোমক ধর্ম ছিল স্বার্থপরতাসর্বস্ব ও আত্মকেন্দ্রিক। এর লক্ষ্য এর অধিক ছিল না যে, কী করে প্রাচুর্য লাভ করা যায়, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের হাত থেকে নিরাপদ থাকা যায় এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে জানা যায়। অনন্তর এরই প্রতিক্রিয়া ছিল যে, রোম বহু বীর পুরুষের জন্ম দিয়েছে বটে, কিন্তু আত্মত্যাগী সাধক পুরুষ একজনও জন্ম দিতে সক্ষম হয়নি। এখানে আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের সর্বোচ্চ যেই নজীর পাওয়া যায় তাও ধর্মের প্রভাব ও প্রেরণায় নয়, বরং স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায়। ওদের ধর্ম স্বাধীন নয়, নয় প্রেরণার উৎস।"[২]

রোমকদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো তাদের রাজতন্ত্রপ্রীতি, সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা, জীবন সম্পর্কে নির্ভেজাল বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এটাই সেই উত্তরাধিকার যা বর্তমান য়ূরোপ তার রোমক পূর্বসূরীদের থেকে পেয়েছে। প্রখ্যাত জার্মান নওমুসলিম আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ Islam at the Crossroad (সংঘাতের মুখে ইসলাম) নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"....... the underlying idea of the Roman Empire was the conquest of power and the exploitation of other nations for the benefit of the mother



country alone. To promote better living for a previleged group, no violence was for the Romans too bad, no injustice too base. The famous 'Roman Justice' was justice for the Romans alone. It is clear that such an attitude was possible only on the basis of an entirely materialistic conception of life and civilization—a materialism certainly refined by an intellectual taste, but none the less foreign to all spiritual values. The Romans never in reality knew religion. Their traditional gods were a pale imitation of the Greek mythology, colourless ghosts silently accepted for the benefit of social convention. In no way were the gods allowed to interfere with real life. They had to give oracle through the medium of their priests if they were asked; but they were never supposed to confer moral laws upon men."

"রোম সাম্রাজ্যের ওপর যেই বিশেষ ধারণা আসন গেড়ে বসেছিল তা ছিল শুধুই ক্ষমতা লাভের দুর্নিবার বাসনা, কেবলই রাজ্য ও রাজত্ব লাভ, অপরাপর দেশ ও জাতিগোষ্ঠীকে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে নিজ দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, ওলট পালটের মাধ্যমে স্বজাতির সম্পদ স্ফীতকরণ। রোমক নেতৃবর্গ, আমীর-উমারা ও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের প্রাচুর্য ঘেরা ও বিলাসী জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহের জন্য কোন প্রকার জুলুম ও নিষ্ঠুর আচরণকেই দূষণীয় মনে করত না। রোমকদের ন্যায়-বিচার ও ইনসাফের যে বিশ্বজোড়া খ্যাতি তা ছিল কেবল রোমকদের জন্যই নির্দিষ্ট। এই নির্দিষ্ট জীবনাচার ও চরিত্র জীবন ও কৃষ্টির কেবল বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার ওপরই কায়েম হতে পারত। যদিও তাদের বস্তুবাদী চেতনা ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে কিছুটা সাজ-সজ্জা ও রুচির সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু তা সব রকমের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ থেকে একেবারেই সম্পর্কহীন ছিল, অপরিচিত ছিল। রোমকরা কখনোই গভীরভাবে ভেবে-চিন্তে ও নিষ্ঠা সহকারে ধর্ম-জীবন এখতিয়ার করেনি। তাদের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় দেবতা ছিল শুধুই গ্রীক গল্প-উপাখ্যান ও নানান কল্প-কাহিনীর ফিকে অনুকরণ। তারা শুধুই নিজেদের সামাজিক সংহতি ও জাতীয় ঐক্যের ধারণায় সেসব আরওয়াহ মেনে নিয়েছিল। তারা সেসব দেবতাকে নিজেদের বাস্তব জীবনে ও কর্মের ময়দানে নাক গলাবার অনুমতি দিত না। তাদের কাজ কেবল এতটুকু ছিল যে, যখন তাদের কাছে চাওয়া হবে তখন তারা তাদের মন্দিরের পূজারী-পাণ্ডাদের মৌখিক ভবিষ্যদ্বাণী করে দেবে। কিন্তু তাদেরকে তারা এই অধিকার কখনো দেয়নি যে, তারা জনগণের ওপর নৈতিক বিধি-নিষেধ আরোপ করবে।"[১]

---

1. Muhammad Asad: Islam at the Crossroad, P. 38-39

গণতান্ত্রিক যুগের শেষ দিকে রোমে নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন, পাশবিক কামনা-বাসনার অবাধ রাজত্ব এবং বিত্ত-বৈভবের এমন এক প্লাবন এসে দেখা দিল যে, রোমকরা তার মধ্যে একেবারে ডুবে গেল এবং সেই নেতিক শৃঙ্খলা ও বিধানসমূহ যেগুলো রোমক জাতির প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য ছিল, খড়কুটোর মত ভেসে গেল এবং সংহতির প্রাসাদে এমন কাঁপন সৃষ্টি করল, মনে হল এই বুঝি তা ভূমিতে ধ্বসে পড়বে। ড. ড্রেপার তাঁর History of the conflict between Religion and Science নামক গ্রন্থে এর যে ছবি এঁকেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

"When the Empire in a military and political sense had reached its culmination, in a religious and social aspect it had attained its height of immorality. It had become thoroughly epicurean; its maxim was that life should be made a feast, that virtue is only the seasoning of pleasure, and temperance the means of prolonging it. Dining-rooms glittering with gold and incrusted with gems, slaves and superb apparel, the fascinations of feminine society where all the women were dissolute, magnificent baths, theatres, gladiators—such were the objects of Roman desire. The conquerors of the world had discovered that the only thing worth worshipping is Force. By it all things might be secured, all that tool and trade had laboriously obtained. The confiscation of goods and lands, taxation of provinces, were the reward of successful warfare; and the emperor was a symbol of Force. There was a social splendour, but it was the phosphorescent corruption of the Ancient Mediterranean world."

"সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাবের দিক দিয়ে রোম সাম্রাজ্য যখন উন্নতির শীর্ষে গিয়ে উপনীত হল তখন ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে তার আরাম-আয়েশ ও নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা অবনতির শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে। রোমকদের বিলাসপ্রীতির কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। তাদের নীতি ছিল এই যে, মানুষ তার জীবনকে একটি বিরতিহীন ভোগ-বিলাস বানিয়ে দেবে। পাক-পবিত্রতা ও নীতি-নৈতিকতা দস্তরখানের ওপর নিমকদান বিশেষ এবং এক আধটু ভারসাম্য রক্ষা ও ভোগকে প্রলম্বিত করার জন্যেই। নানা প্রকার জওয়াহেরাত খচিত স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে তাদের দস্তরখান ঝলমল করতে দেখা যেত। তাদের কর্মচারী জরিখচিত দামী পোশাক পরিহিত অবস্থায় তাদের খেদমতের নিমিত্ত সদা প্রস্তুত থাকত। সাধারণভাবে সতীত্ব ও পবিত্রতার রৌপ্য জিঞ্জীরের বন্ধনমুক্ত রোমের সুন্দরীরা তাদের পানোন্মত্ত সাহচর্যের আনন্দ ও ফূর্তিকে চাঙ্গা করার নেশায় মত্ত থাকত। আলীশান হাম্মাম, চিত্তাকর্ষক বিনোদন কেন্দ্র, উৎসাহমুখর ও আবেগ-উদ্বেলিত মল্লভূমি, যেখানে মল্লবীরেরা কখনো একে



অন্যের সঙ্গে, আবার কখনো বন্য ও হিংস্র পশুর সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতো এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের শক্তি পরীক্ষা অব্যাহত থাকত যতক্ষণ না প্রতিপক্ষদ্বয়ের কোন এক পক্ষ রক্ত ও কাদামাটির মধ্যে হারিয়ে যেত, রোমকদের বিত্ত-বৈভবের উপকরণের আরও বৃদ্ধি ঘটাত। এসব বিশ্ববিজেতাদের অভিজ্ঞতার পর এটা জানা গিয়েছিল যে, পূজা-অর্চনার যোগ্য কোন বস্তু যদি থেকে থাকে তাহলে তা একমাত্র শক্তি। এজন্য যে, এই শক্তির বদৌলতেই ঐ সমস্ত পুঁজি ও সম্পদ অর্জন করা সম্ভব যা কায়িক পরিশ্রম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অব্যাহত ও প্রাণান্তকর প্রয়াস ও ঘাম ঝরানোর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। বিত্ত-সম্পদের অধিকার ও রাজস্বপ্রাপ্তি বাহুশক্তির বদৌলতে যুদ্ধে বিজয়ী হবারই অনিবার্য ফল-ফসল এবং রোমক সাম্রাজ্যের শাসকবৃন্দ এই অসীম শক্তিমত্তারই প্রতীক। মোটকথা, রোমকদের সাংস্কৃতিক নীতি-রীতির মধ্যে শান-শওকতের একটি ঝলক তো দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু এটা ছিল সেই চোখ ধাঁধানো ঝলক সদৃশ যা গ্রীসের পতন যুগের সভ্যতার ওপর চড়ে বসেছিল।"[১]

## খ্রিস্ট ধর্মের আগমন ও রোমকদের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ

মূর্তিপূজক রোমক সাম্রাজ্যের ওপর খ্রিস্ট ধর্মের আসন গেড়ে বসা ছিল এমন এক বিপ্লবাত্মক ঘটনা যার গুরুত্ব কোন ঐতিহাসিক উপেক্ষা করতে পারেন না। ঘটনাটা এভাবে সংঘটিত হয়েছিল যে, রোমক সম্রাট কনস্টান্টাইন ৩০৫ খ্রি. রোমক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আর তার খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে রোম সাম্রাজ্যে খ্রিস্ট ধর্ম আসন গাড়তে সক্ষম হয় এবং সেই সাথে আকস্মিকভাবেই সে এমন এক বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্য, সীমাহীন ক্ষমতা ও এখতিয়ার লাভ করে যার স্বপ্নও সে কখনো দেখতে পারত না। সম্রাট কনস্টান্টাইন খ্রিস্টানদের সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানীর মাধ্যমে সিংহাসন লাভ করেছিলেন বিধায় সিংহাসন লাভের পর তিনি তাদেরকে এর উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করেন এবং সাম্রাজ্যে তাদেরকে অংশীদারিত্ব দান করেন।

## খ্রিস্ট ধর্মে মূর্তিপূজার মিশ্রণ

কিন্তু আসলে তা খ্রিস্ট ধর্মের জন্য কোন স্মরণীয় ঘটনা ছিল না, বরং তা ছিল এক বিরাট অশুভ ঘটনা। সে বিশাল রোম সাম্রাজ্য লাভ করল বটে, কিন্তু এর বিনিময়ে খ্রিস্ট ধর্মের মূল্যবান পুঁজিই সে খুইয়ে বসল। খ্রিস্টানরা যুদ্ধের ময়দানে

1. Draper, History of the Conflict between Religion and Science p. 31-32.

সফল হল বটে, কিন্তু দীন-ধর্মের ময়দানে তারা পরাজিত ও পর্যুদস্ত হলো। রোমক মূর্তিপূজারী ও স্বয়ং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা মসীহ (আ)-এর আনীত ধর্মকে বিকৃত করে দিল। আর এ ব্যাপারে সব চাইতে বড় ভূমিকা ছিল স্বয়ং খ্রিস্ট ধর্মের প্রসিদ্ধ রক্ষক ও পতাকাবাহী সম্রাট কনস্টান্টাইনের। ড্রেপারের ভাষায় ঃ

"Place, power, profit—these were in view of whoever now joined the conquering sect. Crowds of worldly persons, who cared nothing about its religious ideas, became its warmest supporters. Pagans at heart, their influence was soon manifested in the paganization of Christianity that forhwith ensued. The Emperor, no better than they, did nothing to check their proceedings. But he did not personally conform to the ceremonial requirements of the Church until the close of his evil life, A. D. 337."1

"Though the Christian party had proved itself sufficiently strong to give a master to the Empire, it was never sufficiently strong to destroy its antagonist, paganism. The issue of struggle between them was an amalgamation of the principles of both. In this, Christianity differed from Mohammedanism which absolutely annihilated its antagonist and spread its own doctrines without adulteration."2

"To the Emperor—a mere worldling—a man without any religious convictions, doubtless it appeared best for himself, best for the Empire, and best for the contending parties, Christian and pagan, to promote their union or amalgamation as much as possible. Even sincere Christians do not seem to have been averse to this; perhaps they believed that the new doctrines would diffuse most thoroughly by incorporating in themselves ideas borrowed from the old, that Truth would assert herself in the end and the impurity be cast off."3

"সফল ও বিজয়ী দলের সাথে যারাই হাত মেলাল এবং যে কেউ তাদের সঙ্গে শরীক হলো তারাই বড় বড় পদ লাভ করল এবং বিরাট বিরাট সম্মান ও পদ-মর্যাদার অধিকারী হলো। ফল দাঁড়াল এই যে, যে দুনিয়াদার লোকেরা ধর্মের বিন্দুমাত্র পরওয়াও করত না তারাই খ্রিস্ট ধর্মের উৎসাহী সমর্থকে পরিণত হলো। যেহেতু তারা বাহ্যত খ্রিস্টান ছিল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছিল মূর্তিপূজারী ও মুশরিক, ফলে তাদের প্রভাবে খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে মূর্তিপূজা ও শেরেকী উপাদানের মিশ্রণ শুরু হলো। কনস্টান্টাইন মতাদর্শগত দিক দিয়ে যেহেতু তাদেরই সমগোত্রীয় ছিলেন– এমন কোন পথ গ্রহণ করেন নি যদ্দারা তাদের এই মুনাফিকসুলভ ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিবিধান করা যায়। কনস্টান্টাইনের



গোটা জীবনটাই পাপাচারের মধ্যে অতিবাহিত হয়। জীবনের শেষ পর্যায়ে (মৃত্যু ৩৩৭ খ্রি.) এসে তিনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিছুটা আনুগত্যের পরিচয় দেন যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য গির্জা তাকীদ করত।"[১]

"যদিও খ্রিস্টান দল এতটা শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল যে, যাকেই তারা নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের পক্ষের লোক ভেবেছে তাকেই সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তথাপিও এই শক্তি ও ক্ষমতা তাদের অর্জিত হয়নি যে, তাদের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ মূর্তিপূজাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসাদন করবে। ফলে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফল দাঁড়াল এই, উভয়ের নীতি ও আদর্শ পরস্পরের মধ্যে মিশে গেল এবং এক নতুন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটল যার ভেতর মূর্তিপূজা ও খ্রিস্ট ধর্ম উভয় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। খ্রিস্ট ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে এ ব্যাপারে যেই বড় রকমের পার্থক্য তাহলো, ইসলাম তার প্রতিপক্ষ অর্থাৎ মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিকতাকে একেবারে জড়েমূলে উৎখাত করে দেয় এবং আপন আকীদা-বিশ্বাস কোনরূপ ভেজাল ও মিশ্রণ ছাড়াই প্রকাশ করে।"[২]

"এই দুনিয়াসর্বস্ব সম্রাট, যার ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস বিন্দুমাত্র মূল্যও বহন করত না, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ, সাম্রাজ্যের কল্যাণ ও উভয় পরস্পর-বিরোধী দল অর্থাৎ খ্রিস্টান ও মূর্তিপূজারীদের মঙ্গল এর ভেতর দেখতে পান যে, যতদূর সম্ভব এসবের মধ্যে মিলন ও সমঝোতা সৃষ্টি করা যাক। কট্টর ও গোড়া খ্রিস্টানদেরও এরূপ কর্মকৌশল গ্রহণে কোনরূপ আপত্তি ছিল না। সম্ভবত তারা মনে করত, নতুন শিক্ষামালার সাথে পুরনো আকীদা-বিশ্বাসের সংমিশ্রণের ফলে নতুন ধর্ম দ্রুত উন্নতি করবে এবং শেষ পর্যন্ত নাপাক আবর্জনার মিশ্রণ থেকে পাক-সাফ হয়ে কেবল সত্যিকার ধর্মই অবশিষ্ট থাকবে।"[৩]

খ্রিস্ট ধর্মের স্পিরিট ও সৌন্দর্যবিবর্জিত পৌত্তলিকতা ও খ্রিস্ট ধর্মের এই জগাখিচুড়ি সালসা এর উপযোগী ছিল না যে পতনোন্মুখ রোমকদের জীবন, চরিত্র ও আখলাককে তা সামাল দেবে এবং তাদের ভেতর পূত-পবিত্র ধর্মীয় জীবনের প্রাণ সঞ্চার করবে এবং রোমকদের ইতিহাসে এক নতুন গৌরবোজ্জ্বল যুগের সূচনা ঘটাবে। এর বিপরীতে সে বৈরাগ্যবাদের এক নতুন বিদআত আবিষ্কার করে যা সম্ভবত মানবতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্যে পৌত্তলিক রোমকদের পাশবিকতার চেয়েও বেশী দুর্বহ বোঝা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। য়ূরোপের

---

1. J. W. Draper, History of the Confilict between Religion and Science, 1927, p-34-35.
২. প্রাগুক্ত, পৃ, ৪০.
৩. প্রাগুক্ত, ৪০-৪১।

বস্তুপূজা ও ধর্মহীনতার বিস্তারের মধ্যে মানুষের জন্য ক্ষতিকর ও ব্যাধিতুল্য এবং মানব প্রকৃতির শত্রু এই বৈরাগ্যবাদের অনেকখানি ভূমিকা রয়েছে। এজন্য বিষয়টি কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা হবার দরকার রয়েছে।

**বৈরাগ্যবাদের খেপামি ও পাগলামী**

বৈরাগ্যবাদের মধ্যে এতটা বাড়াবাড়ি ও সীমাতিরিক্ততা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, এ যুগে তা কল্পনায় আনাও কষ্টকর। ড্রেপার তাঁর গ্রন্থে এর যে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন তার থেকে আমরা এখানে নমুনাস্বরূপ কিছুটা বিবরণ তুলে ধরছি।

সংসারবিরাগী পণ্ডিত ও সাধু-সন্ন্যাসীদের মোটামুটি সংখ্যা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতানৈক্যের কারণে অকাট্যভাবে তা বলা না গেলেও তাদের আধিক্য ও বৈরাগ্যবাদী আন্দোলনের প্রচার ও জনপ্রিয়তার পরিমাপ নিম্নোদ্ধৃত পরিসংখ্যান থেকে করা যেতে পারে। সেন্ট জারূমের আমলে ইস্টার উৎসব অনুষ্ঠানে আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার সাধু-সন্ন্যাসীর সমাবেশ ঘটত। চতুর্থ শতাব্দীতে কেবল একজন মোহন্তের অধীনে পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী ছিল। সেন্ট সেরাপীনের অধীনে ছিল দশ হাজার সাধু-সন্ন্যাসী এবং ৪র্থ শতাব্দীর সমাপ্তিতে তো এই হালত হয়ে গিয়েছিল যে, যেই পরিমাণ জনবসতি স্বয়ং মিসরের শহরগুলোতে ছিল প্রায় ততটা পরিমাণই ছিল ঐসব সংসারবিরাগী ও সাধু-সন্ন্যাসীদের সংখ্যা। দু'চার বছরের নয়, পুরো দু'শ বছর পর্যন্ত দৈহিক ও শারীরিক নিগ্রহকে চূড়ান্ত নৈতিকতা মনে করা হতে থাকে। ঐতিহাসিকগণ এসবের লোমহর্ষক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট ম্যাকারিয়স সম্পর্কে প্রসিদ্ধ জনশ্রুতি এ রকম, তিনি ছ'মাস যাবত পুঁতিগন্ধময় নোংরা স্থানে ঘুমুতেন যাতে বিষাক্ত মশা-মাছি তার নগ্নদেহকে কামড়ায়। অধিকন্তু তিনি এক মণ ওজনের লোহা সব সময় বহন করতেন। তারই অনুরক্ত শিষ্য সেন্ট ইউসিস প্রায় দুমণ ওজনের লোহা বয়ে বেড়াতেন এবং তিন বছর যাবত একটি শুকিয়ে যাওয়া কুয়ার মধ্যে অবস্থান করেন। বিখ্যাত সাধু যোহন সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি লাগাতার তিন বছর দাঁড়িয়ে ইবাদত-বন্দেগী করেন। একটা মুদ্দত পর্যন্ত তিনি মুহূর্তের তরেও না বসেছেন, আর না শুয়েছেন। যখন খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন তখন প্রস্তর খণ্ডে হেলান দিয়ে একটু জিড়িয়ে নিতেন। কোন কোন সাধু-সন্ন্যাসী সম্পর্কে তো এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে যে, তারা শরীরে কোন রকম কাপড় ব্যবহার করত না। লম্বা চুল দিয়ে সতর ঢাকত এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত হামাগুড়ি দিয়ে পথ চলত। সাধারণত তারা সে সময় ঘরবাড়িতে বসবাস করত না, বরং হিংস্র বন্য প্রাণীর গুহা, কুয়া কিংবা নির্জন কবরস্থানে তারা বাস করত। সংসারবিরাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের একটি দল কেবল ঘাস-পাতা



খেয়ে জীবন ধারণ করত। শারীরিক পবিত্রতাকে আধ্যাত্মিক পবিত্রতার পরিপন্থী ধারণা করা হতো এবং যেই সাধু সংসারনির্লিপ্ততা ও বৈরাগ্যবাদের ক্ষেত্রে যত দ্রুত উন্নতি করত ঠিক সেই পরিমাণ দুর্গন্ধ ও ময়লা আবর্জনার আধার হতো। সেন্ট এনথানাসিয়াস অত্যন্ত গর্বের সাথে বর্ণনা করেছেন, সেন্ট এন্টনী বয়োবৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত পা ধোয়ার মত পাপে লিপ্ত হননি। সেন্ট আবরাহাম পঞ্চাশ বছরের খ্রিস্টীয় সাধনার যিন্দেগীতে নিজের চেহারায় কিংবা পায়ের পাতার ওপর পানির ছিঁটাটুকুও পড়তে দেননি। সাধু আলেকজান্ডার অত্যন্ত আফসোস ও বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, এমন একটা যমানা ছিল যখন আমাদের পূর্বসূরিগণ মুখ ধোয়াকে হারাম মনে করতেন, পক্ষান্তরে এখন আমরা হাম্মামে যাই।

সাধু-সন্ন্যাসীরা (রাহেবগণ) শিক্ষকের বেশ ধারণ করে ইতস্তত ঘোরাফিরা করত এবং ছোট ছোট বাচ্চাকে ফুসলিয়ে নিজেদের দলে ঢোকাত। পিতা-মাতার তাদের সন্তানদের ওপর কোন অধিকার ছিল না। যেসব সন্তান আপন পিতা-মাতাকে ছেড়ে সংসার-বিরাগী হয়ে যেত তাদের নামে চতুর্দিকে জনসাধারণ বাহ্বা দিত। প্রথমে যে আদর ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্মানিত খান্দান ও পিতামাতা লাভ করত তা এখন পাদরী ও সাধু-সন্ন্যাসীদের দিকে স্থানান্তরিত হতো। পাদ্রীরা বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসবাদের নিমিত্ত বালকদের অপহরণ করত। সেন্ট এ্যামব্রোসে এ ধরনের অপহরণের ঘটনা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তা লক্ষ্য করে মায়েরা আপন আপন শিশু-সন্তানদের ঘরে আটকে রাখত।

বৈরাগ্যবাদের আন্দোলনের নৈতিক পরিণত হলো এই, পুরুষোচিত ও বীরোচিত গুণাবলী দূষণীয় হিসেবে অভিহিত হলো। আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত সাধক প্রসন্নতা, স্পষ্টবাদিতা, বদান্যতা, বীরত্ব, সাহসিকতা প্রভৃতি গুণাবলীর কখনো ধারে কাছেও ঘেষে নি। সন্ন্যাসমূলক জীবন যাপন পদ্ধতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হলো এই, পারিবারিক জীবনের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেল এবং মানুষের দিল থেকে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সম্ভ্রমবোধ উঠে গেল। এই যুগে মা-বাপের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে হৃদয়হীনতার নজীর এত অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয় যার পরিমাপ করাটাও কঠিন। মঠবাসী এই সব সাধু-সন্ন্যাসী ও আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত সাধকরা নিজেদের মায়েদের অন্তরেও ব্যথা দিত, স্ত্রীর হক নষ্ট করত, নিজ সন্তানদেরকে অভিভাবকহীনভাবেও ওয়ারিশ অবস্থায় অন্যের ওপর ছেড়ে দিত। তাদের জীবনের চরম লক্ষ্যটাই হতো এই, স্বয়ং তাদের যেন পারলৌকিক মোক্ষ লাভ ঘটে। তাদের এ ব্যাপারে আদৌ কোন মাথা ব্যথা ছিল না, তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ও তাদের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের লোকজন বাঁচল নাকি মরল। এ ব্যাপারে লেকী যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা পাঠে আজও মানুষের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। মেয়েদের ছায়া দেখলেও

তারা পালাত। কখনো দৈবক্রমে মেয়েদের ছায়াপাত ঘটলে অথবা রাস্তায় কিংবা গলিপথে কোন মহিলার আকস্মিক মুখোমুখি হয়ে গেলে তারা ভাবত, তাদের সারা জীবনের আরাধনা-উপাসনা ও সাধনা সব মাটি হয়ে গেল, এমন কি নিজের মা ও সহোদর বোনের সাথে কথা বলাকেও তারা মহাপাপ মনে করত। লেকী এ প্রসঙ্গে যেসব ঘটনা, লিপিবদ্ধ করেছেন তা পড়লে কখনো হাসি পায়, আবার কখনো কান্নাও আসে।

## নীতি-নৈতিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর স্বভাব-বিরুদ্ধতার প্রভাব

এমনটি ধারণা করা ঠিক হবে না, এই চরম সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যবাদ রোমকদের বস্তুবাদী মানসিকতার তীব্রতা ও বাড়াবাড়ি এবং পশুসুলভ কামনা-বাসনার মধ্যে কিছুটা ভারসাম্য ও ত্রাস সৃষ্টি করে থাকবে। না, সাধারণত এমনটা হতো না। ব্যাপারটা মানবীয় প্রকৃতির বিরোধী এবং বিভিন্ন ধর্ম ও নৈতিকতার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত। মূলত যেসব জিনিস বিদ্রোহী বস্তুবাদের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করত তাকে একটি সুষম জীবনে রূপান্তরিত করতে পারে, তা কেবল এমন আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও নৈতিক প্রজ্ঞামূলক ব্যবস্থা যা মানুষের সুস্থ প্রকৃতির অনুকূল হবে এবং তার প্রকৃতিকে আমূল পরিবর্তনের ব্যাপারে অনড় হবে না, তার লক্ষ্য মিটিয়ে দেওয়া হবে না, লক্ষ্য হবে বরং গতিপথ ঘুরিয়ে দেয়া, ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা। তার দিক মন্দের দিক থেকে ভালোর দিকে, অকল্যাণের দিক থেকে কল্যাণের দিকে পাল্টে দেবে। ইসলামের কর্মপন্থা এবং মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মুবারক আদর্শ এটাই। আরবরা ছিল বীর বাহাদুর ও যুদ্ধপ্রিয়। তিনি তাদের বীরত্বকে শীতল ও নিষ্প্রভ করে দেননি, বরং শুধু এতটুকু করেছেন যে, গোত্রীয় গৃহযুদ্ধ ও জাহেলী প্রতিশোধ-স্পৃহা থেকে মোড়-ঘুরিয়ে তা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ ও আল্লাহ্র কলেমাকে বুলন্দ করার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আরবরা জন্মগতভাবেই অত্যন্ত দানশীল ও উন্নত মনোবলের অধিকারী ছিল। কিন্তু তাদের দানশীলতা ও উন্নত মনোবল গর্ব ও যশ-খ্যাতির পেছনে ব্যয়িত হতো। তিনি তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার কাজে লাগিয়ে দিলেন। মোট কথা, তিনি তাদের জাহেলী বৈশিষ্ট্য, নীতি-নৈতিকতা ও আচার-আচরণকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে দিলেন এবং সেগুলোকে উপকারী ও কার্যকর প্রয়োজনীয় বস্তু বানিয়ে দিলেন। তিনি জাহেলিয়াতর পরিবর্তে ইসলামের পরিপূর্ণ নিজাম ও প্রতিটি বস্তুর উত্তম বিনিময় প্রদান করলেন। স্বভাব ও প্রবৃত্তিকে সজীবতা ও ক্রীড়া-কৌতুকের সুযোগও দান করলেন এজন্য যে, একজন জলীলুল কদর আলেম (শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়ার)-এর বিখ্যাত উক্তিঃ মানবীয় স্বভাব ও প্রকৃতি সর্বদাই কোন জিনিস থেকে কেবল তখন হাত গুটিয়ে নেয় এবং তার ওপর দাবি



পরিত্যাগ করে তখন যখন সে এর বিকল্প পায়। মানুষ স্বভাবতই কিছু করার জন্যই জন্ম নিয়েছে এবং তার স্বভাবের দাবি ও চাহিদা হলো কাজ ও কর্মের মধ্যে ডুবে যাওয়া। নিষ্ক্রিয় ও স্থবির হয়ে যাওয়া মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ।[১] আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বদলে দেবেন বলে আসেন নি, বরং তাকে পূর্ণতা দানের জন্য এসেছিলেন।[২]

وان الانبياء قد بعثوا بتكميل الفطرة وتكريرها لا تبديلها وتغيرها

হাদীস ও সীরাত গ্রন্থে এর বহু দৃষ্টান্ত মিলবে। মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন তখন সে সময় মদীনাবাসীদের দুটো পর্ব ছিল যে উপলক্ষে তারা আনন্দ-উল্লাস ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত হতো। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের এ দু'দিন কেমন অর্থাৎ এই দু'দিনে তোমরা কি কর? উত্তরে লোকেরা বলল, আমরা জাহেলী যুগে এ উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হতাম। মহানবী (সা) বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম দুই দিন দান করেছেন ঃ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর।[৩] হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার ঈদের দিন আমার কাছে আনসারদের দু'টো বালিকা গান গাইছিল। গানের বিষয়বস্তু ছিল বু'আছ যুদ্ধ সম্পর্কিত। এরা গায়িকা ছিল না। ইতোমধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বালিকা দু'টিকে গান গাইতে দেখে বললেন, আল্লাহ্র রাসূলের ঘরে শয়তানের গীত গাওয়া হচ্ছে? মহানবী (সা) তখন বললেন ঃ

يا ابابكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا دعهما يا ابابكر فانما ايام عيد -

আবূ বকর! প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর জন্য একটি উৎসবের দিন রয়েছে আর এটা হচ্ছে আমাদের উৎসব। অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি বলেন আবু বকর! ব্যাপারটা যেতে দাও। আজকের এই দিনটা ঈদের দিন।[৪]

পক্ষান্তরে রোমের খ্রিস্ট ধর্ম নিষ্ক্রিয় ও স্থবির প্রকৃতির পরিবর্তনে ও তা সমূলে ধ্বংস করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল এবং এমন এক বিধান ও রীতি পেশ

১. ইবনে তায়মিয়া, কিতাব ইকতিযাউস-সিরাতাল-মুস্তকীম, ১৪২ পৃ.
২. ইবনে তায়মিয়া, কিতাবুন নুবুওয়াত।
৩. আবূ দাউদ, আহমদ, নাসাঈ।
৪. দ্র. বুখারী, সালাত অধ্যায়, হাদীছ নং ৯৫২, বায়হাকী ১০/৯৫২, ইব্ন মাজা, নিকাহ অধ্যায়

করল মানবীয় স্বভাব ও প্রকৃতি যার ভার বইতে পারল না। সে মনুষ্য শক্তির অতিরিক্ত এক বোঝা মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দিল। রোমের আগের চরম বস্তুবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া হিসেবে লোকে একে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় মেনে নেয়, কিন্তু সত্বরই এর হাত থেকে মুক্তি লাভ করে এবং চাপা পড়া মজলুম স্বভাব ও প্রকৃতি ভীষণ প্রতিশোধ নেয়। এই চরম বৈরাগ্যবাদ স্বভাব ও প্রকৃতির পরম সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া এবং অপরিণামদর্শিতাবশত খ্রিস্ট ধর্ম লোকের আচার-আচরণ ও অভ্যাস এবং ধ্বংসোন্মুখ সভ্যতা-সংস্কৃতির পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। অবস্থা ছিল এই যে, খ্রিস্টান দেশগুলোতে একই সময় অপরাধ প্রবণতা ও বল্গাহীন স্বাধীনতা এবং সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যবাদের দুই পরস্পরবিরোধী আন্দোলন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছিল, বরং একথা বলাই অধিকতর সঙ্গত হবে যে, বৈরাগ্যবাদ মাঠে-ময়দানে তো নির্জনবাস করছিল এবং নাগরিক জীবনের ওপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব ছিল না। পক্ষান্তরে অন্যায় ও পাপাচারের আন্দোলন শহরগুলোর অভ্যন্তরে খুব জোরেশোরে চলছিল। লেকী তদীয় History of European Morals নামক গ্রন্থে এর ছবি এঁকেছেন এভাবেঃ

"জনগণের নীতি-নৈতিকতার মাঝে চরম অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। রাজদরবারের বিলাস ব্যসন ও ভোগ-বিলাসিতা, দরবারীদের গোলামী স্বভাব ও দাস্য মনোবৃত্তি, বেশভূষা ও সাজ-সজ্জাপ্রীতির রমরমা অবস্থা। তৎকালীন দুনিয়া চরম বৈরাগ্যবাদ ও চরম পাপাচারের নাগরদোলার মাঝে দুলছিল, বরং কোন কোন শহরে যেসব শহরে সর্বাধিক সংখ্যক সংসারবিরাগী সাধু-সন্ত জন্ম নিয়েছিল সেসব শহরেই বিলাস ব্যসন ও অনাচারের রাজত্ব চলছিল অবাধে। মোটের ওপর অনাচার, পাপাচার ও কুসংস্কারের এমন সমাবেশ ঘটেছিল যা ছিল মানুষের আভিজাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অকাট্য দুশমন। জনমত এমত পরিমাণ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, অপমান দুর্নামের কোন ভয় আর অবশিষ্ট ছিল না, বরং এসব লোকের মন থেকে একেবারে উঠেই গিয়েছিল। মানুষের মনে বিরাজিত ধর্মভয় তাকে অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত রাখতে পারত, কিন্তু এই বিশ্বাস সেই ভয়-ভীতিকেও দূরীভূত করে দিয়েছিল যে, দোআ প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বপ্রকার গোনাহ ও পাপ-তাপ মাফ হয়ে যেতে পারে। প্রতারণা, ধোঁকা, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা কথনের বাজার ছিল গরম যা সিজারদের যুগেও ছিল না। অবশ্য জুলুম-নির্যাতন, জোর-যবরদস্তি, নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা ও নির্লজ্জতাও এতটা ছিল না। কিন্তু এর সাথে মুক্ত চিন্তা তথা চিন্তার স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদী প্রেরণারও কমতি ছিল।"[১]

1. Lecky, History of European Morals, vol. 2. p. 162-3.



## পাদ্রীদের দুর্নীতি ও অবাধ ভোগ-বিলাস

বৈরাগ্যবাদ ও ধর্মের এই নেতিবাচক ব্যবস্থা অনিবার্যভাবেই স্বভাব ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু নতুন ধর্মের প্রভাব ও এর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা স্বভাব ও প্রকৃতিকে দাবিয়ে রেখেছিল। কিন্তু অল্প দিন পরেই স্বয়ং ধর্মীয় কেন্দ্র ও হালকাগুলোর ভেতর সেই সমস্ত দোষ-ত্রুটি ও ভোগ-বিলাস শুরু হয়ে যায় যার বিরুদ্ধে বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসবাদের আন্দোলন শুরু হয়েছিল, এমন কি তা নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতন এবং স্বীয় প্রাচূর্য ও বিলাস পূজার ক্ষেত্রে নির্ভেজাল দুনিয়াদার লোকদের থেকেও অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। ফলে হুকুমতকে বাধ্য হয়েই ঐসব ধর্মীয় দাওয়াতের ধারা বন্ধ করে দিতে হয় যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করা। ঠিক তেমনি শহীদ ও ওলী-আওলিয়ার ওরস ও মৃত্যু বার্ষিকী পালনের অনুষ্ঠানাদিও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কেননা এই সব নির্ভেজাল ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনাচার, পাপাচার ও নির্লজ্জতার আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। বড় বড় পাদ্রীর বিরুদ্ধে বিরাট রকমের নৈতিক স্খলন ও চারিত্রিক অধঃপতনের অভিযোগ ছিল। সেন্ট জারূম বলেন, গির্জাধিপতি পাদ্রীদের ভোগ-বিলাসিতার সামনে আমীর-উমারা ও বিত্তবানদের ভোগ-বিলাসও লজ্জা পেত। স্বয়ং পোপও নৈতিক ও চারিত্রিক দোষে দুষ্ট ছিলেন এবং সম্পদের মোহ ও বিত্তের প্রতি আকর্ষণ তাকে এতটা পেয়ে বসেছিল যে, তিনি পদ ও পদমর্যাদা মামুলী বাণিজ্যিক পণ্যের ন্যায় বিক্রি করতেন, এমন কি কখনো কখনো তা নীলামেও তুলতেন। স্বর্গের পরওয়ানা জমি জিরাতের মামুলী দলীল-দস্তাবেযের ন্যায় পাপ মুক্তির পরওয়ানা, ক্ষমার সার্টিফিকেট, আইন লঙ্ঘনের অনুমোদন বা সনদ অবাধে বিক্রি হত। ধর্মীয় পদাধিকারীরা ছিল ভীষণ ঘুষখোর ও সুদখোর। বাহুল্য খরচ ও অপচয়ের অবস্থা এরূপ ছিল যে, পোপ ৭ম ইনোসেন্ট পোপের মুকুট বন্ধক রেখেছিলেন এবং পোপ ১০ম লিউ সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি তিন জন পোপের আয়-আমদানী বাহুল্য খরচ করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন অর্থাৎ তার পূর্বের পোপেরা যেসব বিত্ত-সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন প্রথমে সেসব খরচ করেন। এরপর নিজের উপার্জিত সম্পদ খরচ করেন। এও যখন যথেষ্ট হলো না তখন তার উত্তরাধিকারীদের আয়-আমদানী আগাম উশুল করে খরচ করে ফেলেন। বর্ণিত আছে, ফ্রান্সের সমগ্র রাজস্বও ঐসব পোপদের ব্যয় সংকুলানের জন্য যথেষ্ট ছিল না।[১]

মোটকথা, গির্জার ইতিহাস, গির্জাধিপতিদের চরিত্র ও চালচিত্র কুরআনুল করীমের নিম্নোক্ত আয়াতের যেন সত্যিকার ব্যাখ্যা ছিল ঃ

1. Draper, History of the Canftict between Religion and Science. P.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ـ

"হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করে।" (সূরা তাওবা ঃ ৩৪)

### গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত

খ্রি. একাদশ শতাব্দীতে গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয় এবং তা মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। প্রথম দিক এই সংঘাতে পোপের জয় হয় এবং পোপের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এতটা বৃদ্ধি পায় যে, সম্রাট চতুর্থ হেনরীকে ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ হিল্ডার ব্রান্ড এই নির্দেশ প্রেরণ করেন যেন তিনি ক্যানোসা দুর্গে তাঁর সামনে হাজির হন। অনন্তর সম্রাট অবনত মস্তকে পোপের দরবারে হাজির হন। পোপ অগত্যা লোকের সুপারিশে নিতান্তই নিরুপায় হয়ে সম্রাটকে তাঁর সামনে খাড়া হবার অনুমতি প্রদান করেন এবং সম্রাট নগ্ন পদে পশমী মোজা পরিহিত অবস্থায় পোপের সম্মুখীন হন এবং পোপের হাতে তওবা করেন। পোপ সম্রাটের অন্যায়-অপরাধ ও ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করেন। এরপর এই সব দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কখনো পোপ জয় লাভ করেন, আবার কখনো বা পরাজিত হন। অবশেষে রাষ্ট্রের মুকাবিলায় গির্জাকে শেষ পর্যন্ত মাথা নোয়াতে হয়। আর সংঘাতের এই গোটা মুদ্দতে সাধারণ মানুষকে একই সঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতি তথা গির্জা ও রাষ্ট্রের দ্বৈত গোলামীতে আবদ্ধ থাকতে হয়।

### ক্ষমতার অপব্যবহার ও য়ূরোপীয় সভ্যতার ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া

গির্জাধিপতি হিসেবে পোপ মধ্যযুগে এমন এক বিরাট বিস্তৃত ক্ষমতা ও বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন যেমনটা স্বয়ং রোম সম্রাটও ছিলেন না। অতএব, বিরাট ক্ষমতা ও বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হিসেবে পোপের পক্ষে ধর্মের ছত্রছায়ায় য়ূরোপকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ময়দানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই সহজ ছিল। ড্রেপার লিখেছেন,

"Had not the sovereign pontiffs been so completely occupied with maintaining their emoluments and temporalities in Italy, they might have made the whole continent advance like one man. Their officials could pass without difficulty into every nation, and communicate without



embarrassment with each other, from Ireland to Bohemia, from Italy to Scotland. The possession of a common tongue gave them the administration of international affairs with intelligent allies everywhere, speaking the same language."1

"সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এই সব পোপ যদি নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার না করতেন এবং স্বার্থ পূজার শিকার না হতেন, তাহলে তাদের এই ক্ষমতা ছিল যে, তাদের এতটুকু ইশারা ও ইঙ্গিতে সমগ্র য়ূরোপ একযোগে ও ঐক্যবদ্ধভাবে এতটা উন্নতি করতে পারত যে, পৃথিবী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত! তাদের প্রতিনিধিবৃন্দ অবাধে সকল দেশে যাতায়াত করতে পারত। তারা আয়ারল্যান্ড থেকে নিয়ে বোহেমিয়া এবং ইটালী থেকে নিয়ে স্কটল্যান্ড পর্যন্ত অবাধে নিজেদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলতে পারত। ভাষা একই হবার দরুন তারা আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোর দেখাশোনা ও কর্তৃত্ব করার ব্যাপারে জেঁকে বসে এবং প্রতিটি দেশেই তারা এমন সব হুশিয়ার, সদাসতর্ক ও বিবিধ ব্যাপার উপলব্ধিতে সক্ষম এমন সব সহযোগী ও মিত্র পেয়ে যায় যারা অভিন্ন ভাষায় কথা বলত এবং সাধারণ বিষয়গুলোতে তাদের সহযোগিতা দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল।"

কিন্তু খ্রিস্ট ধর্ম ও খ্রিস্টান জাতিগোষ্ঠীগুলোর দুর্ভাগ্য ছিল এই, গির্জাধিপতিরা এ বিরাট শক্তির অপব্যবহার করে। তারা এ দ্বারা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার ও স্বার্থসিদ্ধি করে এবং য়ূরোপ আগের মতই অধঃপতন, মূর্খতা ও কুসংস্কারের তিমিরে ডুবে থাকে। ফলে নগর সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি ঘটবার পরিবর্তে বিরাট অবনতিই ঘটে। য়ূরোপ মহাদেশের জনসংখ্যা হাজার বছরে এবং ইংল্যান্ডের জনবসতি বিগত পাঁচশ' বছরেও দ্বিগুণ হতে পারেনি। এতে কোনই সন্দেহ নেই, এ ব্যাপারে পাদ্রী ও খ্রিস্টান সাধু-সন্ন্যাসীদের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কেননা তারা কুমার জীবন যাপন করত এবং এরূপ জীবনধারার ব্যাপক প্রচার করত। এর সাথে গির্জা সর্বদাই যতদূর সম্ভব লোকদেরকে ডাক্তার, চিকিৎসক কিংবা অনুরূপ পেশার লোকদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে আর চেষ্টা চালিয়েছে যাতে করে মানুষ এদের সাথে পরিচিত হতে না পারে এবং যাতে করে দান-দক্ষিণা নির্ভর মঠ বা আশ্রমগুলোর আয়-আমদানী প্রভাবিত না হয় এবং ডাক্তার ও চিকিৎসকরা তাদের মুনাফা লোটার পথে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে না পারে। এর ফল দাঁড়াল, য়ূরোপের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিরাটাকারে মহামারী ও রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন সফরকারী এনিয়াস

1. Draper, op, cit., p. 234-35.

সিলভিয়াস তাঁর সফরের ওপর যেই বিবরণী লিখেছিলেন তা থেকে সে দেশের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ও অধঃপতন, দুঃখ-দারিদ্র্য ও অনাহারক্লিষ্ট জীবনের বিবরণ পাওয়া যায়।

## ধর্ম গ্রন্থে সংযোজন, পরিমার্জন ও বিকৃতি সাধন

খ্রিস্ট ধর্মের ধারক-বাহকেরা অতঃপর সবচে' বিপজ্জনক যেই ভুলটি করে যার ফলে তারা এই ধর্মকে, যেই ধর্মের তারা ছিল প্রতিনিধি, এমন কি নিজেরাই নিজেদেরকেই বিপদের সম্মুখীন ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, তা ছিল এই যে, তারা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে সেই সব ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিখ্যাত সব তত্ত্বগত দর্শন ঢুকিয়ে দেয় যেগুলো ঐ যুগের নিরিখে যথার্থ ও স্বীকৃত ছিল এবং মানুষের জ্ঞানের সীমারেখা ঐ যুগ পর্যন্ত অতদূরেই পৌঁছে ছিল। কিন্তু তা কখনোই মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির সীমা ছিল না। আর যদি সেই যুগের নিরিখে তাকে সীমা মনেও করা হয় তবে তা চূড়ান্ত সীমা বা শেষ সীমা ছিল না। এজন্য যে, মানুষের জ্ঞান ক্রমিক হারে অগ্রসরমান, উন্নয়নমুখী ও তা ভ্রমণশীল, যার অবস্থান একান্তই সাময়িক। এর ওপর কখনোই স্থায়ী সৌধ নির্মাণ করা যায় না। কখনো কখনো তা বালির বাঁধের ন্যায় ধসে পড়ে। ফলে এর ওপর প্রাসাদ-সৌধ নির্মিত হলে তা যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তা নিতান্তই স্বাভাবিক। গির্জার লোকেরা সম্ভবত এরূপ খোশ-খেয়ালের বশবর্তী হয়ে এরূপ করে থাকবে এবং তাদের উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ছিল, এর দ্বারা ঐসব আসমানী গ্রন্থের মাহাত্ম্য ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু পরবর্তীতে এগুলোই তাদের জন্য দুর্বহ বোঝা এবং ধর্ম ও বুদ্ধিবৃত্তির সেই অশুভ যুদ্ধের নিমিত্ত হয়ে দাঁড়ায় যার ভেতর ধর্ম (সেই ধর্ম যার মধ্যে মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির মিশ্রণ তথা ভেজাল ছিল) পরাজিত হলো এবং য়ূরোপে ধর্মানুসারীদের এমন পতন ঘটল যার পর আর তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। এর চেয়েও বেশি দুঃখজনক ব্যাপার হলো, য়ূরোপ ধর্মহীন ও অবিশ্বাসী হয়ে গেল।

ধর্মের ধারক-বাহক এ সব পাদ্রী ও সাধু-সন্ন্যাসী এ সব সংযোজন-বিয়োজন ও বিকৃতির ওপরই থেমে থাকল না এবং সে সব ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিকেও যেগুলো লোকের মুখে মুখে ফিরত এবং এভাবে মশহূর হয়ে গিয়েছিল কিংবা বাইবেলের কোন কোন ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাতা যেগুলোকে তাদের ব্যাখ্যা-ভাষ্যে উল্লেখ করেছিলেন সেগুলোর ওপর ধর্মের আলখেল্লা পরিয়ে দিল এবং সেগুলোকে ধর্মীয় রঙে রঞ্জিত করে খ্রিস্টীয় শিক্ষামালা ও মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করে নিল যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ছিল একজন খ্রিস্টানের জন্য অপরিহার্য। এ বিষয়ে তারা বই-পুস্তক লিখল এবং সেই সব ভৌগোলিক



বিষয়গুলোকে, যার পেছনে কোন আসমানী সনদ ছিল না, Christian Topography নাম দিল এবং সেগুলো অবনত মস্তকে মেনে নিতে লোকজনকে বাধ্য করল। আর যারা তা মানল না তাদেরকে ধর্মদ্রোহী ও অবিশ্বাসী কাফির অভিধায় অভিহিত করল।

## ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ এবং চার্চের জুলুম

ঘটনাক্রমে এটা ছিল এমন এক সময় য়ূরোপে যখন ইসলাম ও মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাপাপড়া আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে। দার্শনিক, চিন্তানায়ক ও বিজ্ঞানীরা অন্ধ আনুগত্যের শেকল ভেঙে ফেলল। তারা এমন সব দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করল যেগুলো ভূগোল, ইতিহাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে ধর্ম গ্রন্থগুলোতে ঢুকিয়েছিল এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে ও খোলাখুলিভাবে তাত্ত্বিক সমালোচনা করল। তারা না বুঝে চোখ বন্ধ করে সেগুলো মেনে নিতে স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানাল। এরই সাথে সাথে তারা অর্থাৎ দার্শনিক ও বিজ্ঞানিগণ নিজেদের আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও অভিজ্ঞতার ঘোষণাও প্রদান করল। ব্যস! আর কি! ঘোষণা প্রদানের সাথে সাথেই ধর্মীয় মহলে তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। চার্চ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। তারা ছিল ক্ষমতা ও সীমাহীন প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক। প্রথমত তারা এদের ধর্মদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করল। অতঃপর খ্রিস্ট ধর্মের নামে তাদের হত্যা করা এবং তাদের সহায়-সম্পদ ও মালামাল ক্রোক করা বৈধ ঘোষিত হলো। এসব অবিশ্বাসী বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের বিচারের উদ্দেশে চার্চ কর্তৃক Court of Inquisition প্রতিষ্ঠিত হলো। পোপের ভাষায় ঃ কোর্ট সেই সব ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিকদের শাস্তি প্রদান করবে যারা শহরে-বন্দরে, ঘরে-বাইরে, অন্ধকার গৃহ কোণে, বনে-জঙ্গলে, পর্বত-গুহায় ও ক্ষেতে-খামারে ছড়িয়ে রয়েছে। এই সব কোর্ট তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উৎসাহের সাথেই পালন করে। তাদের গোয়েন্দা সমগ্র য়ূরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল এবং এ ব্যাপারে গোয়ন্দা বিভাগ অপরাধীদের পাকড়াও করতে এবং সন্দেহজনক লোকদের তৎপরতার ওপর খবরদারি করতে চেষ্টার আদৌ কোন ত্রুটি করেনি। জনৈক খ্রিস্টান পণ্ডিতের ভাষায় ঃ It was hardly possible for a man to be a Christian and die in his bed. অর্থাৎ একজন খ্রিস্টান বিছানায় মারা যাবে তা একেবারেই অসম্ভব। অনুমিত হয়, এই বিভাগ (Court of Inquisition) যেসব লোককে শাস্তি দিয়েছে তাদের সংখ্যা ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিন লক্ষের কম হবে না। এদের মধ্যে ৩২ হাজার লোককে জীবিত পুড়িয়ে মারা হয়। আর পুড়িয়ে মারা এসব লোকের মধ্যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ব্রুনোও ছিলেন যাঁর প্রধান অপরাধ ছিল, এই পৃথিবী ছাড়াও

আরও পৃথিবী আছে যেখানে অন্যান্য প্রাণীর বসবাস রয়েছে, তিনি এই মত পোষণ করতেন। ইনকুইজিশন বিভাগের কর্মকর্তারা তাঁকে এই সুপারিশসহ জাগতিক বিষয়ক কর্মকর্তাদেরকে নিকট অর্পণ করে যে, এঁকে যেন খুবই লঘু শাস্তি প্রদান করা হয় এবং এও যেন খেয়াল রাখা হয়, তাঁর শরীর থেকে এক ফোটা রক্ত যেন মাটিতে না পড়ে। এর অর্থ ছিল এই যে, তাঁকে যেন জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। ঠিক তেমনি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত গ্যালিলিওকে এজন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়, তিনি 'পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে' —এই মত পোষণ করতেন।

## ধর্মের বিরুদ্ধে রেনেসাঁপন্থীদের বিদ্রোহ

শেষ পর্যন্ত মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিবাদীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তারা ধর্ম ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করল। তারা ধর্মীয় গোষ্ঠীর এই জোর-জুলুম, স্থবিরতা ও inquisition বিভাগের ঐসব নিপীড়ন-নির্যাতনের কারণে এমন নাখোশ ও বিক্ষুব্ধ হল যে, ঐ সমস্ত ধর্মীয় মহলের বলে পরিচিত আকীদা-বিশ্বাস, ইলম ও আদব-আখলাক সম্পর্কে তাদের মনে ঘৃণার সঞ্চার হয়। আর তাদের মনে প্রথম দিকে খ্রিস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে, অতঃপর ক্রমান্বয়ে সাধারণভাবে ধর্মের বিরুদ্ধেই বৈরিতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং যেই যুদ্ধ প্রথম দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির পতাকাবাহী ও খ্রিস্ট ধর্মের (মূলত সেন্ট পলের ধর্মের) প্রতিনিধিবৃন্দের মাঝে ছিল, পরে তা ধর্ম মাত্রই ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারস্পরিক সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে। প্রগতিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির পতাকাবাহীরা নিজে থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিল, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম একে অন্যের প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী, যা কখনোই এক হতে পারে না। এদের মধ্যে আর কখনো সন্ধি ও সমঝোতা হতে পারে না। এজন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি বিশ্বস্ততা প্রমাণের নিমিত্ত প্রয়োজন হলো ধর্মের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এদের সামনে যখন ধর্মের নাম উচ্চারিত হতো তখন আকস্মিকভাবেই ধর্মীয় প্রতিনিধি ও গির্জাধিপতি পুরোহিতদের লোমহর্ষক জুলুম-নিপীড়নের ভয়াবহ ছবি তাদের চোখে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠত, ভেসে উঠত সেই সব নিরপরাধ জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ছবি যাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ও অসহায় অবস্থায় ঐসব জল্লাদদের হাতে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর নামে তাদের চোখের সামনে ক্রোধব্যঞ্জক চেহারা, রুদ্র ও রুক্ষ মূর্তি, অগ্নিক্ষরা চোখ, সংকীর্ণচেতা পাদ্রীদের স্থূল মস্তিষ্কই ভেসে উঠত। ফলে কেবল খ্রিস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে না হয়ে সাধারণভাবে সকল ধর্মের প্রতিই ভীতি ও ঘৃণাকে তারা জীবনের মূলনীতি বানিয়ে নেয় এবং ভবিষ্যত বংশধরদের সামনেও তারা এই ঘৃণা ও অবজ্ঞাকেই উত্তরাধিকার ও পুঁজিরূপে রেখে যায়।



## বুদ্ধিজীবীদের তাড়াহুড়া ও পক্ষপাতমূলক গোঁড়ামি

এই সব প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীর ভেতর এতটা ধৈর্য, ধীর-স্থির মাথায় অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তা-ভাবনা করার শক্তি ছিল না, ছিল না আবিষ্কার-অনুসন্ধানের সামর্থ্য ও যোগ্যতা যে, তারা প্রকৃত ধর্ম ও এর প্রতিনিধিত্বের মেকী দাবিদারদের মধ্যে পার্থক্য করবে এবং অনুধাবন করতে পারবে, এসব ঘটনায় আসলে ধর্ম কতটা দায়ী ছিল আর কতটা দায়ী গির্জার পাদ্রী-পুরোহিতদের মূঢ়তা, মূর্খতা, জোর-যবরদস্তি ও ভ্রান্ত প্রতিনিধিত্ব। যদি দ্বিতীয় দল এর জন্য দায়ী হন (এবং মূলত তারাই সকল অঘটনের জন্য দায়ী ছিল) তাহলে এর জন্য ধর্মকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো, তাকে শাস্তি দেওয়া ও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা কতটা সুবিবেচনাপ্রসূত? কিন্তু ক্রোধ, ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে শত্রুতা ও তাড়াহুড়াপ্রিয়তা এ বিষয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার অবকাশ তাদের দেয়নি যেমনটি সাধারণত বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় হয়ে থাকে। তারা ধর্মের প্রতি কোনরূপ নমনীয়তা প্রদর্শন কিংবা সমঝোতা পসন্দ করেনি।

তাদের মধ্যে সত্যের প্রতি এতটুকু আগ্রহ ও আপন জাতির কল্যাণ কামনা ও উদার মনোভাব ছিল না, ছিল না এমত মন-মানসিকতা যে, তারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করবে যা ছিল তাদের সমসাময়িক বহু জাতির ধর্ম এবং যা খুবই সহজভাবে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং ধর্ম ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যকার এই অপ্রয়োজনীয় সংঘর্ষের হাত থেকে মুক্তি দিত যা যুক্তিগ্রাহ্য ও ভাল কিছুর দাবি করত, অযৌক্তিক ও অপসন্দনীয় বিষয় থেকে বাধা দিত, দুনিয়ার ক্ষতিকর নয় এমন নির্দোষ বিনোদন ও উপকারী জিনিসের ব্যাপারে তাদের অনুমতি দিত, ক্ষতিকর ও ঘৃণ্য বিষয়গুলোকে নিষিদ্ধ হিসাবে অভিহিত করত এবং অহেতুক শেকল ও পায়ের বেড়িগুলো কেটে দিত যা বিকৃত ধর্মগুলো এবং জোর-যবরদস্তকারী ধর্মানুসারী ও ক্ষমতাসীন লোকেরা শরীরে চাপিয়ে রেখেছিল।

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۔

"যে তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার থেকে ও শৃঙ্খল থেকে যা তাদের ওপর ছিল" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৭)।

কিন্তু ক্রুসেড যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট অনুদার সম্প্রদায়প্রীতি, গোড়ামি এবং খ্রিস্টান পাশ্চাত্য ও মুসলিম প্রাচ্যের মাঝে সৃষ্ট সেই সব বিভেদের প্রাচীরের কারণে, সাথে সাথে গির্জাধিপতি পাদ্রী-পুরোহিতদের ইসলাম ও ইসলামের পয়গম্বরের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, অধিকন্তু অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের শ্রম স্বীকার না করা এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবন ও পারলৌকিক মুক্তি সম্পর্কে বেপরোয়া ও নিশ্চিন্ত হবার কারণে তারা ইসলামের প্রতি আদৌ কোন দৃকপাত করেনি।

এ ব্যাপারে স্বয়ং মুসলমানদের প্রয়োজনীয় তাবলীগি মানসিকতার অভাব ও অলসতাও ছিল। তারা কয়েক শত বছর য়ূরোপের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং এর অধিবাসীদেরকে ইসলামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রতি মনোনিবেশ করেনি, অথচ ইসলামী হুকুমতের উত্থান এবং য়ূরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্যের সঙ্গে সমকালীন ও সমতাসূচক সম্পর্ক থাকার দরুন এর পুরো সুযোগ ছিল।

মোটের ওপর য়ূরোপের লোকেরা এ রকম নাযুক মুহূর্তে ইসলামের নেতৃত্ব ও দিক-দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকে।

### য়ূরোপের বস্তুবাদ

সে যা-ই হোক, যা আশংকা করা গিয়েছিল অবশেষে তাই ঘটল। য়ূরোপ বস্তুবাদের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ল। ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিকোণ, মন-মস্তিষ্ক ও মানসিকতা, আচার-আচরণ ও সামাজিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য, সরকার ও রাজনীতি, মোট কথা, জীবনের সকল শাখা-প্রশাখায় বস্তুবাদ জেঁকে বসল ও বিজয়ী হলো, যদিও তা হঠাৎ করে নয়, বরং ক্রমান্বয়ে। প্রথম দিকে এর গতি ছিল শ্লথ, কিন্তু পরবর্তীতে অত্যন্ত জোরেশোরে ও দ্রুত গতিতে য়ূরোপ বস্তুবাদের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল। সমাজ বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী সৃষ্টিজগত নিয়ে এভাবে চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা করতে শুরু করল যেন এর কোন স্রষ্টা নেই, নেই কোন পরিচালক ও ব্যবস্থাপক এবং এই প্রকৃতি ও বস্তুর ঊর্ধ্বে এমন কোন শক্তি নেই যিনি এই জগতে হস্তক্ষেপ করেন এবং এর শান্তি-শৃংখলা বিধানে ভূমিকা পালন করেন। তারা প্রকৃতি জগত ও এর বাহ্যিক অবয়বসমূহ ও প্রভাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নির্ভেজাল যান্ত্রিক পন্থায় করতে লাগল। আর তারা এর নাম দিল বৈজ্ঞানিক ও গবেষণামূলক পদ্ধতি এবং এমন প্রতিটি আলোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি যার ভিত্তি আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁর বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত, অন্ধ আনুগত্যমূলক ও অবৈজ্ঞানিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হতে লাগল। তারা একে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করতে থাকল : আর এ পথের মনযিল ছিল এই যে, তারা চলতে চলতে



শক্তি (Energy) ও বস্তু ভিন্ন আর সব কিছুই তারা অস্বীকার করল ও প্রত্যাখ্যান করে বসল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন প্রতিটি বস্তু মানতে আপত্তি জানাল যা ওজন, পরিমাণ ও পরিসংখ্যানের বাইরে। এর স্বাভাবিক ও যৌক্তিক পরিণতি দাঁড়াল এই, আল্লাহর অস্তিত্ব ও বুদ্ধির অগম্য সব কিছুই কল্পনা হিসাবে ঠাঁই পেল যেগুলো জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত হতো না।

তারা দীর্ঘ দিন যাবত আল্লাহ্কে অস্বীকার করেনি এবং ধর্মের বিরুদ্ধেও সুস্পষ্টভাবে ও খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। আসলে তারা সকলেই নাস্তিকও ছিল না, ছিল না ধর্মের দুশমন। কিন্তু যে চিন্তাধারা ও আলোচনার যেই পথ তারা এখতিয়ার করেছিল, যেই অবস্থান তারা গ্রহণ করেছিল তা এমন ধর্মের সঙ্গে খাপ খেতে পারত না যার গোটা প্রাসাদই ঈমান বিল-গায়ব তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস, ওহী ও নুবূওয়াতের ভিত্তির ওপর স্থাপিত এবং যা পারলৌকিক জীবনের ওপর এতটা জোর দেয় আর এর ভেতর কোনটাই অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের আওতায় আসে না এবং ওজন, পরিমাপ ও পরিসংখ্যান দ্বারাও তার সত্যতা সমর্থন করা যায় না। এজন্য প্রতিদিনই তাদের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় এবং এসব মেনে নিতে দোদুল্যমানতা সৃষ্টি হতে থাকে।

য়ূরোপে রেনেসাঁ তথা পুনর্জাগরণের পরের লোকেরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত বস্তুগত দৃষ্টিকোণ ও বস্তুগত জীবন এবং ধর্মীয় কাজকর্ম ও প্রথাগুলোকে একত্র ও সমন্বিত করার প্রয়াস চালাতে থাকে। ধর্মের প্রতি আনুগত্য থেকে তারা তখনও পুরোপুরি ভাবে মুক্ত ও স্বাধীন হয় নি এবং খ্রিস্টান বিশ্বে ধর্মীয় পরিবেশ তখনও অবশিষ্ট ছিল, একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। নৈতিক ও সামাজিক স্বার্থেরও দাবি ছিল যে, নামকা-ওয়াস্তে হলেও ধর্মীয় সমাজ ব্যবস্থা অবশ্যই টিকিয়ে রাখতে হবে এবং তা থাকা দরকারও বটে, যা জাতির লোকদের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করবে এবং দেশকে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু বস্তুবাদী সভ্যতার গতি এত দ্রুত ছিল যে, ধর্ম ও তার প্রথাগুলো (রুসূম) তার সাথী হতে পারেনি। বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিক ধর্মের একত্র ও সমন্বিতকরণের মাঝে কষ্ট, লৌকিকতা ও সময়ের অপচয় ছিল। ফলে সে কিছুদিন পর এই লৌকিকতাকেও বিসর্জন দিল এবং পরিষ্কার ও খোলাখুলি ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদকে গ্রহণ করল।

ঠিক এ যুগেই য়ূরোপের প্রতিটি দেশে ও প্রতিটি অঞ্চলে এক বিপুল সংখ্যক এমন সব লেখক, সাহিত্যিক, সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন যারা বস্তুবাদের শিঙ্গায় ফুঁ দিলেন এবং দেশের জনগণের মন-মস্তিষ্কে বস্তুপূজার বীজ বপন করলেন। নীতিশাস্ত্রবিদগণ নীতি-নৈতিকতার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দান করতেন। তারা কখনো-বা উপযোগিতাবাদের দর্শন পেশ করতেন, আবার কখনো বা পেশ

করতেন "খাও, দাও, ফুর্তি কর"-এর দর্শন। মেকিয়াভেলী (১৪৬৯-১৫২৭) ইতিপূর্বেই 'ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা' এই দর্শন পেশ করেছিলেন এবং নীতি-নৈতিকতাকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন। একটি হলো সরকারী আর আরেকটি ব্যক্তিগত। তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদি ধর্মের প্রয়োজন থাকেই তাহলে তা থাকবে কেবল মানুষের একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে যার সঙ্গে রাজনীতির কোনই সম্পর্ক থাকবে না। রাষ্ট্র থাকবে সব কিছুর উর্ধ্বে এবং সব কিছুর মুকাবিলায় তার থাকবে অগ্রাধিকার। সে সব কিছুর থেকে অধিক মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। খ্রিস্ট ধর্মের সম্পর্ক থাকবে কেবল অপার্থিব তথা পারলৌকিক জীবনের সঙ্গে। আমাদের এই পার্থিব ও জাগতিক জীবনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মভীরু ও সৎ লোকের কোন প্রয়োজন রাষ্ট্রের নেই, এমন কোন উপকারিতাও এর নেই। এজন্য যে, তারা হয় ধর্মের ও ধর্মীয় বিধি-বিধানের অনুসারী ও অনুগত এবং তারা প্রয়োজনে নৈতিক নীতিমালা ও ঔচিত্যবোধকে উপেক্ষা করতে পারে না। রাজা-বাদশাহ ও প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে শৃগালের মত ধূর্ত হতে হয় এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ও রাজনৈতিক স্বার্থের গরজে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, মিথ্যা কথন, ধোঁকা ও প্রতারণা, খেয়ানত ও মুনাফিকীর মত নীতিহীন কাজ করতে হয়। এ ব্যাপারে তাকে দ্বিধান্বিত হলে চলে না, হওয়া উচিত নয়। মেকিয়াভেলীর এই আহ্বান পুরোপুরি কার্যকর হলো, সফল হলো। ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদী দর্শন (যা প্রাচীন ধর্মের স্থান দখল করছিল) এই মতবাদকে পুরোপুরি সহায়তা প্রদান করে।

লেখক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা তাদের যাদুকরী বক্তৃতা, লেখনী ও সম্মোহন সৃষ্টিকারী বাগ্মিতা ও কাব্যের মাধ্যমে প্রাচীন নীতি-নৈতিকতা ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে এক বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। তারা অন্যায় ও পাপকে মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক বানিয়ে পেশ করে। মনুষ্য প্রকৃতি ও মানবীয় স্বভাবকে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত, মানুষকে তার দায়িত্ব, কর্তব্য ও জওয়াবদিহিতার হাত থেকে স্বাধীন তথা একেবারে বল্গাহীন ও বাধা-বন্ধনহীন মুক্ত বিহঙ্গ হবার প্রচার-পোপাগান্ডা চালায়। জীবনের মজা লুটবার, প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার যাবতীয় চাহিদার পূর্ণ পরিতৃপ্তির ও ভোগ-বিলাসের প্রকাশ্য আহ্বান জানায় এবং এই জীবনের মূল্যায়নে বিরাট বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনের সহায়তা নেয় এবং 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতা শূন্য থাক'-এর দর্শন মাফিক নগদ প্রাপ্তি এবং বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগত স্বার্থ ব্যতিরেকে আর সব কিছুকেই প্রত্যাখ্যান ও উপেক্ষা করে।



আর এভাবেই ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জীবন প্রতিমা পূজারী গ্রীস ও রোমের জাহিলী যিন্দেগীর প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয়। এ ছিল যেন তার নতুন সংস্করণ যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে নতুনভাবে সযত্ন প্রয়াস সহকারে তৈরি করা হয়েছিল। গ্রীস ও রোমের যেসব ছবি প্রাচ্য খ্রিস্ট ধর্ম হাল্কা ও ফিকে করে দিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্রকররা তাকে পুনরায় উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল করে তোলে। এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। আজকের পশ্চিমা জাতিগুলো ঐসব গ্রীক, রোমান ও পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠীরই সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে নিকট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যূরোপের বর্তমান ধর্মীয় জীবনও আধ্যাত্মিকতা থেকে তেমনি শূন্য যেমনটি ছিল গ্রীকদের ধর্ম। এই দুর্বলতা, ভয়-ভক্তিমিশ্রিত বিনয় ও ধর্মীয় গাম্ভীর্যের ঘাটতি, জীবনে ক্রীড়া- কৌতুক তথা খেল-তামাশার আধিক্যেরও সেই একই সব অবস্থা যা গ্রীসে ছিল। এটা ছিল সে সব প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণার পরিণতি যা যূরোপে পূর্ণ জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং তাই দীন-ধর্মের স্থান দখল করে নেয়। ঠিক তেমনি আজ জীবনের কামনা-বাসনা, ভোগের চাহিদা ও স্বাদ গ্রহণ এবং দুনিয়ার বুকে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণের অবস্থাও ঠিক তাই যা সক্রেটিস তার যুগের গণতান্ত্রিক যুবকের বলে বর্ণনা করেছেন দার্শনিক প্লেটোর 'রিপাবলিক' নামক গ্রন্থে। অধিকন্তু ধর্মীয় সন্দেহ-সংশয় ও দ্বিধা-সংকোচ, ধর্মীয় আইন-কানুন ও শৃঙ্খলা, ধর্মীয় দায়িত্ব-কর্তব্য ও প্রথাসমূহের অমর্যাদা করার ক্ষেত্রেও আজকের যূরোপ গ্রীস ও রোম থেকে পিছিয়ে নেই।

**খ্রিষ্ট ধর্ম অথবা বস্তুবাদ**

বাস্তব সত্য হলো, আজকের যূরোপের আত্মা ও মননকে নিয়ন্ত্রণকারী যে ধর্ম তা খ্রিস্ট ধর্ম নয়, বরং বস্তুবাদ ও বস্তুপূজা এবং পাশ্চাত্য জীবনধারা থেকে তার প্রতিটি পদক্ষেপে এর সত্যতা সমর্থিত হয়। Islam at the Crossroad-এর লেখক বলেন ঃ

"No doubt, there are still many individuals in the West who feel and think in a religious way and make the most desperate efforts to reconcile their beliefs with the spirit of their civilization, but they are exceptions only. The average Occidental—be he a Democrat or a Fascist, a Capitalist or a Bolshevik, a manual worker or an intellectual—knows only one positive 'religion', and that is the worship of material progress, the belief that there is no other goal in life than to make life continually easier or, as the current expression goes, 'independent of nature'. The temples of this 'religion' are the gigantic factories, cinemas, chemical laboratories, dancing halls,

hydro-electric works; and its priests are bankers, engineers, film-stars, captains of industry, finance magnates. The unavoidable result of this craving after power and pleasure in the creation of hostile groups armed to the teeth and determined to destroy one another whenever and wherever their respective interests come to a clash. And on the cultural side the result is the question of practical utility alone, and whose highest criterion of good and evil is the material success."1

"এতে কোনই সন্দেহ নেই, পশ্চিমা দেশগুলোতে এখনো এমন বহু লোক পাওয়া যাবে যারা ধর্মীয় ধারায় অনুভব করেন, চিন্তা করেন এবং প্রাণপণ চেষ্টা করেন তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও সভ্যতার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে। কিন্তু তারা হচ্ছেন ব্যতিক্রম মাত্র। গণতন্ত্রী অথবা ফ্যাসিস্ট, পুঁজিবাদী অথবা সমাজতন্ত্রী বলশেভিক, দিন মজুর অথবা বুদ্ধিজীবী ॥ য়ূরোপের যে কোন সাধারণ ও মধ্যম শ্রেণীর মানুষ একটি মাত্র ইতিবাচক ধর্মকেই চেনে ও জানে আর তা হল বস্তুবাদী উন্নতি-অগ্রগতির পূজা। তার বিশ্বাস, জীবনকে ক্রমাগত মুক্ত, বাধাবন্ধনহীন ও সহজতর করে তোলা ব্যতিরেকে জীবনের আর কোন লক্ষ্য নেই অথবা চলতি কথায় প্রকৃতি-নিরপেক্ষ হওয়াই তার ধর্ম। বিরাট বিরাট কারখানা, সিনেমা, রাসায়নিক গবেষণাগার, নাচঘর তথা নৃত্য-কলা ভবন, পানি-বিদ্যুৎ ইঞ্জিনিয়ার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, শিল্পপতি ও অর্থবিত্তের অধিকারী কৃতবিদ্য পুরুষ। ক্ষমতা ও আনন্দের এই নেশার অপরিহার্য পরিণাম হয়েছে যেখানে সেখানে স্বার্থের সংঘাতউদ্ভূত সশস্ত্র দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর ফল হচ্ছে এমন এক ধরনের মানুষ সৃষ্টি যাদের নীতি-বোধ নিছক উপযোগবাদের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ এবং যার ভাল-মন্দের সর্বোচ্চ মাপকাঠি হচ্ছে একমাত্র বস্তুবাদী সাফল্য ও কামিয়াবী।"১

উক্ত লেখক আরও বলেন ঃ

"পশ্চিমা সভ্যতা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রবলভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, তার বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ধারায় আল্লাহ্‌র কোন স্থান নেই। আর তার কোন প্রয়োজনও সেখানে অনুভব করা হয় না।"২

লন্ডন ভার্সিটির দর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান Professor C.E.M. Joad তাঁর Guide to Modern Wickedne নামক গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

1. Islam at the Crossroads, 5th edition, 55-56.



"আমি সম্প্রতি কুড়ি জন ছাত্রছাত্রীর একটি তরুণ দলকে যাদের সকলের বয়স বিশের কিছু বেশিই হবে, জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাদের মধ্যে কতজন যে কোন অর্থে খ্রিস্টান? কেবল তিনজন এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিল এবং তারা যে খ্রিস্টান তা স্বীকার করল। সাতজন ছাত্রছাত্রী বলল, তারা এ ব্যাপারে কখনো ভেবে দেখেনি। বাকী দশজন পরিষ্কারভাবে বলল, তারা খোলাখুলি খ্রিস্ট ধর্মের বিরোধী। আমার ধারণা খ্রিস্ট ধর্ম যারা মানে আর যারা মানে না তাদের এই আনুপাতিক হার এদেশে কোন ব্যতিক্রমী ও অস্বাভাবিক উদাহরণ নয়। তবে হ্যাঁ, এই প্রশ্ন যদি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর কিংবা অন্যূন বিশ বছর আগে করা হতো তবে এর উত্তর অনিবার্যভাবেই প্রদত্ত উত্তর থেকে ভিন্নতর হতো। এরই ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, খুব কম সংখ্যক লোকই আছে যারা Canon Barry- এর এরূপ ধারণার সাথে একমত হবেন, এক বিরাট খ্রিস্টীয় পুনর্জাগরণ ও উন্নতি বর্তমান পৃথিবীকে মুক্তি দিতে পারে। আমার মতে তাঁর এই দাবিকে যথার্থ প্রমাণ করার মত কোন জিনিস নেই। তবে হ্যাঁ, এটা ভিন্ন কথা, এটা তাঁর আন্তরিক কামনা। এমন বহু হয় যে, কামনা ধারণা সৃষ্টি করে দেয়। কিন্তু তা দলীল-প্রমাণ সৃষ্টি করতে পারে না। এদেশের অবস্থা ও লক্ষণাদি পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, খ্রিস্টান গির্জাগুলো আগামী শতাব্দীতে তাদের আয়ুষ্কাল পূর্ণ করবে। একটি দৈনিক পত্রিকার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে এর সমর্থন মিলবে ঃ

"৭৭ বছরের এক বৃদ্ধ এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, যদ্দারা সে পবিত্র বাইবেলের পুরনো কপিগুলোকে বন্দুকের বাট, কৃত্রিম রেশম, গাট্টা পরচা ও টাকার নোটে রূপান্তরিত করতে পারবে। এই মেশিন সে কার্ডিফ ফ্যাক্টরী ও আটটি অপরাপর কারখানায় স্থাপন করেছে এবং বাইবেলের কপি থেকে যুদ্ধের আধুনিক সাজ-সামান তৈরি হচ্ছে। আবিষ্কারক এই মেশিনের সাহায্যে বিপুল সম্পদ বানিয়েছে।"

"অতএব হে লোকসকল! যাদেরকে আল্লাহ্ কান দিয়েছেন তারা শুনে নাও।"১

## বিত্ত-পূজা

এই লেখকই তাঁর Philosophy of Our Times নামক অপর এক গ্রন্থে বলেন,

"শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইংল্যাণ্ডের কল্পনা ও ধ্যান-ধারণায় 'কি করে বিত্ত-সম্পদ লাভ করা যায়' এটাই জেঁকে বসে আছে। সম্পদ লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা গত দুই শতাব্দী যাবত অন্যান্য সকল কর্মপ্রয়াস ও কর্ম প্রচেষ্টার ওপর

1. Guide to Modern Wickedness, p-114-15.

বেশি কাজ করে যাচ্ছে। কেননা সম্পদ মালিকানা লাভের মাধ্যম এবং ব্যক্তিগত মালিকানার প্রাচুর্য, দীপ্তি ও মাহাত্ম্য দ্বারাই মানুষের যোগ্যতা ও উপযুক্ততার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য, সিনেমা, রেডিও এবং কখনো কখনো গির্জার মিম্বরগুলো থেকে বছরের পর বছর পাঠক ও শ্রোতাদেরকে এই শিক্ষাই প্রদান করা হয়েছে, সভ্য জাতি তারাই যাদের মধ্যে লাভ ও অর্জনের প্রেরণা চরমভাবে উন্নতি করেছে।

"এই বিত্ত পূজা আমাদের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কেননা ধর্ম এই বিশ্বাস ও প্রতীতি দান করে যে, দারিদ্র্য ভাল এবং ধনাঢ্যতা কেবল খারাপই নয়, বরং ধনীদের পক্ষে সৎ হবার সম্ভাবনা এতটাই কম গরীবদের পক্ষে যতটা বেশি। যদিও বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার দাবি এবং ধর্মীয় শিক্ষা যুগপৎভাবে এটাই শেখায়, খোদা-পরস্তী ও জান্নাত লাভ দরিদ্রের পক্ষেই সম্ভব। তথাপি লোকে ধর্মের শিক্ষাকে সত্য মনে করে সে মতে কাজ করবার কোন প্রকার আগ্রহ জাহির করে নি এবং বর্তমান বিত্ত-সম্পদ অর্জনকে স্থায়ী পারলৌকিক শান্তি লাভের ওপর সন্তুষ্ট চিত্তেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সম্ভবত তাদের এই ধারণা যে, বিছানায় পড়ে মরার আগে মৃত্যুশয্যায় তওবা করে তারা পরকালে এতটাই লাভবান হতে পারবে যতটা তারা লাভবান হচ্ছে এই পার্থিব জগতের সম্পদ ভাণ্ডার তথা ব্যাংক-ব্যালান্স থেকে। তাদের এই ধারণাকে স্যামুয়েল বাটলার তাঁর পুস্তকে এভাবে প্রকাশ করেছেন, দুষ্টপ্রকৃতির লেখকরা বলে, আমরা খোদা ও সম্পদের একই সাথে পূজা করতে পারি না। আমরা একথা মেনে নিলাম যে, এটা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু অর্জনযোগ্য জিনিস কবেই বা সহজলভ্য?

"আমাদের নীতি যা-ই হোক না কেন— ঘটনা হলো, মুখে আমরা যাই বলি না কেন, কাজের বেলায় আমরা সকলেই বাটলারের পাক্কা অনুসারী। আমরা বিত্ত-সম্পদের এতটাই ভক্ত-অনুরক্ত এবং আমাদের এই বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, সম্পদই ব্যক্তি ও সাম্রাজ্যের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হিসাবে দেখা দেয়॥ এতটাই দৃঢ়ভাবে মনের গহীনে প্রোথিত যে, এর দ্বারা জগতের দু'টো উৎসাহদায়ক নীতি বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা বিরাট ঐতিহাসিক গুরুত্বের অধিকারী। এর একটি হল 'লেসেজ ফেয়ার' তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতার নীতি অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করার নীতি যা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে জেঁকে বসেছিল। এই নীতির দাবি হলো, মানুষ সব সময় নিজের কাজকে অধিক থেকে অধিকতর আর্থিক মুনাফার ওপর সীমাবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত রাখে যেন তার ভোগের ধর্মই হলো, কাজের প্রেরণাদায়ক শক্তি দিলের আবেগ-উদ্দীপনা নয়, বরং কেবলই সম্পদ আহরণের নেশা।



"দ্বিতীয় মূলনীতি হলো যা বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের সর্বত্র জেঁকে বসতে দেখা যাচ্ছে, আর তা হলো, কার্ল মার্কসের Theory of Economic determinism. এই নীতি বা তত্ত্ব বলে, মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সর্বদাই তার আর্থিক প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভরশীল এবং এই ব্যবস্থাই তার সাহিত্য, নীতি ও ব্যবহারশাস্ত্র, ধর্ম, যুক্তিবিদ্যার, অধিকন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থার স্রষ্টা হয়ে থাকে। এই দুই নীতির গ্রহণযোগ্যতার সীমাবদ্ধতা সেই মূল্যবোধের ওপর যা আমাদের পুরুষ ও মহিলারা স্পষ্টতরভাবে সম্পদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সৌন্দর্যের মানের ওপর রাখে।"১

একই গ্রন্থে অপর এক স্থানে তিনি বলেন,

" যেই জীবন দৃষ্টি এই যুগের ওপর জেঁকে বসে আছে তা হলো অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সকল সমস্যা ও সমস্ত ব্যাপারকেই পেট ও পকেটের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।" ২

মি. জন গুন্থার নামক বিশিষ্ট আমেরিকান সাংবাদিক তাঁর Inside Europe নামক পুস্তকে এই বিত্তপূজা নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করেছেনঃ

"ইংরেজরা সপ্তাহে ছয় দিন ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের পূজা করে থাকে। কেবল সপ্তম দিনেই তারা বৃটিশ গির্জার দিকে মুখ ফেরায়।"

## আল্লাহ্ বিস্মৃতি ও আত্মবিস্মৃতি

ঐ সব লোক যারা অন্য কোন জীবনে বিশ্বাসী নয়, 'খাও-দাও, ফুর্তি কর, জীবনের স্বাদ লুটে নাও' ছাড়া অন্য কোন জীবন-দর্শনে যাদের বিশ্বাস নেই কিংবা ব্যক্তিগত ও জাতীয় সমুন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া যারা আর কোন মহত্তর লক্ষ্যে বিশ্বাস রাখে না এবং আল্লাহ্র সঙ্গে এই নামকা-ওয়াস্তে এই সামান্য কিছু ছাড়া যাদের কোন সম্পর্ক নেই তাদের সম্বন্ধে এই আশা পোষণ করা কতটা সঠিক হবে যে, কোন বিপদ মুহূর্তে তাদের ভেতর সকাতর অনুনয়-বিনয় দেখা দেবে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের অবস্থা সৃষ্টি হবে। কাফির-মুশরিকদের সম্পর্কে কুরআন বলেঃ তারা বিপদ-আপদের সময় কেবল আল্লাহকে ডেকে থাকে এবং এমনতরো মুহূর্তে কেবল আল্লাহ্র কথাই স্মরণ হয়।" কিন্তু য়ুরোপের বস্তুপূজারীরা বস্তুপূজার ক্ষেত্রে এতটা এগিয়ে যায় এবং বাহ্যিক উপায়-উপকরণ ও কার্যকারণ তাদের ওপর এতটা জেঁকে বসে, তাদের জীবনে আল্লাহবিমুখতা এবং হৃদয় এতটা কঠিন ও অনুভূতিশূন্য হয়ে গিয়েছিল যে, তারা এই আয়াতের প্রতিপাদ্যে পরিণত হয়।

---

1. Philosophy for our Times. pp-338-40, ২. প্রাগুক্ত।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ - فَلَوْلَاۤ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

"তোমার পূর্বেও বহু জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি; তারপর তাদেরকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ- ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করেছি যাতে তারা বিনীত হয়। অনন্তর আমার শাস্তি যখন তাদের ওপর আপতিত হলো তখন তারা কেন বিনীত হলো না? অধিকন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।" (সূরা আনআমঃ ৪২-৪৩)

অন্য সূরায় ঃ

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ -

"আমি ওদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, কিন্তু ওরা ওঁদের প্রতিপালকের প্রতি বিনীত হলো না এবং কাতর প্রার্থনাও করল না।" (মু'মিনুন ঃ ৭৬)

অনন্তর আপনি যুদ্ধের কঠিনতম মুহূর্তেও এবং সঙ্গীনতম সময়ও আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ, বিনীত অবস্থা, দিলের ভঙ্গুরতা, নমনীয়তা ও বান্দাসুলভ মানসিকতা তাদের ভেতর দেখতে পাবেন না। তেমনি জাতির আচার-আচরণ, কার্যকলাপ, ক্রীড়া- কৌতুক ও হাসি-তামাশার ভেতরও আপনি কোনরূপ পার্থক্য দেখবেন না। পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও চিন্তাশীল মহল, লেখক, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ নিয়ে গর্ব করে থাকে এবং একেই তারা মানসিক স্থৈর্য ও দৃঢ়তা, প্রশংসনীয় মনোবল এবং জাতীয় মর্যাদাবোধ বলে অভিহিত করে থাকে। প্রাচ্যের আল্লাহ পূজারী এবং মুসলমানদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হৃদয়হীনতা, গাফিলতি ও ক্রীড়া-কৌতুকে মেতে থাকা, সংজ্ঞাহীনতা ও আত্মবিস্মৃতি বৈ কিছু নয়।

"লন্ডনে একরাত" শিরোনামে লন্ডনেই বসবাসকারী জনৈক ভারতীয় (পরে পাকিস্তানী) ১৯৪০-৪১ সালের বিশ্বযুদ্ধকালীন বিমান হামলার সময়কার ঘটনা তাঁর নিজের আত্মজীবনীতে এভাবে পেশ করেছেন ঃ

"আমরা সেই রাত্রে সমস্ত বন্ধু-বান্ধব কয়েক দিন কয়েক রাত উপর্যুপরি বিমান হামলার ফলে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে এক অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ সম্মিলিত ইংরেজ-ভারতীয় খানাপিনার আয়োজনে মেতে উঠলাম। গৃহকর্ত্রী যিনি ছিলেন



তিনি তার বাবুর্চিখানা ও তার যাবতীয় সামান আমাদের সোপর্দ করলেন এবং উপরতলার বড় কামরাটিও নাচের জন্য খালি করে দিলেন। আমরা জনা পঁচিশেক নারী-পুরুষ সবাই মিলে নিজের হাতে রান্না করলাম। এরপর খানাপিনা শেষে নাচ-গান শুরু করলাম। এমন সময় অকস্মাৎ বিমান হামলার বিপদ সংকেত হিসাবে সাইরেন বেজে উঠল। প্রথমে তো আমরা সবাই একদম নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের নাচ অব্যাহত রইল। এমত অবস্থায় একজন বলে উঠল, এখন কি করতে চাও? 'Go on' (চালিয়ে যাও) এই ছিল জনৈক মহিলার উত্তর। তারপর নাচগান পূর্বের মতই অব্যাহত রইল। আমরা নাচতে থাকলাম। আর আমাদের নাচগান ও অট্টহাসির শব্দে বাড়ি তো বাড়ি গোটা মহল্লাটাই কেঁপে উঠতে লাগল।"[১]

উদ্ধৃত অংশেরই কিছু ওপরে তিনি লিখছেন ঃ

"অল্প দিন পরই এটা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হলো যে, প্রতি দিনই সন্ধ্যা ৭-৮ টার দিকে সাইরেন বাজত। শত্রু বিমানের প্রপেলারের ঘর ঘর আওয়াজ শোনা যেত। সার্চ লাইটের জ্বলন্ত জাল আসমানে নিভে যেত। আর এ দিকে বিমান বিধ্বংসী কামানের আওয়াজে কানে তালা লাগার জোগাড় হতো। আসমান-যমীন কেঁপে উঠত থরথর করে। সে সময় সিনেমা হলগুলোতে সিনেমা প্রদর্শন অব্যাহত থাকলে ছবি কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যেত এবং পর্দায় নিম্নোক্ত নির্দেশ ভেসে উঠত ঃ

"এখন বিমান হামলা শুরু হয়েছে। কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও ছবি প্রদর্শন অব্যাহত থাকবে। যেসব দর্শক আশ্রয় কেন্দ্রের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে চান যেতে পারেন। নিচে বাম দিকেই যাবার পথ রয়েছে।

"কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, একজনও তার আসন ছেড়ে উঠত না, সবাই যার যার আসনে বসে থাকত, এরপর যথানিয়মে ছবি প্রদর্শন শুরু হয়ে যেত।"[১]

"ক্রীড়া-কৌতুক ও খেল-তামাশার মধ্যে এ ধরনের নিমগ্নতা ও আত্মবিস্মৃতির দৃষ্টান্ত প্রাচীন গ্রীস ও রোমেই কেবল দেখতে পাওয়া যায়। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, যে ঐতিহাসিক পম্পেই নগরীর আগ্নেয়গিরিতে যখন বিস্ফোরণ ঘটে এবং আকাশ থেকে যখন অগ্নি শিখা ও জ্বলন্ত অঙ্গার বর্ষিত হয় এবং মাটিতে ভূমিকম্প দেখা দেয় তখন ছিল দিনের বেলা। লোকজন এমফি থিয়েটারে (যেখানে একই সঙ্গে বিশ হাজার দর্শক উপবেশন করতে পারত)

১. আগা মুহাম্মদ আশরাফ দেহলভী এম.এ. কৃত "হাওয়াই হামলা", পৃ.৭১।

বসে সার্কাস দেখছিল যেখানে হিংস্র প্রাণী খাঁচার মধ্যে জীবন্ত মানুষকে ছিঁড়ে ফেড়ে ও কামড়ে খাচ্ছিল। ঠিক এমনি এক নিষ্ঠুর ও লোমহর্ষক খেলতামাশা চলাকালেই ভূমিকম্প শুরু হয়, শুরু হয় আকাশ থেকে অগ্নি বৃষ্টি। যে যেখানে ছিল সেখানে জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। যারা বাইরে বেরিয়ে ছিল তারাও প্রচণ্ড অন্ধকারে পরস্পরের ধাক্কাধাক্কিতে আহত ও নিহত হয়। এভাবে আহত-নিহতদের সংখ্যা যে কত ছিল কে তা নিরূপণ করবে? অল্প সংখ্যক সৌভাগ্যবান লোকই কেবল এই মহাদুর্যোগের হাত থেকে নৌকা ও জাহাজযোগে পালিয়ে জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল। আঠার শো বছর যাবত এই শহর পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হারিয়ে ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই কেবল জানা যায়, শহরটি একেবারে হারিয়ে যায় নি, বরং মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। খনন কাজ শুরু হয় এবং কয়েক বছরের নিরন্তর চেষ্টার পর সবক হাসিলের উপকরণরূপী মিউজিয়াম হিসাবে অবিকল শহরটি গোটাই আবিষ্কৃত হয়।"

اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ -

"তবে কি জনপদের অধিবাসীরা ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের ওপর আসবে পূর্বাহ্নে যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত?" (সূরা আল-আ'রাফঃ ৯৮)

আল্লাহ্ পূজারী, আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে যারা অবহিত তাদের কর্মপন্থা, জীবনধারা, চরিত্র ও ব্যবহার, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপদ মুহূর্তে উপরিউক্ত কর্মপন্থার চাইতে কতটা ভিন্ন ও বিরোধী তার পরিমাপ কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের সঙ্গেও করা যেতে পারে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কোন দলের মুখোমুখি হবে তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহ্কে বেশি স্মরণ করবে যাতে করে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা আনফালঃ ৪৫)

সাহাবায়ে কিরাম (রা) বলেন, যখনই কোন সমসা-সংকুল ও সংকটজনক পরিস্থিতি এসে পড়ত অমনি রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। বদর যুদ্ধের সময় নবী করীম (সা) কাতার সোজা করেন সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে কাফিরদের মুকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দেন এবং নিজে তাঁবুতে গিয়ে আল্লাহ্র সামনে সিজদায় পড়ে গিয়ে মুনাজাত ও ফরিয়াদ



করতে শুরু করেন। এ সময় তিনি বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ! এই দলটি যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে দুনিয়ার বুকে তোমার ইবাদত-বন্দেগী করার মত আর কেউই থাকবে না।"

**পাশ্চাত্যের মেযাজ ঃ একজন প্রাচ্যবাসীর দৃষ্টিতে**

প্রকৃতিগত, ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এই বস্তুবাদিতা ইতিহাসের প্রাচীনতম কাল থেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পশ্চিমা জীবন-যিন্দেগীর প্রাণসত্তা ও মেযাজে পরিণত হয়ে গিয়েছে। প্রাচ্যের অন্যতম বিচক্ষণ আলিম ও দার্শনিক বিখ্যাত পর্যটক আবদুর রহমান কাওয়াকিবী (মৃত. ১৩২০হি.) এই শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর "তাবায়ে-উল-ইস্তিব্দাদ" (طبائع الاستبداد) নামক গ্রন্থে এই সত্য ও বাস্তবতা তুলে ধরেছেন এভাবে ঃ

"পাশ্চাত্যের লোকেরা প্রকৃতিগতভাবেই বস্তুবাদী তথা বস্তুপূজারী, স্বভাবগতভাবে কঠিন হৃদয় ও লেনদেনের ব্যাপারে কঠোর হয়ে থাকে। তারা স্বভাবত স্বার্থপর, বিদ্বেষপরায়ণ ও প্রতিশোধপরায়ণ। মনে হয়, উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও মহৎ প্রেরণার ভেতর থেকে এখন আর তাদের কাছে কিছুই অবশিষ্ট নেই যা প্রাচ্যের খ্রিস্ট ধর্ম তাদেরকে দিয়েছিল। একজন জার্মানের কথাই ধরুনঃ মেযাজগতভাবে শুষ্ক ও প্রকৃতিগতভাবে রূঢ় ও কর্কশ। তার মতে একজন দুর্বল মানুষের বেঁচে থাকার কোনই অধিকার নেই। তার কাছে শক্তি, হ্যাঁ, কেবল শক্তিই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য লাভের একমাত্র হাতিয়ার। আর শক্তির উৎস হলো অর্থ-বিত্ত। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অবশ্যই মর্যাদা দেয়, কিন্তু তা দেয় বিত্তের খাতিরে। তারা সম্মান লাভে আগ্রহী, কিন্তু তাও অর্থ-বিত্তের স্বার্থে। গ্রীক ও ইটালিয়ানরা প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থপর ও স্বাধীন মত প্রকাশকারী। তাদের মতে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিবৃত্তি স্বাধীনতা ও বল্লাহীনতার অপর নাম। আর জীবন বলা হয় বেহায়াপনাকে, সৌন্দর্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের অপর নাম সম্মান এবং অপরের ওপর প্রাধান্য ও বিজয় লাভ করাই হলো ইজ্জত লাভ।"

পশ্চিমা স্বভাব ও মন-মানসিকতার এটাই হলো সহীহ-শুদ্ধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। মরহুম কাওয়াকিবী এই দু'টো জাতিগোষ্ঠীকে কেবল নমুনা হিসেবে বাছাই করেছেন। অন্যথায় আংশিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ ছাড়াও বস্তুপূজা, সীমাহীন সম্পদ প্রীতি, স্বার্থপরতা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কঠোরতার ব্যাপারে পশ্চিমের সমগ্র জাতিগোষ্ঠীই মূলত এক ও অভিন্ন।

## আধ্যাত্মিকতার মধ্যে বস্তুবাদ

এই বস্তুবাদী স্পিরিট নতুন প্রাচীন নির্বিশেষে যূরোপের সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন, এমন কি যে আধ্যাত্মিক আন্দোলনের স্পিরিটের প্রতি যূরোপের বিরাট আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাও ছিল এই বস্তুবাদই। এও পাশ্চাত্যের অপরাপর শিল্প ও কলা-শাস্ত্রের ন্যায় এক প্রকার বিজ্ঞান ও শিল্প-কলাই বটে যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আধ্যাত্মিক জগতের মিউজিয়ামগুলো ভ্রমণ করা, তার রহস্যসমূহ অবগত হওয়া, মৃত মানুষগুলোর আত্মার সাথে কথা বলা এবং চিত্ত-বিনোদন ও চিত্ত প্রশান্তির উপকরণ সংগ্রহ করা। প্রাচ্যের ইসলামী রূহানিয়াত ও তাসাওউফের বিপরীতে একে তাযকিয়ায়ে নফ্স তথা আত্মশুদ্ধি, হৃদয়ের সংশোধন, আল্লাহর ভয়, নেক আমল, প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কঠোর কঠিন মুজাহাদা এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও তার প্রস্তুতির সঙ্গে এর সামান্যতম সম্পর্কও নেই। তেমনি যেসব কাজে যূরোপের লোকেরা নিজেদের জীবন দিয়ে দেয়, সেগুলোও শুধু বস্তুগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই তারা করে থাকে। যদি এসব কাজের পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে সে সবের পেছনেও কোন না কোন বস্তুস্বার্থ ও উদ্দেশ্য কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ খ্যাতি, লিপ্সা, প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবার প্রেরণা, জাতীয় ও দেশীয় সম্মান ও গর্ব প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে যেগুলোর কোথাও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অভীষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে একজন মুসলমানের প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টিই কাম্য হয়ে থাকে এবং সে নির্ভেজাল তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কাজ করতে চায়। যে জিনিস পাশ্চাত্যে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এখানে তা পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়। পাশ্চাত্যে যা গর্ব ও গৌরবের বস্তু, একজন মুসলমানের জন্য তাই লজ্জাকর ও দোষাবহ।

কুরআন মজীদের আয়াত ঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً - اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا - اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا -

"বল, 'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব কাজে-কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের?' ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয় যদিও তারা মনে করে, তারা সৎকাজ করছে। ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে ওদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে ওদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে ওদের



কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন ওদের জন্য ওযনের কোন ব্যবস্থা রাখব না।" (সূরা কাহ্ফ ঃ ১০৩-৫)

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا -

"আমি ওদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করব, এরপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।" (সূরা ফুরকানঃ ২৩)

রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, একজন বীরত্বের ওপর ভিত্তি করে লড়াই করে, একজন আত্মমর্যাদাবোধের জোশে উদ্দীপ্ত হয়ে এবং আরেকজন বাহাদুরী ফলাবার উদ্দেশে লড়াই করে। এগুলোর মধ্যে কোন্টি আল্লাহ্র রাস্তায় হয়েছে বলে বিবেচিত হবে? তিনি বললেন, কেবল সেই যুদ্ধ যা এই উদ্দেশে পরিচালিত হয় যেন আল্লাহ্র বাণী সমুন্নত হয়, সেটাই আল্লাহ্র রাস্তায় হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। এই মূলনীতি ও হাকীকতের যারা সমর্থক ছিলেন তারা নিজেদের কাজ ও পুণ্যগুলোকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার জন্য সযত্ন প্রয়াস চালাতেন। এর পরও তারা সদা শংকিত থাকতেন এবং রিয়া হয়ে গেল কি-না তার ভয় করতেন। হযরত ওমর (রা) -এর একটি বিশেষ দোআ ছিল নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِىْ كُلَّهُ صٰلِحًا وَّاجْعَلْهُ كُلَّهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَّلَاتَجْعَلْ لِغَيْرِكَ فِيْهِ شَيْئًا -

অর্থাৎ " হে আল্লাহ! আমার সমস্ত আমলকে তুমি শুদ্ধ বানিয়ে দাও এবং সেগুলোকে নির্ভেজাল তোমার জন্যই বানিয়ে নাও; তুমি ছাড়া আর কারোর অংশ এতে রেখো না।"

## অর্থনৈতিক সর্বেশ্বরবাদ (ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ)

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ ও বস্তুবাদী চিন্তাপদ্ধতি যূরোপীয়দেরকে ইস্তিগরাক ও ফানা (আত্মবিলুপ্তি ও আত্মবিসর্জন)-এর এমন এক স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে যে, পাশ্চাত্যের লোকেরা ও চিন্তাশীল মহল এর বাইরের সব কিছু একেবারেই ভুলে যায়। সমাজতান্ত্রিক দর্শনের জনক কার্ল মার্কস (১৮১৮-৮৩) এর সর্বোত্তম উদাহরণ। তাঁর মতে, গোটা মানব জাতির ইতিহাস (তার অতি শৈশবকাল ব্যতীত) মানব সমাজের পারস্পরিক শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। তিনি মানব জীবনের অর্থনৈতিক দিক ভিন্ন আর সমস্ত দিকের গুরুত্ব ও প্রভাবকেই অস্বীকার করেছেন। তিনি অর্থাৎ কার্ল মার্কস ধর্ম, নীতি-নৈতিকতা, হৃদয়, আত্মা, এমন কি

প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তিকেও আদৌ মূল্য দেন নি এবং তাঁর মতে এগুলোর মধ্যে কোনটারই মানব ইতিহাসে কোন বিশেষ গুরুত্ব নেই। ইতিহাসের বুকে সংঘটিত সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদ্রোহ ও বিপ্লব কেবল প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তই সংঘটিত হয়েছে যা একজন ক্ষুদ্র ও অন্নহীন ক্ষুধার্ত লোক একজন বিরাট ও ভরপেট লোক থেকে নিতে চায়। এটা ছিল কেবলই এক নিরন্তর সংগ্রাম ও সাধনা যা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নবতর সংগঠন ও শিল্পোৎপাদনের বিভিন্ন পন্থার নবতর সংগঠনের ধারাবাহিকতায় সামনে এসেছে। এরই ওপর ভিত্তি করে এই ফলাফলে উপনীত হওয়া ভুল হবে না যে, তাঁর মতে ধর্মীয় যুদ্ধ, জিহাদও বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সংগ্রাম বৈ আর কিছুই নয়। একদল সম্পদের উৎস ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণগুলো নানা কৌশলে দখল করে বসেছিল আর অপর দল এসব সম্পদে অংশ দাবি করত এবং অপরিহার্য ভাগ নিতে চাইত কিংবা এসব সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণগুলো (যেমন জমি, মিল ও কল-কারখানা ইত্যাদি) নতুনভাবে সংগঠিত করতে ও ঢেলে সাজাতে চাইত। প্রথমোক্ত দল এর প্রতিরোধে এগিয়ে এলে সেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ, হৈ-হাঙ্গামা, বিক্ষোভ ও বিপ্লব সংঘটিত হয়, ইতিহাস যেগুলোকে বিভিন্ন নামে স্মরণ করে। এই একতরফা ও একচোখা দর্শন কোন ধর্মীয় যুদ্ধ-জিহাদ, কোন ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন, কোন আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও চেষ্টা-সাধনাকেই তাদের এই ব্যাখ্যা থেকে আলাদা বা ভিন্নতর ভাবতে রাজী নয়। আর এই হলো পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী তাসাওউফ ও য়ূরোপের অর্থনৈতিক সর্বেশ্বরবাদী দর্শন।

### পেট ও যৌনাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছু নেই

যেহেতু প্রাচ্যে আধ্যাত্মিকতা আল্লাহ্‌র প্রতি আকর্ষণ ও তাঁকে একান্ত করে পাবার প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাই এর অধিবাসীদের মন-মানসিকতার ওপর জেঁকে আছে সেজন্য এ ব্যাপারে সে সমস্ত লোকের ওপর আল্লাহকে পাবার আকাঙ্ক্ষা পেয়ে বসে এবং এই তীব্রতার কাছে যারা হার মানে তারাই আল্লাহ্ ব্যতিরেকে সব কিছুকেই সব কিছুর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছে এবং আবেগোন্মত্ত অবস্থায় আত্মবিস্মৃত হয়ে لا موجود إلا الله 'আল্লাহ ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই' বলে ধ্বনি তুলেছে। য়ূরোপের চিন্তাশীল দার্শনিকদের ওপর যেহেতু বস্তুবাদ জেঁকে বসে আছে এবং এ ব্যাপারে উক্তরূপ চিন্তা-চেতনা যেহেতু তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেহেতু তারা আত্মবিস্মৃত অবস্থায় অর্থনৈতিক ও জৈবিক দিক ছাড়া আর সব কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বসেছে এবং لا موجود إلا البطن والشهوة 'পেট ও যৌনাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছু নেই' বলে ঘোষণা দিয়েছে। প্রাচ্যের সূফী-দরবেশরা মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতিচ্ছায়া মনে করতেন এবং কোন কোন



আত্মবিস্মৃত সূফী أنا الحق "আমিই আল্লাহ পরম সত্য" বলে প্রতিধ্বনি তুলেছেন। অপর দিকে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও পেটপূজারীরা মানুষকে নিছক জৈব অস্তিত্ব মনে করে, তাই আজ চতুর্দিকে থেকে أنا الحيوان 'আমি পশু' এই ধ্বনিই ভেসে আসছে।

### ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রভাব

এটা কেবল কষ্ট-কল্পনা নয়। খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে য়ূরোপে এমন সব মতবাদ ও তত্ত্বগত মতাদর্শ জন্ম নিতে থাকে যার ফলে মানুষ ও তার জীবনের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে পাশবিক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থিত ও শক্তিশালী হতে থাকে। ১৮৫৯ সালে ডারউইন তাঁর Origin of Species নামক গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেষ্টা পান, মানুষ মূলত পশুরই ক্রমবিবর্তিত একটি রূপ মাত্র যা হাজার হাজার বছরের ক্রমউন্নতি ও ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে জীবাণু বিশেষ (Amoeba) থেকে বানর, অতঃপর বানর থেকে মানবাকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি সমগ্র য়ূরোপের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এবং সময়ের সবচে' বড় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই বিবর্তনবাদ মানুষের সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মোড়টাই ঘুরিয়ে দেয় এবং জীবজগতের ইতিহাস, জন্ম ও প্রবৃদ্ধি, সে সবের আচার-আচরণ, অভ্যাস ও সমূহ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করে দেয়। এই মতবাদ এ ধরনের বিশ্বাস সৃষ্টি করে দিয়েছে, এই বিশ্বজগত কোন অতিপ্রাকৃতিক শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক বিধান ব্যতিরেকে এর কোন কার্যকারণ নেই।

সূচনা ও পরিণতি, মেধাগত, নৈতিক ও কার্যকর প্রভাবগুলোর মধ্যে এই মতবাদ ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, বরং বলা যায়, এই মতবাদ একটি স্থায়ী ধর্ম ও জীবনদর্শনের রূপ পরিগ্রহ করেছে যা অপর কোন ধর্ম ও জীবন-দর্শনের নিমিত্ত কোনরূপ অবকাশ রাখে না। তাই ধর্মের অনুসারীদের এর বিরোধিতা এবং এ ব্যাপারে তাদের আশংকা ছিল যথার্থ। অধ্যাপক C.E.M. Joad বলেন ঃ

"এই পেরেশানী ও হতবুদ্ধিকর অবস্থার পরিমাপ করা আমাদের জন্য এ সময় কঠিন বৈকি যা আমাদের পূর্বসূরীদের সামনে এ বইটি (Origin of Species) প্রকাশের পর দেখা দিয়েছিল। সেই সময় সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা যার ওপর এর গবেষণার ফলাফল স্থাপিত ছিল, ডারউইন প্রমাণ করেন (কিংবা তিনি প্রমাণ করেন বলে ধরে নেয়া হয়), ভূপৃষ্ঠে জীবনের বিবর্তন জীবাণু বিশেষ (Amoeba) ও জেলী ফিশ (Jelly fish)-এর প্রাথমিক আবির্ভাব থেকে তার চূড়ান্ত অবয়বে উপনীত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলেছে। আমরা জীবনের সর্বোন্নত ও সর্বশেষ অবয়ব।

"এর বিপরীতে ভিক্টোরিয়া যুগের লোকদেরকে বলা হয়েছিল, মানুষ স্বয়ং আল্লাহ্‌র এক বিশেষ সৃষ্টি এবং সে মূলত ফেরেশতার স্তর থেকে নেমে এসেছে। কিন্তু ডারউইনের মতে মানুষ বানরের উন্নত সংস্করণ মাত্র। ঐ যুগের লোকদের একথা ভাবতে খুব কষ্ট হয়েছে, তারা অধঃপতিত ফেরেশতার পরিবর্তে একটি উন্নত মানের বানর প্রমাণিত হয়েছে। এই মতবাদ তাদের আদৌ পসন্দ হয়নি এবং তারা মানুষকে এই উভয় সংকট থেকে মুক্তি দিতে এবং এই লজ্জা দূর করবার বিভিন্ন রকমের প্রয়াস চালায়।"[১]

জ্ঞানগত ও গবেষণামূলক বিভিন্ন রকমের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও শূন্যতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের অধিকাংশই বুঝে হোক অথবা না বুঝে হোক, এই মতবাদ গ্রহণ করে নেয়। মনে হয়, তাদের মস্তিষ্ক আগে থেকেই এর জন্য তৈরি ছিল। মানুষ এর ভেতর আরেকটি ভাল দিক এও দেখতে পেল, তা ধর্ম ও ধর্মানুসারীদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ। অতঃপর যারা ধর্মের অনুসারী তাদের পক্ষে নানারূপ ধ্যান-ধারণা ও রুচির এই প্রবাহিত স্রোত এবং প্রকাশিত বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার এই প্লাবনের মুকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল এবং অবশেষে গির্জা এই যুদ্ধে তাদের পরাজয় স্বীকার করে নিল।

ধ্যান-ধারণা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও রাজনীতি, মোট কথা জীবনের সকল শাখায় এই মতবাদ সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। প্রকৃতির রাজ্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের ধারণা, নগ্নতা ও উলঙ্গপনার প্রতি আগ্রহ এবং এ ধরনের বহু কাজ ও আচার-ব্যবহার এ জাতীয় ধ্যান-ধারণার ফল ও ফসল যে, মানুষ মূলত একটি উন্নত পশু বৈ নয়। এ ধরনের মন-মানসিকতারই ফল যে, মি. শেপার্ড-এর ভাষায়, "ইংল্যান্ডে বর্তমানে এক নতুন প্রজন্ম জন্ম নিচ্ছে যারা মানুষের পারিবারিক জীবনের অর্থ সম্পর্কেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অপরিচিত। তারা কেবল পশু পালের জীবন সম্পর্কেই জ্ঞাত ও পরিচিত।"

## জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ

আগেই বলা হয়েছে, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ধারণা, জাতীয় গর্ব, অহংকার, ভৌগোলিক বিভাজনের প্রতি অতিরিক্ত সমীহ পশ্চিমা স্বভাবেরই বৈশিষ্ট্য যা পশ্চিমা লোকদের মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। খ্রিস্ট ধর্ম যখন য়ূরোপে গিয়ে পৌঁছল যদিও সে তখন তার নিজস্ব রূপ হারিয়ে ফেলেছিল এবং তার মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তার ভেতর আর যা-ই হোক, হযরত ঈসা আল্লায়হিস সালামের পেশকৃত শিক্ষামালার প্রভাব ও আসমানী ধর্ম হিসাবে এর সমূহ বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল। ধর্ম তা যতই বিকৃত

১.Guide to Modern Wickedness, p. 235-236.



হোক, দেশ ও জাতির ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে পার্থক্য ও বিভাজন সমর্থন করতে পারে না। এজন্য খ্রিস্ট ধর্ম য়ূরোপের বিক্ষিপ্ত জাতিগোষ্ঠীসমূহকে রোমান গির্জার অধীনে ধর্মের পতাকাতলে একত্র করে দেয় এবং খ্রিস্টান জগতকে একই পরিবারে পরিণত করে দেয়। History of Morality-এর লেখকের মতে, স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রেম সৃষ্টিকুলের প্রতি সাধারণ ভালবাসায় পরিণত হয়ে যায় এবং এই মানসিক পরিবর্তনের পরিমাপ আপনি খ্রিস্টান পণ্ডিতদের কথা থেকেও করতে পারেন। উদাহরণত টারটোলিন বলেন যে, আমরা একটি প্রজাতন্ত্র সম্পর্কেই জানি আর তা হলো সমগ্র বিশ্ব এবং রেজিন বলেন, আমাদের দেশ একটাই যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে 'আল্লাহ' শব্দের মাধ্যমে।

কিন্তু মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫২৬) যখন তাঁর বিখ্যাত সংস্কার আন্দোলন শুরু করলেন এবং রোমান গির্জার বিরোধিতায় জার্মান জাতির সাহায্য পেলেন, অবশেষে রোমান গির্জাধিপতিদের পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য করলেন তখন একই শেকলে যুথবদ্ধ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। এরপর তারা প্রতিদিনই অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে স্বাধীন ও খোদ-মুখতার হতে থাকল। য়ূরোপে খ্রিস্ট ধর্মের পতনের সাথে সাথে জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটতে লাগল অর্থাৎ এ যেন সেই পাল্লার মত যার একদিকে ধর্ম আর অপর দিকে জাতীয়তাবাদ চাপানো! ফলে একদিকের পাল্লা যেই পরিমাণ নিচু হতো, অপর দিকের পাল্লা ঠিক সমপরিমাণ ওপরে উঠে যেত। আর এটা তো জানা কথা, ধর্মের পাল্লা হাল্কা থেকে অধিকতর হাল্কাই হয়েছে বিধায় জাতীয়তাবাদের পাল্লা ভারি থেকে আরো ভারি হয়েছে। বিখ্যাত ইংরেজ মনীষী লর্ড লোথিয়ান এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছিলেন ঃ

"Europe once had the same kind of cultural and religious unity as India in the earlier days of Christianity. But when in the 15th century the new learning of the Renaissance and the new movement for religious reform known as the Reformation began, because it had no constitutional unity, Europe fell into pieces and has since then remained divided into those national sovereign states whose strifes and wars are not only the ruin of Europe itself, but the principal threat to the peace of the world...."

"এক সময় য়ূরোপে একই রকম সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্য বিদ্যমান ছিল, যেমনটি ছিল ভারতে খ্রিস্ট ধর্মের প্রাথমিক দিনগুলোতে। কিন্তু ১৫শ শতাব্দীতে লুথারের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যখন য়ূরোপের এই সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্য খতম করে দিল তখন সমগ্র মহাদেশ বিভিন্ন জাতীয় সরকারের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেল যাদের পারস্পরিক লড়াই-ঝগড়া কেবল য়ূরোপেরই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বেরই শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য স্থায়ী হুমকি হয়ে দেখা দিল।"

ধর্মীয় অধঃপতন এবং ধর্মীয় মূলনীতি ও আচার-ব্যবহারের অবনতির দরুন জাতীয়তাবাদের ধ্যান-ধারণার যে বিকাশ ঘটে এর প্রতিও লেখক অঙ্গুলি সংকেত করেছেন এভাবে ঃ

"......... The decline in the authority of religion, the indispensable guide of man, the one source which can give more purpose and nobility and meaning to life of man, explains, at least in part, why the Western World has given its allegiance in the recent decades to new political gospels based on race or class, or has pinned its faith on a form of science which admittedly is almost wholly concerned with advance in the material plane, with making life more rather than less expensive and complicated. And it explains, also in part, why Europe finds it so difficult to attain to that unity in spirit and life which would enable it to rise above the spirit of exclusive and militant nationalism which is its principal bane today."1

"ধর্ম যা মানুষের অনিবার্য ও অপরিহার্য পথ-প্রদর্শক, নৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল এবং মানুষের জীবনের ইযযত-সম্মান ও মৌলিকত্ব লাভের একক উপায় ও মাধ্যম। এর ক্ষমতার পতনের ফল দাঁড়াল এই যে, পাশ্চাত্য জগত এমন সব রাজনৈতিক ধর্ম ও ধ্যান-ধারণার প্রতি ঝুঁকে পড়ল যার বুনিয়াদ হলো বংশ ও শ্রেণী-বৈষম্যের ওপর। প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে সে একথা মেনে নিল, বস্তুগত উন্নতি-অগ্রগতিই হলো উচ্চতর ও মহত্তর লক্ষ্য। এরই কারণে জীবনের জটিলতা ও সমস্যা-সংকটগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফল হলো, য়ূরোপের জন্য স্বীয় রূহ বা আত্মা ও জীবন-যিন্দেগীর মাঝে এখন সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন হয়ে গেল যা তাকে এ যুগের সবচে' বড় বিপদ জাতীয়তাবাদের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে।"[১]

## পাশ্চাত্যের অহংকার ও প্রাচ্যের বিরুদ্ধে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব

ধর্মীয় বিধি-ব্যবস্থার পরাজয় এবং জাতীয়তাবাদী প্রেরণার উন্নতি ও বিকাশের প্রথম প্রভাব পড়ল। ফলে সমগ্র য়ূরোপ গোটা প্রাচ্যের মুকাবিলায় একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে পরিণত হলো। সে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, আর্য জাতি ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একটি পার্থক্য ও বিভাজন রেখা টেনে দিল এবং সিদ্ধান্ত নিল, এই রেখার মধ্যে যতগুলো জাতিগোষ্ঠী, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সাহিত্য অবস্থিত সেগুলোর দুনিয়ার তাবত জাতিগোষ্ঠী, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও

১. Convocation Address, Aligarh Musllim University, 29-38.



জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য রয়েছে। শাসন করা, টিকে থাকা ও ফলে-ফুলে বিকশিত হওয়া তার অধিকার। এতদ্ভিন্ন আর যা কিছু আছে তাকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে থাকতে হবে এবং বেঁচে থাকার ও উন্নতি করার কোন অধিকার তার নেই। ঠিক এরূপ চিন্তাধারা আপন আপন যুগে গ্রীক ও রোমকদের ছিল। পৃথিবীতে তারা নিজেদেরকেই কেবল সভ্য গণ্য করত এবং বাইরের সব কিছুকেই বিশেষ করে যেসব জিনিস আটলান্টিক সমুদ্রের পূর্বাংশে অবস্থিত সে সবকে অসভ্য ও বর্বর হিসেবে আখ্যায়িত করত।

## জাতীয়তাবাদের সীমারেখা

য়ূরোপের সাম্রাজ্য ও জাতিগোষ্ঠীগুলো নিজেদেরকে একটি স্থায়ী জগত ধরে নিয়েছে। আল্লাহ পাক পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদীর যেই প্রাকৃতিক সীমা কায়েম করে দিয়েছেন এর বাইরে তারা নিজেদের চারপাশে রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত টেনে দিয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে এই বৃত্তের বাইরে অন্য কোন পৃথিবী ও মানুষের অস্তিত্ব নেই। তাদের কাছে এই বৃত্তের বাইরে অবস্থিত কোন কিছুই সম্মান ও মর্যাদাযোগ্য নয়। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে এক স্থায়ী উপাস্য দেবতা বানিয়ে নিয়েছে এবং ইবাদত-বন্দেগী ও পবিত্রতার যতগুলো সম্পর্ক আব্দ ও মা'বুদ তথা গোলাম ও উপাস্য প্রভুর মধ্যে হওয়া দরকার বা হওয়া উচিত, তারা এই স্বকপোলকল্পিত মা'বুদের সাথে কায়েম করে নিয়েছে। এরই জন্য তাদের যত সব কুরবানী, এরই নিমিত্ত তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও লড়াই-সংঘর্ষ, এরই খাতিরে তাদের বাঁচা ও মরা। একে ভেট দেবার জন্য তারা দেদার ও এন্তার মানুষের খুন ঝরিয়ে থাকে। এই জাতীয়তাবাদী ধর্মের সর্বপ্রথম আকীদা-বিশ্বাস হলো এই জাতি সব কিছুর ওপর অগ্রাধিকার পাবার অধিকার রাখে এবং সব কিছুর ওপর জাতি ঊর্ধ্বে এবং জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য সব কিছুর ওপর। এই জাতি থেকে উত্তম, অভিজাত, মেধার অধিকারী, শক্তিশালী, শাসন করার, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করবার, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ওপর খবরদারী ফলাবার, অভিভাবকত্ব করবার এবং বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার ভূপৃষ্ঠের বুকে অন্য কোন জাতির নেই। এর নদীর পানি অমৃতের ন্যায়, এর মাটি মাটি নয়, সোনা আর এর কাঁটা কাঁটা নয়, ফুল। এই জাতীয়তাবাদরূপী ধর্ম কোন মানুষকে কোন দেশে থাকার ও বসবাসের ততক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি দেয় না যতক্ষণ না সে এর ওপর ঈমান আনে।

জাতি পূজার এই বীজ একই ধরনের চারা, পাতা ও ফল জন্মায়। এটা সম্ভব নয় যে, কোন জাতিগোষ্ঠী জাতি পূজায় বিশ্বাসী, অথচ সে অপর জাতির দিকে হাত বাড়ায় না, কিংবা বাড়াতে চায় না এবং নিজেদের ছাড়া অন্যদের ঘৃণা করে

না, অবজ্ঞার চোখে দেখে না কিংবা অপরকে ছোট ভাবে না। এসবের থেকে তারা মুক্ত ও পবিত্র। যেমন এক ব্যক্তি পেয়ালার পর পেয়ালা মদ পান করবে, অথচ সে মাতাল হবে না, তার নেশা ধরবে না – এটা যেমন অসম্ভব ঠিক তেমনি ওটাও অসম্ভব।

درمیان قعر دریا تختہ بندہ کردہ
بازی گرئ که دامن ترمکن هشیا د باش

"তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগর মাঝে বেঁধে মোরে দিলে তক্তায়
বলে দিলে ফের সাবধান যেন আঁচল ভিজে না যায়।"

বিশেষত যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, ইতিহাস, এমন কি যখন প্রকৃতি বিজ্ঞান এই জাতীয়তাবাদী নেশাকে আরো শাণিত ও ধারালো এবং এই মদকে আরও উত্তেজক বানাতে থাকে এবং সর্বপ্রকারে জাতির মধ্যে বংশীয় অহংকার ও অহমিকাবোধ, নিজেদের অতীত নিয়ে গর্ব ও অহংকার লালন করতে থাকে এবং কোন ধরনের নৈতিক ও ধর্মীয় বাধা-প্রতিবন্ধকতা থাকে না, আর নেতৃত্বও যখন সে সব লোকের হাতে থাকে যাদের জাতীয় মর্যাদা ও শান-শওকত ভিন্ন আর কোন লক্ষ্য থাকে না, তখন তা যে কী মারাত্মক রূপ ধারণ করে তা বলাই বাহুল্য।

## জাতীয়তাবাদের অনিবার্য উপাদান ঘৃণা ও শঙ্কাবোধ

ঘৃণা ও শঙ্কাবোধ হলো আধুনিক জাতীয়তাবাদের অনিবার্য ও অপরিহার্য উপাদান যা ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। জাতীয়তাবাদী জোশ ও আবেগ-উদ্দীপনা ততক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি হয় না আর সৃষ্টি হলেও স্থায়ী থাকে না, যতক্ষণ না জাতির সম্মুখে এমন কিছু থাকে যাকে ঘৃণা করা যায় কিংবা যা ভয় করার মত। অনন্তর জাতীয়তাবাদী নেতা ঘৃণা ও ভীতিবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে তার আবেগকে উস্কে দিতে থাকে এবং তার আহত ও ব্যথিত শিরাকে দাবিয়ে দিয়ে তার মধ্যে অস্থিরতা, ক্ষোভ, উত্তেজনা ও আবেগ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দেয়। সে ঘৃণা ও ভীতির আগুন নিভতে দেয় না, বরং তিলকে তাল বানিয়ে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনৈক্য ও মতপার্থক্যকে বাড়িয়ে চড়িয়ে এবং কোন না কোন প্রকৃত অথবা কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে জাতির ঘৃণা ও ভীতির আবেগকে জাগিয়ে তোলে এবং তাকে সচল ও সক্রিয় রাখে। এর মধ্যেই নিজেদের হুকুমত ও নেতৃত্বের প্রাণ ও আপন স্থায়িত্ব নির্ভরশীল মনে করে। অধ্যাপক জোড্ এর যেই দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা এভাবে ঃ



"সেই সব সাধারণ ও সম্মিলিত আবেগ যেগুলোকে খুব সহজেই জাগিয়ে তোলা যায় যা দিয়ে সাধারণ গণমানুষের বিরাট বিরাট দলকে সচল ও সক্রিয় করা যায় তা দয়া-মায়া, বদান্যতা ও প্রেম-ভালবাসার আবেগ নয়, বরং তা হলো ঘৃণা ও ভয়-ভীতির আবেগ। যেসব লোক কোন জাতির ওপর নেতৃত্ব করতে চায়, কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য তারা ততক্ষণ পর্যন্ত সফল ও কৃতকার্য হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এর জন্য এমন কোন জিনিস খুঁজে না নেয় যা দ্বারা সে ঘৃণা করবে এবং এজন্য এমন কোন ব্যক্তিত্ব কিংবা জাতিগোষ্ঠী সৃষ্টি না করবে যাকে সে ভয় পাবে। আমিই যদি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই তাহলে আমার জন্য দরকার হবে তাদের জন্য অন্য কোন গ্রহে কোন দুশমন আবিষ্কার করা, ধরুন, চাঁদের পৃষ্ঠেই যেই দুশমনকে সব জাতিগোষ্ঠীই ভয় পাবে। অতএব, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, এ যুগের জাতীয় সরকারগুলো তাদের প্রতিবেশী জাতিগুলোর সঙ্গে কায়কারবার ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ঘৃণা ও ভয়-ভীতিরই আবেগাধীন। এসব আবেগের ওপরই ঐ সব সাম্রাজ্যের ওপর শাসন পরিচালনাকারীদের জীবন নির্ভরশীল এবং ঐসব আবেগের ওপরই জাতীয় ঐক্যের বুনিয়াদ স্থাপিত।"[১]

আসল ঘটনা হলো, নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী মানসিকতা ও কর্মকৌশলই হলো ঘৃণা ও ভীতিবোধ বজায় রাখতে হবে। আর এ দু'টো আবেগের ওপরই অতীত ও বর্তমান জাতীয়বাতাদী সরকারগুলোর ভিত্তি স্থাপিত এবং এ দু'টো আবেগই সেই সব বড় বড় যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে, যেসব যুদ্ধের গাঁথা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাওয়া যায় এবং যেসবের চিহ্ন দুনিয়ার বুকে আজও বিদ্যমান। ইসলাম এই জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণাকে (যা আপন জাতির প্রতি ন্যায় ও অন্যায় পক্ষপাতিত্ব এবং অপর জাতির প্রতি ঘৃণা ও ভয়-ভীতি ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না এবং যেখানে ন্যায় ও সত্যের কোন প্রশ্নই নেই) 'আসাবিয়াত' (অন্যায় পক্ষপাতিত্ব) ও "হামিয়্যাতে জাহেলিয়্যাত" (জাহিলী যূথবন্দী) হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং এমনতরো সর্বপ্রকার সাহায্য-সমর্থন, উৎসাহ প্রদান ও যুদ্ধ-বিগ্রহকে হারাম অভিহিত করে যার বুনিয়াদ স্রেফ জাতীয় কিংবা দলীয় অন্যায় পক্ষপাতিত্বের ওপর হয়। রসূলে আকরাম (সা) পরিষ্কার ভাষায় বলেছেনঃ

ليس منا من دعا الى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية۔

1. Guide to Modern Wickedness, p. 150-51..

"সে আমাদের কেউ নয় যে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ও যূথবন্দীর দিকে আহ্বান জানায় এবং সে আমাদের ভেতরকার কেউ নয় যে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ও যূথবন্দীর জন্য যুদ্ধ করে এবং সেও আমাদের কেউ নয় অন্যায় যূথবন্দী ও পক্ষপাতিত্বের ওপর যে মারা যায়।" (আবূ দাউদ)

যে ব্যক্তি এই জাতিপূজা ও জাহিলী যূথবন্দীর যুদ্ধে মারা যায় তার মৃত্যুকে জাহিলী তথা অনৈসলামী মৃত্যু হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে এবং অন্য এক হাদীসে তাকে এই উম্মাহবহির্ভূত বলা হয়েছে।

من قاتل تحت رائية عمية يغضب بعصبية او يدعوا الى عصبية او ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية -

"যে ব্যক্তি কোন অন্যায় যূথবন্দীর পতাকাতলে, কোন অন্যায় যূথবন্দীর সমর্থনের আবেগে অথবা কোন অন্যায় যূথবন্দীর সাহায্যে যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যায় তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।" (মুসলিম ও নাসাঈ)

ومن قتل داية عصبية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس من امتى -

" যে কোন অন্ধ গোত্রপ্রীতি ও যূথবন্দীর পতাকাতলে, কোন পক্ষপাতমূলক আবেগের বশবর্তী হয়ে কিংবা পক্ষপাতমূলক যুদ্ধে যোগ দিয়ে মারা যায় সে আমার উম্মতভুক্ত নয়।" (মুসলিম)

ইসলাম পৃথিবীর মানব সমাজকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। একদল তারা যারা আল্লাহ্র অনুসারী ও সত্যের সমর্থক এবং দ্বিতীয় দল তারা যারা শয়তানের অনুসারী ও বাতিল তথা মিথ্যার সমর্থক। ইসলাম কেবল শয়তানের অনুসারী, মিথ্যা ও বাতিলের সমর্থক, যমীনের বুকে অশান্তি ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে এবং যারা দুনিয়ার বুকে জুলুম-নির্যাতন করে, বিদ্রোহ, অন্যায় ও পাপাচারের বিস্তার ঘটায় তাদেরকে ঘৃণা করতে বলে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়– চাই কি তারা যে কোন বংশ ও দেশের অধিবাসীই হোক। ঘৃণা করবার জন্য, যুদ্ধ করবার জন্য তার কাছে জাতীয় ও বংশীয় বুনিয়াদ কোনরূপ ভেদরেখা কিংবা বিভাজন সৃষ্টির ভিত্তি নয় কিংবা সে কোন্ দেশ ও কোন শহরে বসবাস করে তাও নয়, বরং এর ভিত্তি হলো তার নীতি ও আদর্শ, আকীদা-বিশ্বাস, আমল, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততা, আনুগত্য ও বিদ্রোহ এবং মানুষের জন্য তা উপকারী না ক্ষতিকর সেটা।



## জাতীয়তাবাদী অহংবোধ

জাতীয়তাবাদের যারা পূজারী তাদের অভ্যাস হলো, তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিগুলোর মধ্যেও জাতীয়তাবাদের প্রচার চালিয়ে থাকে। তার সাহিত্য, তার ভাষা ও সভ্যতার অনুকূলে প্রশংসার ফুলঝুরি ছড়ায় এবং তার অতীত শান-শওকতকে কল্পনার রঙ চড়িয়ে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করে, এমন কি একদিন সে সব জাতিগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদের আবেগের কাছে পরাভূত এবং এর নেশায় উন্মাতাল হয়ে ওঠে। তাদের ভেতর তখন নিজেদের ওপর অন্যায় ও ভুল আস্থা, গর্ব ও অহংকার সৃষ্টি হয়ে যায় এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে জাতীয়তাবাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ ও বন্দী হয়ে যায় এবং কোন আন্তর্জাতিক শক্তি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কেরই আর তারা পরওয়া করে না। তারা নিজেদের উপায়-উপকরণ, সম্পদ ও শক্তির ওপরই কেবল নির্ভর করে। ফল হয় এই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা কোন বৃহৎ শক্তির গ্রাসে পরিণত হয়ে যায় এবং পৃথিবী দূর থেকে এর তামাশা দেখতে থাকে এবং মৌখিক সহানুভূতি ব্যতিরেকে সে সময়মত কোন সাহায্যই পায় না। জাতীয়তাবাদের দুর্গ বেষ্টনীর প্রতিষ্ঠা করে এবং নিজেদেরকে বিশ্ব থেকে আলাদা ও বিশিষ্ট হিসাবে অভিহিত করে তারা যেন বৃহৎ শক্তিগুলোর লোলুপ দৃষ্টিকেই আহ্বান জানায়।

মধ্য য়ূরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের এই যুদ্ধে যেই পরিণতির সম্মুখীন হতে হয় সারা বিশ্ব তা জানে। কিন্তু আফসোসের বিষয়, সেই মুসলিম দেশগুলো যারা এক বিশ্বজয়ী দাওয়াত ও আন্দোলনের অধিকারী, যাদের কাছে এমন শক্তি আছে যা (যদি তাদের ভেতর এ থেকে উপকৃত হবার ও ফায়দা হাসিলের সামর্থ্য থাকে) য়ূরোপের জাতীয়, দেশীয় ও রাজনৈতিক দর্শন ও আহ্বানের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী, সুদূরপ্রসারী ও সাধারণ আহ্বান ও আন্দোলন, তাদের ঝোঁকও সীমিত জাতীয়তাবাদের দিকেই, অথচ তারা নিজেদের উপায়-উপকরণ, সমরসম্ভার ও সংখ্যা শক্তির দিক দিয়ে য়ূরোপের খণ্ড খণ্ড রাজ্যের তুলনায় খুব বেশি ভাল অবস্থায় নেই। এজন্য এই আশা করা বাতুলতা বৈ নয় যে, তারা নিজেদের ঐসব সীমিত উপায়-উপকরণ ও জাতীয়তাবাদের সীমারেখার ভেতর কোন বিপদে বেশি দিন ধরে মুকাবিলা করতে পারবে।

## জাতীয়তাবাদী সরকারের সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি

জাতীয়তাবাদী সরকারের সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি হলো বিরাট বিরাট আয়তনবিশিষ্ট ভূখণ্ডের ওপর তাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য থাকবে, রাষ্ট্রের সীমা ও আয়তন বিশাল ও বিস্তৃত হবে, আয়ের উপায়-উপকরণ প্রচুর থাকবে, আপন

ইচ্ছা ও মর্জি অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এবং প্রতিবেশী দেশ ও জাতি কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলোকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলবার সম্পূর্ণ সামান তার কাছে থাকবে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব, বংশীয় প্রাধান্য, নিজেদের প্রাচীন সভ্যতা, সাহিত্য, ভাষা ও অতীত ইতিহাস নিয়ে গর্ব ও অহংকারের প্রেরণা ও আবেগ পাওয়া যায় এবং সমসাময়িক অন্য জাতিগোষ্ঠীগুলোর দুর্বলতা, সভ্যতা ও ভাষাগত অসহায়ত্বের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে। তারা রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের সম্মান ও মর্যাদার খাতিরে বিরাট থেকে বিরাটতর অপরাধমূলক ও পাশবিক কাজ যেন অনায়াসে ও অবহেলায় করে ফেলতে পারে এবং নিজ জাতি ও জাতির লোকদের তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর ফায়দার জন্য বৃহৎ থেকে বৃহত্তর অন্যায়-অবিচার ও হক নষ্ট করতে তার মধ্যে যেন সাহসের সামান্যতম অভাবও না ঘটে। এ ধরনের রাষ্ট্রের নৈতিক মানদণ্ড যত নিম্নই হোক, তার নাগরিক ও নৈতিক চেতনা মনুষ্যত্বের সম্মানের মৌল নীতিমালার পাবন্দী থেকে যত অজ্ঞ ও অপরিচিতই হোক, সেই রাষ্ট্র ও তার দায়িত্বশীলরা নৈতিক সীমা ও বাধ্যবাধকতা থেকে যত মুক্তই হোক না কেন, সেই রাষ্ট্র সম্মান ও মর্যাদার সমুন্নত মানদণ্ডের ওপর অধিষ্ঠিত এবং দুনিয়ার এক বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা লাভের যোগ্য। অধ্যাপক জোড় ঠিকই লিখেছেন ঃ

"জাতীয় মর্যাদার অর্থ কেবল এই যে, জাতির কাছে এমন শক্তি থাকবে যার দ্বারা প্রয়োজনের মুহূর্তে নিজের ইচ্ছা-অভিরুচিকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায়। এই জাত্যাভিমান ঐসব জাতিগোষ্ঠীর কাছে আদর্শের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত। এর অযৌক্তিকতা এ দ্বারা প্রকাশিত যে, এই মাপকাঠি নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর একেবারেই বিপরীত। যদি কোন দেশ এমন হয়, সে কেবল সত্যি কথাই বলে, প্রতিশ্রুতি পালন করে, দুর্বলদের সাথে মানবোচিত আচরণ করে তাহলে ঐ সব জাতির কাছে তার সম্মান নিম্ন পর্যায়ের। মি. বল্ডউইনের মতে সম্মান সেই শক্তির নাম যার সাহায্যে জাতি বিশেষ মর্যাদা ও আস্থার অধিকারী হয় এবং দৃষ্টিগুলোকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। আর এটা তো জানা কথা, এমন শক্তি যার সাহায্যে জাতি এমনতরো সম্মান, গৌরব-বৈশিষ্ট্য লাভ করে তা অগ্নি উদ্‌গিরণকারী গোলা ও বোমার ওপর নির্ভরশীল, নির্ভরশীল সেই সব যুবকের বিশ্বস্ততা ও দেশপ্রেমের ওপর যাদের প্রিয় হবি বা নেশা শহর ও জনপদগুলোর ওপর গোলা নিক্ষেপ ও বোমা বর্ষণ। অনন্তর সেই সম্মানের জন্য কোন জাতির প্রশংসা করা হয় তা সেই সব গুণ চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত যার বুনিয়াদের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়। আমার মতে তো সেই জাতিকে সেই পরিমাণ বন্য ও অসভ্য মনে করা দরকার, মনে করা উচিত যেই পরিমাণ সে এমনতরো সম্মানের মালিক হয়।



ফেরেববাজি, দাগাবাজি, প্রতারণা ও জুলুম-নির্যাতনের সাহায্যে ইজ্জত হাসিল করা কোন মানুষ ও জাতির জন্য আদৌ সম্মানের ব্যাপার নয়।"[১]

## হেদায়েত অথবা তেজারত (ব্যবসা-বাণিজ্য)

ধর্মহীন রাষ্ট্র ও হুকুমতগুলো আদতে উন্নত, সুসংহত, সুশৃংখল, সুসংগঠিত ও সুরক্ষিত এবং একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এসব হুকুমত মৌলিক ও নীতিগতভাবে মানুষের উপকারের নিমিত্ত নয়, বরং মানুষের থেকে ফায়দা লুটবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম থেকেই এবং আদতেই তারা কোন নৈতিক পয়গাম ও গঠনমূলক লক্ষ্য পোষণ করে না। তাদের সামনে দেশ কিংবা জাতির নৈতিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, মানুষের হেদায়েত এবং মানবতার প্রকৃত খেদমত ও কল্যাণ থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই তাদের আসল মনোযোগ থাকে আয়ের দরজা, মুনাফা লুটবার কৌশল এবং সরকারী রাজস্ব ও দাবিগুলোর দিকে। এজন্য তারা অবাধে ও নির্দ্বিধায় নীতি-নৈতিকতা ও সভ্যতা-ভব্যতার রীতি বিসর্জন দিয়ে দেয় এবং নৈতিক শিক্ষামালা ও কল্যাণবোধকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। যখনই কোথাও নীতি-নৈতিকতা ও স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয় সেখানে সব সময় এরা মুনাফাকেই অগ্রাধিকার দেয়। যে কোন ব্যাপারে এবং যে কোন বিষয়ে তাদের দৃষ্টি থাকে অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি। এই ধরনের রাষ্ট্রগুলো নীতি ও চরিত্রহীনতা ও নির্লজ্জতার অনেক প্রকারের মধ্যে কতককে কিছুটা বাধ্যবাধকতা ও শর্তসাপেক্ষে (যা অপরাধের দরজা বন্ধ করে না, বরং সেগুলোকে আইন-শৃংখলা ও বিধি-বিধানের আওতায় আনা হয় মাত্র) জায়েয তথা অনুমোদিত বলে ঘোষণা দেয়। পতিতাবৃত্তি এসব রাষ্ট্রে আইনত অনুমোদিত। এরা স্বয়ং বিশাল আকারে সুসংগঠিত ও সুশৃংখল পন্থায় সুদী কারবার করে থাকে। সভ্য নামের আড়ালে এরা জুয়ার অনুমতি দেয়, নামের পরিবর্তন এবং এমন কতিপয় শর্তসাপেক্ষে যেগুলো রাষ্ট্রের স্বার্থকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখে। বহু নৈতিক ও চারিত্রিক অপরাধ এদের কাছে বৈধ ও অনুমোদিত বিবেচিত হয়। মদের কেবল অনুমোদনই দেওয়া হয় না, বরং কোন কোন সময় সরকার মদের ব্যবসা নিজের হাতে রাখে এবং এর বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, সোচ্চার প্রতিবাদ তোলে তাদেরকে শাস্তি দেয়।

ফিল্ম নির্মাণ ও চলচ্চিত্র শিল্পকে যা বর্তমান আকারে চলছে তা সর্বপ্রকার অন্যায়-অপকর্মের ও অপরাধের কেন্দ্রবিন্দু এবং জাতির মধ্যে চরিত্রহীনতা ও যৌন উচ্ছৃংলতা সৃষ্টির প্রধান হাতিয়ার, আজ সরকারের রাজস্ব ও আয়ের বিরাট

---

১. Guide to Modern Wickedness, p. 152-3.

বড় উৎস মনে করা হয় এবং এর কুফল ও নৈতিক ক্ষতি দেখেও এবং জানা থাকা সত্ত্বেও সরকার একে রুখতে পারে না, পারে না প্রতিরোধ করতে। রেডিও টেলিভিশনসহ সরকারী তথ্য বিভাগ জাতির নৈতিক ও চারিত্রিক দিক-নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণের পরিবর্তে আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদনের সেবায় নিয়োজিত থাকে এবং জাতির মধ্যে গাম্ভীর্য রক্ষা ও বিশুদ্ধ রুচি সৃষ্টির পরিবর্তে তার মধ্যে বিকৃত রুচি ও ভাসাভাসা তথা হাল্কা মেযাজ সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকে, বরং নিজস্ব প্রোগ্রামের মাধ্যমে ক্রীড়া-কৌতুকের মানসিকতা সৃষ্টি করে এবং শিক্ষা দান ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যম হবার পরিবর্তে ক্রীড়া-কৌতুকের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রকাশনা-মুদ্রণ সংক্রান্ত বিধান ও সরকারী প্রশাসন বিভাগ যেখানে রাজনীতি ও প্রশাসনিক স্বার্থের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, বুদ্ধিমান ও কঠোর হয়ে থাকে এবং সামান্যতম সমালোচনাও যেখানে কোন কোন সময় সহ্য করা হয় না, সেখানে নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রগত বিষয়ে তারা অত্যন্ত উদার, মুক্ত ও দরাজদিল হয়ে থাকে। দায়িত্বহীন সাংবাদিক, অশ্লীল চরিত্রের সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিকেরা তাদের নিকৃষ্টতম বস্তুগত স্বার্থের জন্য জাতির মধ্যে নৈতিক ও চারিত্রিক প্লেগরূপ মহামারীর বিস্তার ঘটায়। কিন্তু যতক্ষণ তা সীমা ছাড়িয়ে না যায় সরকারী প্রশাসন যন্ত্র সক্রিয় ও তৎপর হয় না। এই ধরনের রাষ্ট্রে নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রের সাথে নাগরিকদের স্বাস্থ্যও নিরাপদ থাকে না। কোন কোন বাণিজ্যিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান তাদের অসুস্থ ও ক্ষতিকর শিল্প-পণ্যের দ্বারা দেশবাসীর সাধারণ স্বাস্থ্যকে অব্যাহতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে থাকে এবং ভবিষ্যত বংশধরদেরকে অসুস্থ ও দুর্বল বানাতে থাকে। কিন্তু শাসকদেরকে তারা ঘুষ দিয়ে কিংবা সরকারী ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিরাট অংকের আর্থিক সাহায্য প্রদান করে সরকারী চাপ ও অসন্তোষের হাত থেকে বেঁচে যায়। এসব এজন্য হয়, সরকারের দৃষ্টিকোণ ও তাদের চিন্তাধারা নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্র এবং হেদায়েত ও ইসলাহ (সংস্কার ও সংশোধন) নয়, বরং তাদের লক্ষ্য থাকে আর্থিক মুনাফা ও বাহ্যিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি।

এ ধরনের রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি হলো, দেশের সাধারণ মানুষের নৈতিক অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে এগুতে থাকে। এক ভয়াবহ ও বিপজ্জনক নৈতিক অধঃপতন ও চারিত্রিক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে। গোটা জাতির মধ্যে ও জাতির প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে বেনিয়াসুলভ মুনাফাখোরী ও সুযোগ সন্ধানী মানসিকতার সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ লুটপাটের বাজার গরম হয়ে ওঠে। সকলেই একে অন্যকে কতটা লুটপাট ও শোষণ করতে পারে তার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে এবং নীতি-নৈতিকতা ও চারিত্রিক বিষয়গুলো মানুষের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায়।



পক্ষান্তরে যেসব সরকার ও হুকুমত 'মিনহাজুন নুবূওয়া' তথা নববী ধারায় প্রতিষ্ঠিত, তার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয় তেজারতের পরিবর্তে হেদায়েতের ওপর। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ইবনুল আবদুল আযীযের একজন গভর্নরকে (যিনি তাঁর সরকারী কর্মপন্থার দরুন রাজস্ব হ্রাস ও হুকুমতের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন) বলেছিলেন, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'হাদী' তথা পথপ্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন, তহশীলদার তথা ট্যাক্স কালেক্টর হিসেবে নয়।" এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে ধর্মীয় হুকুমতের সমগ্র রাষ্ট্রনীতির মৌল নীতিমালা ও শাসন পদ্ধতি এসে গেছে।

ধর্মীয় হুকুমতের বৃহত্তর মনোযোগ সাধারণ গণমানুষের ধর্ম, নৈতিক চরিত্র ও তাদের পারলৌকিক লাভ-ক্ষতির চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে। তার আসল কাজ রাজস্ব আদায় ও টোল বৃদ্ধি নয়। এগুলো হয় একেবারেই সাময়িক প্রকৃতির ও দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং শুধুই সংস্কার ও সংশোধনমূলক ও ধর্মীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধন ও সরকারী ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার হিসেবে। এই সরকার রাজনৈতিক ও আর্থিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভেবে থাকে। ধর্মীয় ও নৈতিক মৌল নীতিমালাগুলোকে বস্তুগত লাভ ও স্বার্থের মুকাবিলায় অগ্রাধিকার দেয়। তার রাষ্ট্রীয় চতুঃসীমার মধ্যে সুদ, জুয়া, মদ, ব্যভিচার, অন্যায়-অনাচার, পাপাচার ও সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও এসবের যাবতীয় প্রেরণাদায়ক বিষয় এবং এমন সব আর্থিক ব্যাপার যদ্দারা ব্যক্তির লাভ হলেও সমাজ সমষ্টির ক্ষতি হয়, নিষিদ্ধ ও বেআইনী ঘোষিত হয়, যদিও এর দরুন রাষ্ট্রকে বিরাট আর্থিক ক্ষতি বরদাশত করতে হয় এবং সরকারকে বিপুল রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন রকমের সংস্কার ও সংশোধনমূলক কর্মের প্রচলন ঘটায়। সে জাতির কেবল কর্মের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখে না, বরং তার প্রবণতা ও মানসিকতার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে এজন্য যে, নৈতিক ও চারিত্রিক প্রবণতাই কর্মের জন্ম দেয়। যদি নৈতিক ও চারিত্রিক প্রবণতাই সহীহ-শুদ্ধ না হয় তাহলে কর্মের সংস্কার-সংশোধন, অপরাধ ও নীতি-নৈতিকতাহীন কাজের উৎসাদন কোনভাবেই সম্ভব নয়। এজন্যই সে সেসব বস্তুর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যেগুলো জাতির মধ্যে নীতি-নৈতিকতাবিরোধী, আইন ভঙ্গকারী, আত্মপূজা ও ভোগ-বিলাসপ্রিয়তার প্রবণতা সৃষ্টি করে এবং সেই সমস্ত লোককে অপরাধী ও রাষ্ট্রের দুশমন হিসেবে আখ্যায়িত করে যারা মানুষের মধ্যে নির্লজ্জতা ও অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি করে, চাই কি তারা শিল্পী, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী অথবা কৃষিজীবীই হন না কেন। এই সরকার শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম এবং সাম্রাজ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নৈতিক চরিত্রের দেখাশোনা ও আত্মশুদ্ধির সযত্ন

প্রয়াস নেয়। এজন্য এই রাষ্ট্র ও সরকারের অবস্থানগত মর্যাদা কেবল পুলিশ ও চৌকিদারের নয়, বরং একজন স্নেহশীল মুরুব্বী ও অভিভাবকেরও হয়ে থাকে।

এ ধরনের সরকার ও রাষ্ট্রের স্বাভাবিক পরিণতি হয় তাই যা কুরআন মজীদে প্রথম যুগের মুহাজিরদের আলোচনায় ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ -

"(এসব মজলুম মুসলমান তো তারাই) যাদেরকে আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে।" (সূরা হজ্জ ঃ ৪১)

## ব্যবসা-বাণিজ্য ও নীতি-নৈতিকতার মধ্যে অসহযোগিতা ও বিরোধ

উপচে পড়া সম্পদের এই সঙ্কটের যুগে অথবা লর্ড ম্যাকলের অর্থপূর্ণ ভাষায় "স্বল্পতম সময়ে অধিক থেকে অধিকতর সম্পদ আহরণের আকাঙ্ক্ষী এবং যথাসম্ভব সত্বর ধনী হতে আগ্রহী" লোকদের শাসনামলে এক প্রচণ্ড বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা চলছে যার ফল হলো এই, ক্রীড়া ও বিনোদনসামগ্রী, আরাম-আয়েশের উপকরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিবিধ প্রকারের সৌন্দর্যসামগ্রীর এক বিপুল সমাহার প্রতিদিন কল-কারখানায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত হয়ে শহরে এসে আছড়ে পড়ছে। বাজারে নিত্য-নতুন ডিজাইনের পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতা ও বিভিন্ন চোখ ধাঁধানো আয়েশ-সামগ্রী দোকানের শেলফে ঝলমল করতে থাকে। এরপর একদিন সেগুলো সেকেলে হিসেবে আখ্যায়িত হয়। তারপর তার স্থলে নামমাত্র ঘষা-মাজার পর সেগুলো নতুন পণ্য ও নতুন সামগ্রী হিসেবে পসার জাঁকিয়ে বসে। রূপ-সৌন্দর্য ও উন্নতি-অগ্রগতির মাপকাঠি প্রতিদিন বদলাতে থাকে এবং তা সমান তালে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা কারখানাগুলোর এই অপ্রয়োজনীয় খেল-তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুকের উৎপাদন এবং এই প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার যা বিপণিকেন্দ্রসমূহ ও কলকারখানাগুলোতে কাজ করছে এবং যা লোকের নৈতিক চরিত্র ও সমাজ, শক্তি, অধিকন্তু ক্রয় ক্ষতা সম্পর্কে একেবারেই বেপরওয়া। এর ফল হলো এই, জীবন প্রতিদিনই দুর্বিষহ, জীবন মান বিগত দিনের তুলনায় সমুন্নত, জীবনের চাহিদা ও দাবি এবং জীবনের কৃত্রিম অনুষঙ্গসমূহের ক্রমহারে বৃদ্ধি এবং সেগুলো পূরণের জন্য বৃহৎ থেকে বৃহত্তর আয়ও যথেষ্ট নয়! আর এর ফলে অল্পে তুষ্টি একটি অর্থহীন শব্দে পরিণত



হয়। তৃপ্তি ও চিত্তের প্রশান্তি স্বপ্ন ও কল্পনায় পর্যবসিত হয়। সবার সামনেই নিজের তুলনায় উন্নত মানের জীবনের স্বপ্ন এবং সেখান অবধি পৌঁছাকে সবাই নিজের সব চাইতে বড় কর্তব্য মনে করে। পরিবেশও তার কাছে তারই দাবি পেশ করে এবং এরই প্রত্যাশা করে। তা'না হলে সে নিজেকে ছোট ও অবজ্ঞেয় ভাবতে থাকে। এর প্রাণান্তকর প্রয়াসেই তার একটা বিরাট সময় কেটে যায়। যখন সে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে থাকে তখন তার আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পায় এবং আরেকটি উন্নত জীবন মান তার সামনে এসে ধরা দেয়। আর এভাবেই জীবন এক অন্তহীন প্রয়াস, এমন এক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয় যার কোন আদি নেই, অন্ত নেই। এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হলো, জীবনে তিক্ততা ও যন্ত্রণা খুবই বেড়ে গেছে এবং যেই ঘর খুব সহজেই জান্নাতের নমুনা হতে পারত, সুখ-শান্তির আদর্শ মডেল হতে পারত এবং যার ভেতর জীবনের সর্বপ্রকার স্বাভাবিক ও প্রকৃত আবশ্যকীয় বিষয়গুলো সবই মেলে, কোন না কোন কল্পিত ও ধারণাপ্রসূত জিনিসের ঘাটতির কারণে সাক্ষাৎ জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। সেখানে প্রকৃত ও সত্যিকারের সুখ-শান্তি ও হৃদয়ের তৃপ্তি উবে গেছে।

জনৈক মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তি রোমক ও পারসিক সভ্যতা-সংস্কৃতির যেই চিত্র এঁকেছেন যা বর্তমান গ্রন্থের প্রথম দিককার পৃষ্ঠাগুলোতে বর্ণিত হয়েছে তা সামনে রেখে দেখুন, বর্তমান সভ্যতা-সংস্কৃতির চিত্র তা থেকে কি আদৌ ভিন্নতর? এর নৈতিক ও চারিত্রিক প্রভাবে নৈতিক সীমারেখা ও বিধানসমূহ স্থায়ী ও সুস্থির থাকে নি। সীমিত আয়ের মধ্যে সীমাহীন দাবি, চাহিদা ও ফাই-ফরমায়েশ পূরণের জন্য উৎকোচ গ্রহণ এবং অবৈধ ও বেআইনী উপকরণ আমদানী ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এর পরিণতিতে উৎকোচ (বিভিন্ন নামে) ও অপরাধমূলক লেনদেন এবং গোপন আয়-উপার্জনের বাজার আজ গরম। ফলে জীবনে যে সংকট এবং সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আজ যে অরাজকতা ও বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে তা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার।

এই পরিণাম ফল সাধারণত জীবনের স্বাভাবিক ও প্রকৃত প্রয়োজনগুলোর চাহিদা নয়, বরং কৃত্রিম ও মেকী প্রয়োজনগুলোর দাবি থেকে উদ্ভূত। এর বাঁধন শুধুই আইনের প্রয়োগ ও উৎকোচ নির্মূলকরণ প্রয়াসের দ্বারা সম্ভব নয়। এর জন্য দায়ী সেই জীবন-ব্যবস্থা যা এক দীর্ঘকাল ধরে নৈতিক দিক-নির্দেশনা থেকে মাহরূম, পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তির ধারণা থেকে মুক্ত এবং সেই শিক্ষা ব্যবস্থা যা তার সার্বিক বস্তুবাদী কাঠামোর দরুন নৈতিক অনুভূতি ও বিবেকবোধ সৃষ্টি করতে এতটাই ব্যর্থ যতটা সুত্রধর ও কর্মকারের পেশা কিংবা চিত্রাংকন ও সঙ্গীত শিল্প হতে পারে। এর জন্য দায়ী সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা আয় ও উৎপাদন ব্যবস্থার

উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখাকে তো আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও নৈতিক চরিত্রের পারস্পরিক সহযোগিতাকে জরুরী মনে করে না।

**বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও বর্তমান যুগের আবিষ্কার-উদ্ভাবন**

বর্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কার-উদ্ভাবনের দিক দিয়ে মানব ইতিহাসের প্রাগ্রসর যুগ হিসেবে পরিচিত এবং তার এই বৈশিষ্ট্যের কারণে সে স্বাভাবিকভাবেই এই দাবি করতে পারে, তাকে আবিষ্কার-উদ্ভাবন, বিদ্যুৎ ও ইস্পাত যুগ হিসাবে অভিহিত করা হবে। য়ুরোপের নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এ ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত এবং তার বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ও আবিষ্কারকদের মেধা ও শিল্প-নৈপুণ্য অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু আমরা এই সব শৈল্পিক সাফল্য ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনকে এক বিশেষ সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করব এবং দেখব, এসব আবিষ্কার-উদ্ভাবনের লক্ষ্য কি এবং তা আপন লক্ষ্য অর্জনে কতটা সফল হয়েছে এবং দুনিয়ার জন্য এসব আবিষ্কার-উদ্ভাবন কল্যাণকর ও বরকতময় প্রমাণিত হয়েছে, নাকি সেগুলো পৃথিবীর সমস্যা-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট কিছুটা বৃদ্ধিই করেছে।

**প্রযুক্তিগত আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি**

আমাদের মতে এসব তাত্ত্বিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কার-উদ্ভাবনের সঠিক লক্ষ্য হলো, মানুষকে জীবনের স্বাভাবিক চলার পথে নিজের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার কারণে যেসব বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা এবং সঠিক ও বিশুদ্ধ লক্ষ্যের আওতাধীনে (যার মধ্যে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করা ও ফেতনা-ফাসাদ অন্তর্ভুক্ত নয়) আল্লাহ্‌র অপার কুদরতের সেই সব শক্তি ও সম্পদ থেকে উপকৃত ও লাভবান হওয়া যা এই বিশ্ব জগতে ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাচীনকালে মানুষ পায়ে হেঁটে চলত। এরপর তার উপলব্ধিতে ধরা পড়ল, সে জীব-জানোয়ার থেকে উপকৃত হবে। এ উদ্দেশে সে গরুর গাড়ি কাজে লাগাল। এরপর চলার ক্ষেত্রে তার গতিকে সে আরও দ্রুত করতে চাইল। সে বায়ুর গতিবেগসম্পন্ন ঘোড়ার সাহায্যে দিনের পথ ঘণ্টায় অতিক্রম করল। মানব প্রকৃতিতে অল্পে তুষ্টি নেই, তৃপ্তি নেই। প্রতিযোগিতার আবেগ তাকে নির্দিষ্ট কোন মনযিলে থাকতে দেয় না। এছাড়া তার প্রয়োজনও



বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরাম ও দ্রুততার মানও উন্নত থেকে সমুন্নততর হয়ে চলেছে এবং ক্রমান্বয়ে এমন সব বাহনের উদ্ভব ঘটেছে যার ভেতর প্রতিটিই আগের তুলনায় অধিক দ্রুতগতিসম্পন্ন। সামুদ্রিক সফরে সে বায়ু চালিত পালের নৌকা থেকে স্টীম গ্যাসচালিত জাহাজ পর্যন্ত উন্নতি করেছে। স্থল ও আকাশ পথের পরিবহন যন্ত্রপাতি ও উপায়-উপকরণও এই পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে, আগেকার যুগের লোকদের তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যদি সঠিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে এ থেকে ফায়দা হাসিল করা হয়, অনাবশ্যক কষ্ট ও শ্রম, সময় ও শক্তির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে বেঁচে এগুলোকে আরও কোন উত্তম ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় তাহলে এটা অবশ্যই আল্লাহ্‌র নেয়ামত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে সফরের এই আরাম, সহজসাধ্যতা ও দ্রুততাকে পুরস্কার হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং একে মানুষের ওপর তাঁর এমন এক অনুগ্রহ বলে অভিহিত করেছেন যে, সে এসব দ্বারা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অপরাপর সৃষ্টির মাধ্যমে সফর ও পরিবহনের বড় বড় কষ্টকর পরিশ্রমের হাত থেকে বেঁচে যায় এবং একে তাঁর আরাম ও করুণার এক নিদর্শন ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি (আল্লাহ পাক) বলেন ঃ

وَالاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ - وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ - وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلاَّ بِشِقِّ الْاَنْفُسِ - اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَّحِيْمٌ - وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً - وَيَخْلُقُ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ -

"তিনি আন'আম (অর্থাৎ উট, গরু, মেষ, ছাগল, অন্যান্য অহিংস্র ও রোমন্থনকারী জন্তু, যথাঃ হরিণ, নীল গাঈ, মহিষ ইত্যাদি) সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য ওতে শীতনিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং ওগুলো থেকে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক এবং তোমরা যখন গোধূলি বেলায় ওদেরকে চারণভূমি থেকে ঘরে নিয়ে আস এবং ভোরবেলা যখন ওদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা সৌন্দর্য উপভোগ কর এবং ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূর দেশে যেখানে প্রাণান্তকর কষ্ট-ক্লেশ ব্যতিরেকে তোমরা পৌঁছুতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর, গাধা এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও।" (সূরা নাহল ঃ ৫-৮)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً -

"আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে চলাচলের বাহন দিয়েছি; ওদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" (বনী ইসরাঈল, ৭০)

وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ - لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ - وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

"যিনি যুগলসমূহের প্রতিটিকে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও আন'আম যাতে তোমরা আরোহণ কর, যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর ওপর স্থির হয়ে বস; এবং বল, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।" (সূরা যুখরুফঃ ১২-১৪)

হযরত সুলায়মান (আ)-এর ওপর আপন অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ -

"আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত।" (সূরা সাবা, ১২)

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ -

"তখন আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করত, সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হ'তো।" (সূরা সাদঃ ৩৬)

কিন্তু এই সব নেয়ামত ও আরামপ্রদ সুযোগ-সুবিধা থেকে ফায়দা হাসিলের জ্ঞাত ও আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ লোকের মন-মানসিকতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। একজন মু'মিন ও বিশ্বাসী বান্দাকে এর জন্য হেদায়েত দেওয়া হয়েছে এবং তার কাছে আশা করা হয়েছে, সে এসব নেয়ামত থেকে উপকৃত



হবার সময় একথা সব সময় ও সদা সর্বদা মনে রাখবে, এ শুধুই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত পুরস্কার ও তাঁর দান। তিনি এই মুক্ত ও লাগামহীন পশুগুলোকে (অথবা অনুভূতিহীন ও চলচ্ছক্তিহীন লোহা ও কাষ্ঠ-খণ্ডকে) এভাবে তার অনুগত, অধীন ও হাতিয়ার বানিয়ে দিয়েছেন, সে তার হুকুমে ও ইচ্ছায় تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ প্রবাহিত হয় যেখানে সে ইচ্ছা করে মৃদুমন্দ গতিতে। যদি তাঁর প্রদত্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল ও শক্তি-সামর্থ্য তার সহগামী না হতো তাহলে এটা তার সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ -

"যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওদের ওপর স্থির হয়ে বস এবং বল, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে" (যুখরুফঃ ১৩) এবং ঠিক উপকার লাভের অবস্থায় একথা যেন চোখের সামনে থাকে, সেই শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বস্তুসামগ্রীর আসল স্রষ্টা ও এই বিশ্বজগতের মালিকের দরবারে সে হাজির হতে বাধ্য এবং তাকে একদিন এসবের হিসাব দিতে হবে, সে এসব নেয়ামত থেকে, আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজি থেকে কি উপকার পেয়েছে, এগুলোকে সে কোথায় ব্যবহার করেছে, কাজে লাগিয়েছে এবং এসবের কী হক সে আদায় করেছে। অনন্তর আয়াতের শেষাংশে বলেছেনঃ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ "আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।" (যুখরুফঃ ১৪) একজন মু'মিন তথা বিশ্বাসী বান্দা এসব নেয়ামতকে শুধুই আল্লাহর অবদান, অনুগ্রহ ও পুরস্কার এবং কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার পরীক্ষা মনে করে। হযরত সুলায়মান (আ)-এর ভাষায় ঃ

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ قف لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ط وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ -

"এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ, না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।" (সূরা নামলঃ ৪০)

মু'মিন ও গায়র মু'মিন তথা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে একটি পার্থক্য এই, মু'মিন ঐসব হাতিয়ার ও শক্তিকে যথাস্থানে ব্যবহার করে এবং ঐসবের সাহায্যে আল্লাহর দীন ও সত্য-সুন্দর ব্যবস্থার সাহায্য-সহযোগিতার কাজ নেয় যা ঐসব বস্তুসামগ্রী সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও আসল উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ -

"আমি লোহাও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ এজন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (সূরা হাদীদ ঃ ২৫)

আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে যিনি জানেন এবং যিনি আল্লাহভীরু মানুষ, তিনি আল্লাহপ্রদত্ত শক্তি ও আন'আমকে পাপীদের সহযোগী ও সাহায্যের উপকরণ বানান না। হযরত মূসা (আ) বলেন ঃ

رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ -

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।" (সূরা কাসাসঃ ১৭)

অনন্তর সহীহ-শুদ্ধ দীন তাই যা আল্লাহ্র পরিচয়, জ্ঞান ও আল্লাহ্র ভয়ভীতি সৃষ্টি করে, যা গোটা সৃষ্টি জগতের আসল স্রষ্টা এবং বিশ্বজাহানের প্রকৃত শাসকের পরিচয় জ্ঞাপন করে এবং বলে, মানুষ ঐসব শক্তি ও সম্পদের আমানতদার মাত্র। তাকে তাঁর সামনে হাযির হতে হবে এবং ঐসব শক্তি ও সম্পদ সে কোথায় ব্যয় করেছে সে সম্পর্কে তাকে জওয়াব দিতে হবে। ধর্ম তথা দীন তো তাই যা মানুষকে শক্তির নেশায় মত্ত, আপন ক্ষমতা ও এখতিয়ারাধীন শক্তিদৃষ্টে আত্মহারা হতে দেয় না। দীন তো তাই যা ঐসব বস্তুসামগ্রীকে বৈধ, অনুমোদিত ও যথাযথ স্থানে ব্যবহার ও নিয়োগের রাস্তা বাতলে দেয়। সে ঐসব জিনিসকে কার্যকর, মানব জাতির জন্য উপকারী এবং দুনিয়ার অনুকূলে কল্যাণ ও বরকতের হেতু বানায়। দীন তো তাই যা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, তার শক্তি ও তার আখলাকের মধ্যে ভারসাম্য কায়েম রাখে। একমাত্র দীন তথা ধর্মই মানুষের ব্যক্তিগত উপকারিতা ও কল্যাণ চিন্তাকে সমষ্টিগত উপকারিতা ও কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ রাখে। ধর্মই মানুষের মধ্যে আপন শক্তি ও এখতিয়ারসমূহকে পর্যবেক্ষণ ও অনুভবের সময় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যপূর্ণ এবং গর্ব



ও অহংকারের পরিবর্তে নম্রতা, বিনয় ও বান্দাসুলভ শান সৃষ্টি করে। কুরআন মজীদ দু'ধরনের নমুনাই পেশ করেছে। হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম ঠিক ক্ষমতার মসনদে পরিপূর্ণ দাপটের সঙ্গে আসীন থাকাকালে বলেছিলেন ঃ

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ج فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قف اَنْتَ وَلِىّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ -

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ। হে আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর" (সূরা ইউসুফ, ১০১)।

হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামের যখন আপন ক্ষমতা, শক্তি, শৌর্য-বীর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তির দিকে চোখ পড়ল অমনি তাঁর মুবারক যবান থেকে বেরিয়ে পড়ল ঃ

رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ -

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য এবং যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎ কর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত কর।" (সূরা নাম্ল ঃ ১৯)

পক্ষান্তরে যারা ছিল দীন-ধর্মরূপ সম্পদ থেকে মাহরূম এবং আল্লাহ্‌বিস্মৃত, তারা আপন ক্ষমতা, শক্তি ও সম্পদ নিয়েই গর্বিত আর তারা তাদের চাইতে আর কাউকে বড় বলে মনে করত না।

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً لا اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ -

"আর আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার হলো, ওরা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত, 'আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে আছে'? ওরা কি তবে লক্ষ্য করে নি,

আল্লাহ যিনি ওদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি ওদের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী? অথচ ওরা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত" (সূরা হামীম আস-সাজদা, ১৫)।

কুরআন পাক আমাদেরকে অতীত কালের এক বিরাট ধনাঢ্য ব্যক্তির (কারূনের) কাহিনী শুনিয়েছে যাকে কিছু বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক বলেছিল, নিজের ধন-সম্পদ নিয়ে বেশি দম্ভ কর না, আপন ধন-সম্পদ দিয়ে পরকালের পাথেয় সঞ্চয় কর এবং আল্লাহ্ তোমার যেই উপকার করেছেন তুমি প্রত্যুপকার দ্বারা তার বিনিময় দাও। আর যমীনে ফেতনা-ফাসাদ করো না।

اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ - وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ -

"স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, 'দম্ভ কর না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পসন্দ করেন না।' আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না পরোপকার কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।" (সূরা কাসাস, ৭৬-৭৭)

কারূন এর উত্তরে বলল, আমি এই ধন-সম্পদের ব্যাপারে কারুর অনুগ্রহের কাছে ঋণী নই। এতো কেবল আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার ফসল। قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ "সে বলল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে পেয়েছি।"

আপন শক্তির ধারণা ও অনুভূতি এবং নিজের ওপর আর কোন সত্তা ও উর্ধ্বতর শক্তির অস্বীকার করার পরিণাম শক্তির সেই নেশা যা মানুষকে পাগল বানিয়ে দেয় এবং যাকে কোন নৈতিক পথ-নির্দেশনা ও শিক্ষা, মানবতার কোন প্রেরণা ও উপযোগিতাই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। মানুষ তার লৌহ শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে অসহায় ও বন্দী থাকে এবং দুর্বল জাতিগুলো তার পদতলে সবুজ ঘাসের ন্যায় পিষ্ট হতে থাকে। আদ সম্প্রদায়কে তাদের পয়গম্বর বলেছিলেন ঃ

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ

"আর তোমরা যখন আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক কঠোরভাবে" (সূরা শুআরা ঃ ১৩০)। বিদ্রোহ, অহংকার, ফেতনা-ফাসাদ, মানুষকে কষ্ট দেওয়া ও হত্যা করা এরই অনিবার্য পরিণতি।



اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ -

"ফেরাউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে ওদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল; ওদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে সে জীবিত রাখত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।" (সূরা কাসাসঃ ৪)

বিশুদ্ধ ধর্মের গভীর প্রভাব ও নৈতিক প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে যখন শক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প উন্নতি করে তখন তার স্বাভাবিক পরিণতি তাই হয় যা ওপরে বর্ণিত হলো।

### য়ূরোপে শক্তি ও নৈতিকতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মের ভারসাম্যহীনতা

দুর্ভাগ্যের বিষয়, য়ূরোপে শক্তি ও নীতিনৈতিকতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যে ভারসাম্য থাকা দরকার ছিল, কয়েক শতাব্দী থেকে তা বিগড়ে আছে। রেনেসাঁর পর থেকে বস্তুগত শক্তি ও বাহ্যিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বড় দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকে এবং ধর্ম ও নৈতিক চরিত্রের দ্রুত অবনতি হতে থাকে। কিছু কাল পর এ দুয়ের মধ্যে কোনরূপ ভারসাম্য অবশিষ্ট থাকে নি এবং এমন এক প্রজন্ম জন্মলাভ করে যাদের দাঁড়ির এক পাল্লা আসমানের সাথে কথা বলে আর অপর পাল্লা যমীনে (অর্থাৎ তারা এতটা অহংকারী যে, আকাশ ফেড়ে মাথা তুলতে চায়, পক্ষান্তরে নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রের দিক দিয়ে এতটাই অধঃপতিত যে, তারা সাত-তবক যমীনের নিচে হারিয়ে গেছে)। এই প্রজন্ম একদিকে নিজেদের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতি-অগ্রগতি এবং নিজেদের অস্বাভাবিক অভ্যাস ও কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে , অধিকন্তু বস্তুগত ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে আয়ত্তাধীন ও বশে আনার ব্যাপারে মনুষ্য-উর্ধ্ব সত্তা তথা 'অতি মানব' মনে হয়। অপর দিকে আপন নৈতিক চরিত্র ও কর্ম, লোভ-লালসা, হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতার দিক দিয়ে সে চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণী থেকে আদৌ ভিন্নতর কিছু নয়। তাদের কাছে জীবনের সর্ববিধ উপকরণই বিদ্যমান কিন্তু তথাপি তাদের বাঁচা হচ্ছে না। তাদের জীবনের চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ জ্ঞান ও সমস্যাদি জানা আছে, কিন্তু তারা মনুষ্য জীবন, সংস্কৃতি ও নীতি- নৈতিকতার প্রাথমিক নীতি ও ধারণাটুকু পর্যন্ত রাখে না। তাদের জ্ঞানগত ও প্রযুক্তিগত সমুন্নতি এবং নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের মধ্যে একেবারেই কোন সামঞ্জস্য

নেই। প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান তাকে যেই বিরাট শক্তি দান করেছে তার ব্যবহারের নিয়ম-রীতি সে জানে না।

অধ্যাপক জোড্ যথাযথ বলেছেন ঃ

প্রকৃতি বিজ্ঞান আমাদেরকে দেবতাসুলভ শক্তি দান করেছে, কিন্তু আমরা তা শিশু ও বন্য অসভ্যদের মস্তিষ্ক দিয়ে ব্যবহার করছি।

অন্য এক জায়গায় তিনি লিখেছেন ঃ

"শিল্পে আমাদের বিস্ময়কর উন্নতি, অগ্রগতি এবং নৈতিক ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে আমাদের লজ্জাজনক ছেলেমিপনা ও বালখিল্যতার মাঝে যে দুস্তর ব্যবধান তার সঙ্গে আমাদের প্রতিটি বাঁকেই মুখোমুখি হতে হয়। একদিকে শিল্প ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির অবস্থা হলো, আমরা ঘরে বসেই সমুদ্রের অপর পার থেকে এবং এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশের লোকের সঙ্গে অবলীলায় কথা বলতে পারি। সমুদ্রের ওপর ও যমীনের নিচে আমরা দৌড়ে বেড়াচ্ছি। রেডিওর সাহায্যে শ্রীলঙ্কায় বসে লন্ডনের বৃহত্তম ঘণ্টার (Big Ben) আওয়াজ শুনছি। শিশুরা টেলিফোনের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে। বৈদ্যুতিক ছবি আসা শুরু হয়েছে। শব্দহীন টাইপ রাইটার চুপচাপ তার কাজ করছে। কোনরূপ কষ্ট ও ব্যথা-বেদনা ছাড়াই দাঁত ফিলিং করা যাচ্ছে। বিদ্যুতের সাহায্যে রান্না-বান্না চলছে। রাবারের সড়ক নির্মিত হচ্ছে। এক্স-রে-এর সাহায্যে আমরা আমাদের শরীরের ভেতরের অংশ উঁকি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। ছবি কথা বলছে, গান গাচ্ছে। ফিঙ্গার প্রিন্ট বা আঙ্গুলের ছাপের সাহায্যে অপরাধী ও খুনি-ঘাতকের সন্ধান বের করা যাচ্ছে। বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে চুল কোঁকড়ানো হচ্ছে। সামুদ্রিক জাহাজ উত্তর মেরু পর্যন্ত এবং উড়োজাহাজ দক্ষিণ মেরু অবধি উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও আমাদের দ্বারা এতটুকু হতে পারে না যে, আমরা বড় বড় শহরে এমন কোন মাঠ বানাই যেখানে দরিদ্র শিশুরা আরামে নিরাপদে খেলতে পারে। ফলে বছরে প্রায় দু'হাজার শিশুকে আমরা হত্যা এবং প্রায় নব্বই হাজার শিশুকে যখম করছি।

"একবার একজন ভারতীয় দার্শনিকের সঙ্গে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্ময়কর সব বস্তুর প্রশংসা করছিলাম। সে সময় একজন মোটরচালক Pending Sands-এর ওপর দিয়ে তিন কিংবা চার শ' মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল অথবা কোন উড়োজাহাজ চালক মস্কো থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত দূরত্ব, আমার ঠিক মনে নেই, বিশ কিংবা পঞ্চাশ ঘণ্টায় অতিক্রম করেছিল। আমি যখন সব বলে শেষ করলাম তখন সেই ভারতীয় দার্শনিক বললেন, হ্যাঁ, যা বললে তা সবই ঠিক, তোমরা পাখির মত বাতাসে ভর দিয়ে উড়ছ এবং পানিতে



মাছের মত সাঁতার কাটছ, কিন্তু এখন পর্যন্ত মাটির ওপর দিয়ে কেমন করে মানুষের মত হাঁটতে হয় তা তোমাদের জানা হয়ে ওঠেনি।"[১]

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প এবং নীতি- নৈতিকতা ও মানবতার মাঝে যে বিরাট ব্যবধান বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং বর্তমান সভ্যতা তার লক্ষ্য হাসিলে এবং মানবতার সঠিক খেদমত আঞ্জাম দিতে যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে এর ওপর মতামত পেশ করতে গিয়ে অপর পাশ্চাত্য মনীষী নোবেল বিজয়ী ফরাসী সার্জন ড. এ্যালেক্সিস ক্যারল তাঁর Man the Unknown নামক গ্রন্থে বলেনঃ

"বর্তমান জীবন মানুষকে সম্ভাব্য যে কোনভাবে সম্পদ অর্জন ও আহরণ করতে উৎসাহিত করে। সম্পদ আহরণের এ সব উপায়-উপকরণ মানুষকে সম্পদের লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছায় না। এটা মানুষের মধ্যে এক নিরন্তর উত্তেজনা ও জৈবিক কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তির একটি ভাসাভাসা আবেগ সৃষ্টি করে। এসবের প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় মানুষ ধৈর্য ও সংযম হারিয়ে ফেলে এবং এমন সব কাজ থেকে সে অনীহা প্রকাশ করতে থাকে যা কিছুটা কষ্টকর ও আরামসাপেক্ষ। মনে হয়, আধুনিক সভ্যতা এমন মানুষ সৃষ্টিই করতে পারে না, যাদের ভেতর শৈল্পিক সৃষ্টিকুশলতা, বুদ্ধিমত্তা ও সাহস আছে। প্রতিটি দেশের ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণীর মধ্যে, যাদের হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি রয়েছে —মানসিক ও নৈতিক যোগ্যতার দৃশ্যমান অবনতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা অনুভব করছি, আধুনিক সভ্যতা সেই সব বড় বড় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি যা মানবতা তার প্রতি পোষণ করেছিল এবং সে সেই সমস্ত লোক জন্ম দিতে ব্যর্থ হয়েছে যারা মেধা ও সাহসিকতার অধিকারী হবে এবং সভ্যতাকে সেই কষ্টকর ও দুরতিক্রম্য রাস্তায় নিরাপদ শান্তির সাথে নিয়ে যেতে পারে যার ওপর সে আজ ঠোকর খাচ্ছে। আসল ব্যাপার, ব্যক্তি ততটা দ্রুততার সাথে উন্নতি করেনি যতটা দ্রুততার সাথে করেছে ঐ মনুষ্য মস্তিষ্কপ্রসূত প্রতিষ্ঠানগুলো। এ মূলত রাজনৈতিক নেতাদের মস্তিষ্কজাত ও নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতির পরিণাম ফল এবং তাদের এই মূর্খতা বর্তমানে জাতিগোষ্ঠীসমূহকে সঙ্কটের মুখে নিক্ষেপ করেছে। প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-প্রযুক্তি মানুষের জন্য যেই পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা মনুষ্য উপযোগী নয় এজন্য যে, তা সুপরিকল্পিতভাবে স্থাপিত নয় এবং তার ভেতর মানুষের সত্তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। এই পরিবেশ যা শুধুই আমাদের মেধা ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ফসল, আমাদের আকার-আয়তন ও আমাদের আকার-আকৃতি মুতাবিক নয়। আমরা খুশি নই। আমরা এক অব্যাহত নৈতিক

1. Guide to modern wickedness, p. 263-63.

ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধঃপতনের মাঝে নিপতিত। যেসব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রযুক্তিগত সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে এবং চরম উন্নতি লাভ করেছে তারা আগের তুলনায় খুবই দুর্বল এবং খুবই দ্রুততার সাথে অসভ্যতা ও বর্বরতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু তাদের এ অনুভূতি নেই। তাদেরকে এই মুহূর্তে সেই বিদ্রোহী মানবতার দুশমন পরিবেশ থেকে কোন শক্তিই বাঁচাতে পারে না যা প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান তার চারপাশে বেষ্টনীর মত টেনে দিয়েছে।

"বাস্তবতা হলো, আমাদের সভ্যতা বিগত সভ্যতাগুলোর মত জীবন-যিন্দেগীর নিমিত্ত এমন সব শর্ত আরোপ করে দিয়েছে যেগুলো (কতক অজ্ঞাত কারণে) জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে। আমরা বস্তুবাদ সম্পর্কে যতটা জানি এর তুলনায় জীবনের জ্ঞান এবং এ সম্পর্কে যে, মানুষকে কিভাবে জীবন অতিবাহিত করা দরকার, খুবই কম জানি এবং আমাদের জ্ঞান এ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত খুবই পেছনে পড়ে রয়েছে আর এই কম জানার ফলে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি-এর ফলে আমরাই ভুগছি।"[১]

"আবিষ্কার-উদ্ভাবন যেই দ্রুততার সাথে অগ্রসর হচ্ছে এবং যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর থেকে উপকার গ্রহণ করা হচ্ছে না। পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদানের দ্বারা কোন লাভ নেই। আরামপ্রিয়তা, বিলাসিতা, সৌন্দর্য, আকার-আয়তন ও জীবনের কৃত্রিম বিলাস-ব্যসনের বৃদ্ধি ও উন্নতি দ্বারা কী লাভ যখন আমাদের দুর্বলতা আমাদেরকে এর থেকে ফায়দা হাসিল করতে দেয় না এবং আমরা একে সঠিক পথে লাগাতে পারি না? এমন জীবন-ব্যবস্থাকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার দ্বারা কী লাভ যার থেকে নৈতিক দিক একেবারেই বের করে দেওয়া হয় এবং মহান জাতিগোষ্ঠীগুলোর গুণগুলোকে ফেলে দেওয়া হয়? আমাদের জন্য তো এটাই সমীচীন ছিল, দ্রুতগামী জাহাজ, অধিক আরামদায়ক মোটর কার, সুলভ মূল্যের রেডিও ও আধুনিকতম মান-মন্দিরের পরিবর্তে আমরা নিজের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করব, মনোযোগ দেব। যান্ত্রিক, প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধ্যের ভেতর এটা নেই যে, সে আমাদেরকে মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দান করতে পারে, দান করতে পারে নৈতিক শৃংখলা ও চারিত্রিক বিধান, স্বাস্থ্য, স্নায়বিক ভারসাম্য, শান্তি ও নিরাপত্তা।"[২]

### বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অপব্যবহার

প্রকৃত ব্যাপার হলো, এই সব আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি স্বস্থানে সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিরপেক্ষ। সে মানুষের ইচ্ছা-অভিলাষ, তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও তার

1. Man, the unknown, pp, ৩৮-৩৯, ; ২. প্রাগুক্ত, ৫০-৫১ পৃ.



নীতি-নৈতিকতাবোধের অধীন। সে নিজে থেকে আবিষ্কৃত জিনিস স্বয়ং ভাল হলেও মানুষের ভুল, অন্যায় অপব্যবহার এবং আপন প্রকৃতি ও প্রশিক্ষণের খারাবী দ্বারা সেগুলোকেও খারাপ বানিয়ে দেয়। এজন্য সব চাইতে বেশি দেখা প্রয়োজন, এসব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিগত উপকরণ ব্যবহারকারী লোকগুলো কেমন, কী রকম নৈতিক চরিত্র ও জীবনাচারের অধিকারী এবং কী ধরনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সে পোষণ করে।

পাশ্চাত্য জাতিগুলো দীর্ঘকাল থেকে এই বিশ্বাস পোষণ করে আসছে, আনন্দ-ফুর্তি, আরাম-আয়েশ, বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা ভোগ, মাথা উঁচু করে চলা ও অন্যের ওপর প্রাধান্য লাভ করা ছাড়া পৃথিবীর বুকে মানুষের আর কোন অর্জনযোগ্য লক্ষ্য নেই। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা নিজেদের সমগ্র শক্তি ও মেধা এসব লক্ষ্য অর্জনে ব্যয় করেছে এবং এমন সব যন্ত্রপাতি ও উপায়-উপকরণ আবিষ্কার করেছে যা দিয়ে এসব লক্ষ্য খুব সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে অর্জন করা যায়। ক্রমান্বয়ে উপকরণগুলো নিজেই একদিন লক্ষ্যে পরিণত হয়ে গেল এবং আবিষ্কার-উদ্ভাবন আপন জায়গায় নিজেই এক বিরাট ও মহান লক্ষ্য হিসাবে অভিহিত হলো। যে রকম একজন শিশু স্বভাবতই খেলনা ভালবাসে, ঠিক তেমনি এসব আবিষ্কার-উদ্ভাবনের প্রতি তার ভালবাসা জন্মাল। এ সবের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। য়ূরোপে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটতে লাগল। মানদণ্ড গেল বদলে। কিছুকাল আগে তাদের এই ধারণা প্রবল ছিল, আরামের নামই হলো সভ্যতা আর আরাম তথা প্রশান্তি ছিল তাদের সবচাইতে বড় আদর্শ। অতঃপর বিভিন্ন কার্যকারণের ওপর ভিত্তি করে এবং কিছুটা আরাম ও প্রশান্তি লাভের নিমিত্ত দ্রুততা ও দ্রুতগামিতার প্রয়াস গ্রহণ করা হয় এবং জীবনের সকল শাখায় দ্রুততা ও গতি সৃষ্টির প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। লোকে এর মাঝে এভাবে মত্ত হয়ে যায় যে, ক্রমান্বয়ে তারা মনে করতে থাকে, গতি ও দ্রুততার নামই হলো সভ্যতা। এখন দ্রুততা তথা গতিই তাদের জীবনের আদর্শে পরিণত হল। অধ্যাপক জোড় বলেনঃ

"ডিজরেলী (Disraeli)-র কথা থেকে মনে হয়, সমসাময়িক যুগের সমাজ ও সোসাইটির বিশ্বাস ছিল, আরামপ্রিয়তার নামই হলো সভ্যতা। কিন্তু আমাদের যুগের সমাজ-সোসাইটির বিশ্বাস হলো, দ্রুততা তথা গতির নাম হলো সভ্যতা। দ্রুততা তথা গতি হলো বর্তমান কালের যুবকদের আরাধ্য। এর মণ্ডপ ও মন্দিরে তারা আরাম, প্রশান্তি, শান্তি এবং অন্যান্যের সাথে দয়ামায়াকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বলি দেয়।"[১]

1. Guide to modern wickedness, p, 241.

আমাদের এখন দেখতে হবে, সেই সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী ছিল যার জন্য এসব যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব থেকে কতটা উপকার লাভ করা হচ্ছে এবং একে মানব জাতির জন্য কতটা উপকারী ও কার্যকর বানানো হচ্ছে। মানুষের অবস্থা ঐসব শক্তি ও উপকরণের বর্তমানে কয়েক শতাব্দী পূর্বের লোকদের চাইতে কতটা উত্তম। এর উত্তর একজন পাশ্চাত্য মনীষী, লেখক ও সমালোচকের ভাষায় দেওয়াই সমীচীন হবে ঃ

"নিঃসন্দেহে আমরা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ও দ্রুত গতিতে স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণ করতে পারি। কিন্তু এটাও দেখার বিষয়, যেসব স্থান আমরা ভ্রমণ করি সেগুলোর খুব কমই ভ্রমণ উপযোগী। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, পর্যটকদের জন্য পৃথিবী খুবই সংকীর্ণ ও তার রশি সংকুচিত হয়ে গেছে। এক জাতি অন্য জাতির কাছাকাছি এসে গেছে এবং তাদের পা একে অন্যের দহলিজে। কিন্তু এর ফল এই, জাতি-গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী অসুন্দর ও অপ্রস্ফুটিত। সে সব উপকরণ যার সাহায্যে আমরা আমাদের প্রতিবেশী জাতিগোষ্ঠীগুলোর সম্পর্কে সরাসরি ওয়াকিফহাল হতে পারি সেগুলো উল্টো গোটা দুনিয়াটাকেই যুদ্ধের দাবানলের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আমরা আওয়াজ পৌঁছুবার জন্য যন্ত্র আবিষ্কার করেছি এবং এর সাহায্যে আমরা প্রতিবেশী জাতিগুলোর সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু এর পরিণতি হয়েছে এই, আজ প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী বাতাসকে পূর্ণ শক্তিতে প্রতিবেশী জাতিগুলোকে উৎপীড়ন করতে ও বিরক্ত করতে কাজ লাগাচ্ছে। তারা এই চেষ্টায় থাকে যে, এগুলো অপরাপর জাতিগুলোকে তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিতে বাধ্য করুক।"[১]

"উড়ো জাহাজকে দেখুন, বাতাসে ভর করে আসমানের বুকে উড়ে বেড়াচ্ছে। আপনি ধারণা করবেন, এর আবিষ্কারক তাঁর জ্ঞান, নৈপুণ্য ও শিল্প-কুশলতার দিক দিয়ে মানুষ নয়, মনুষ্য-উর্ধ্ব কোন সত্তা ছিল এবং যারা এতে প্রথম আরোহণ করে আকাশে উড়েছিল। এতে কোনই সন্দেহ নেই, তাদের উচ্চ মনোবল, অটুট সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তি ও দুঃসাহস অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু এখন আপনি একটু সেই সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করুন যার আওতাধীন এই উড়োজাহাজ ব্যবহৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হবে। সেসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী? আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ, মানব দেহগুলোকে খণ্ড-বিখণ্ডকরণ, জীবিতদের জীবন হরণ, মানব দেহগুলোকে ভস্মীভূতকরণ, বিমান থেকে বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপণ এবং প্রতিরক্ষায় অসমর্থ দুর্বলদেরকে ধ্বংস করা। এসব লক্ষ্য

1. Guide to modern wickedness. p. 247.



তো কেবল আহমকদের হতে পারে অথবা শয়তানদের (কোন মানুষের কিছুতেই নয়)।

"এখন দেখতে হবে, ভাবী কালের ঐতিহাসিক এ সম্পর্কে কি রায় দেন, আমরা ধাতব পদার্থ ও স্বর্ণ কিভাবে ব্যবহার করতাম। ঐতিহাসিক লিখবেন, আমরা এমন উন্নতি করেছিলাম, আমরা বেতার টেলিগ্রাফীর মাধ্যমে স্বর্ণ সম্পর্কে তথ্য দিতে পারতাম। তিনি এমন চিত্র পেশ করবেন যা দেখাবে, ব্যাংকের লোকেরা কী নিপুণভাবে স্বর্ণের ওজন করত ও হিসাব রাখত। তিনি এই অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করবেন যার সাহায্যে আমরা প্রত্যহ অভিগমন প্রক্রিয়ার আইন ফাঁকি দিয়ে এক রাজধানী থেকে আরেক রাজধানীতে স্বর্ণ স্থানান্তরিত করতে থাকতাম। তিনি লিখবেন, এই অর্ধ বন্যরা শিল্প-প্রযুক্তিতে খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিল, ছিল দুঃসাহসী। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যর্থ ছিল যা স্বর্ণের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে এবং একে সঠিকভাবে বণ্টন করতে প্রয়াসী ছিল। তাদের কেবল এতটুকু চিন্তা ছিল, তারা মূল্যবান ধাতুসমূহকে সম্ভাব্য দ্রুততার সঙ্গে প্রোথিত করবে। তারা স্বর্ণ ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ আফ্রিকায় যমীনের বুক চিরে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উত্তোলন করত এবং লন্ডন, নিউ ইয়র্ক ও প্যারিসের পাতাল কুঠরিসমূহে প্রোথিত করত।"[১]

### বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ধ্বংসাত্মক প্রকৃতি

পেছনে বর্ণিত বিভিন্ন অবস্থা ও কার্যকারণের প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে আগ্রহ ও ভালোর দিকে প্রবণতা কমে গেছে এবং নৈতিক চরিত্র ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সহীহ-শুদ্ধ নীতিমালা ও সূত্র গ্রন্থি তাদের হাত থেকে ছুটে গেছে। দায়িত্বহীন সাহিত্য হৃদয়-মানসে বক্রতা এবং খোদাদ্রোহী দর্শন স্বভাব ও প্রকৃতিতে বিকৃতি সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং তাদের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, যেভাবে খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত বা ওলাওঠা মহামারী জাতীয় রোগে ভাল থেকে ভাল খাবারও রোগীর পেটে গিয়ে বিষ ক্রিয়া সৃষ্টি করে ঠিক তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও উন্নতি-অগ্রগতি যূরোপে স্বয়ং যূরোপের লোকদের জন্যেই কেবল নয়, মানব সভ্যতার জন্য বিপজ্জনক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মি. ইডেন ১৯৩৮ সালে প্রদত্ত তাঁর এক বক্তৃতায় কী চমৎকারই না বলেছিলেন ঃ

1. Guide to modern wickedness. p.

"যতদিন না কিছু করা হচ্ছে, এই পৃথিবীর অধিবাসীরা এই শতাব্দীর শেষভাগে আদিম গুহাবাসী ও বন্য লোকদের জীবনধারায় ফিরে যাবে। কী আশ্চর্যের ব্যাপার, পৃথিবীর তাবৎ রাষ্ট্র এমন একটি অস্ত্রের হাত থেকে বাঁচার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে যার ভয়ে সবাই ভীত, কিন্তু তা আয়ত্তে আনতে ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে কেউ রাজী নয়! কোন কোন সময় আমি বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবি, যদি অন্য কোন গ্রহ থেকে কোন ভ্রমণকারী পর্যটক আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহে নেমে আসে তাহলে আমাদের পৃথিবী দেখে কি বলবে? সে দেখবে, আমরা সকলে মিলে আমাদেরই ধ্বংসের উপকরণ তৈরি করছি, এমন কি আমরা একে অপরকে তার ব্যবহার পদ্ধতিও বাৎলে দিচ্ছি।"

যে সময় মি. এন্থনী ইডেন একথা বলেছিলেন তখন তাঁর কল্পনায়ও হয়তো আসে নি যে, এই যুদ্ধ চলাকালেই ধর্মের নিয়ন্ত্রণমুক্ত সভ্য মানুষ যাদের নেতৃত্বে কর্তৃত্বে রয়েছে বিশ্বশান্তির প্রবক্তা সভ্যতার ধ্বজাধারী ও নতুন বিশ্বের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— প্রযুক্তি ও শিল্পের ধ্বংসাত্মক প্রযুক্তি ও শিল্পের ধ্বংসাত্মক বিজ্ঞান ও মানুষের জীবন হরণকারী ক্ষমতা এই পর্যায়ে গিয়ে পৌছবে যে, স্বয়ং বিজ্ঞানীও তা কল্পনা করতে সক্ষম হবে না।

কয়েক বছরের অবিরাম চেষ্টা-সাধনা ও কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে শেষ পর্যন্ত আমেরিকা পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারে সক্ষম হয় যার ওপর এই যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করছিল এবং ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই তারিখে সাড়ে পাঁচটার সময় এর শক্তি ও সামর্থ্যের পরীক্ষা করা হয়।

মার্কিনীরা প্রথমে নিউমেক্সিকোর প্রান্তরে, তার পরে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকীর মানব সন্তানদের ওপর বর্ষণ করে এর কার্যকারিতার পরীক্ষা চালায়। পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হতেই হিরোশিমা শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। জীবন্ত কোন প্রাণীই অবশিষ্ট ছিল না আর না ছিল নিষ্প্রাণ কোন কিছু। চোখের পলকে মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, দালানকোঠা একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তীব্র বিস্ফোরণের ফলে বাতাসের চাপ বৃদ্ধি পায়। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর নিচে চাপা পড়ে গোটা শহর। সে এক অবর্ণনীয় কেয়ামতসদৃশ দৃশ্য! উৎক্ষিপ্ত ধূলি-বালির ঝলসানো কুণ্ডলীকৃত ও চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত মাইলের পর মাইল সুউচ্চ এক পাহাড় যেন আর এই পাহাড়ের নিচে জাহান্নামসদৃশ আগুনের কুণ্ডুলী যা মুহূর্তে সব কিছুকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। যেই বিমান থেকে এই বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেই বিমানের চালক বোমা নিক্ষেপের পর পরই দ্রুত নিজের নিরাপত্তার জন্য সেখান থেকে পালিয়ে যায়; নইলে সেও বাঁচতে পারত না, ধ্বংস হয়ে যেত। বিস্ফোরণ এত ভয়ংকর ও তীব্র ছিল যে, বোমা নিক্ষেপকারীদেরও হুশ-জ্ঞান ছিল



না। ভয়-ভীতি ও আতংকে তাদের অবস্থা হয়েছিল এমন যে, সকলের মুখ থেকে তখন 'ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী' অর্থাৎ 'হায় আল্লাহ! আমার কি হবে' আওয়াজ বের হচ্ছিল। কিন্তু তারা যখন তাদের ঘাঁটিতে ফিরে যায় তখন মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে আনন্দ ও খুশীর বন্যা বয়ে যায় এবং এসব দেশে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় এবং বাহ্‌বা দেয়া হয়।"[১]

স্টুয়ার্ট গিল্ডার (Stuart Guilder) তাঁর এক নিবন্ধে এটম তথা পারমাণবিক বোমার বিপজ্জনক ও ধ্বংসকারী ক্ষমতা সম্পর্কে অভিমত দিতে গিয়ে লিখছেন ঃ

"যদিও সমগ্র ব্যাপারটির খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত জানাশোনা ছিল না, কিন্তু মোটের ওপর পারমাণবিক বোমার উদ্ভাবনকারী বিজ্ঞানীরা এতটুকু অবশ্যই জানতেন, তারা যেই সমরাস্ত্র ব্যবহার করতে যাচ্ছেন তার পরবর্তী পরিণতি হবে, মানুষ ধ্বংস হবার হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। এর পরবর্তী পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে যদি বিস্তারিত জানতে হয় তাহলে হিরোশিমা শহরের সেসব বিপোর্ট যা বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্টাররা লিখেছিলেন তা দেখতে হবে। রিপোর্টাররা তাদের Atomic plague তথা "পারমাণবিক বোমার মহামারী" শীর্ষক রিপোর্টে লিখেছেন ঃ

"অনেক লোকই যারা বাহ্যত বোমা বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি কিংবা এর আগুনে ও তাপে মারা যায় নি বা অব্যাহতভাবে মরছে না বটে, তবে তাদের এই মৃত্যুর কারণ হল, তাদের রক্ত জীর্ণ ও মিশ্রিত হয়ে যায়। প্রথম প্রথম তাদের রক্তের শ্বেতকণিকা ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর পালা আসে লোহিত কণিকার। তাদের চুল ঝরে যায়। এরপর তারা যতদিন বাঁচে তাদের শরীরের হাত-পা শুকিয়ে যেতে থাকে। এরপর একদিন সে মারা যায়। এর কারণ হিসেবে জানা যায়, পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে বাতাসে কিছুটা তেজস্ক্রিয়া থেকে যায় এবং মানুষের চামড়া তা টেনে নেয় কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সেগুলো ফুসফুসে গিয়ে পৌঁছে।"

এই গ্রন্থ উদ্ধৃত করবার পর এই নিবন্ধকার স্টুয়ার্ট গিল্ডারই লিখছেন ঃ

"এই খবর সমগ্র বিশ্বকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য যথেষ্ট। বিশ্ব আজও এই ভয়াবহ বোমা সম্পর্কে জানত না এবং বোমার তেজস্ক্রিয়াধারী ধাতব পদার্থ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তিরিশ বছর আগে থেকেই

১. হিরোশিমার মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি ১৯৪৯ সালের ২০শে আগস্ট তারিখের ঘোষণায় বলেন যে, ৪৫ সালের ৬ই আগস্ট তারিখে যারা মারা গিয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ১০ থেকে ৪০ হাজারের মধ্যে।

জানত, এটা এমন এক অস্ত্র হবে যার প্রতিষেধক কোথাও নেই এবং এটা সমগ্র মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হতে পারে।

"জানা গেছে, জাপানীরা এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঘরে তৈরী নেকাব ব্যবহার করে। সম্ভবত এগুলো সেই নেকাব যেগুলো জাপানের লোকেরা ভীষণ ঠাণ্ডা ও তীব্র শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহার করত। কিন্তু এটা এতটাই অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে যতটা আবিসিনিয়ার সৈনিকদের সেই সব কাপড় ব্যর্থ ও নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে যা তারা মুসোলিনীর বোমারু বিমান থেকে তাদের ওপর বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপের সময় তাদের নাকের চারপাশে জড়িয়ে নিত।

"পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের কাজে যে সব বৈমানিক শরীক ছিল তাদের বক্তব্য এই যে, বোমা নিক্ষেপের পর ধোঁয়া ও ধুলোর মেঘ ন'মাইল পর্যন্ত বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। অধ্যাপক প্লেচ (Plesch)-এর অভিমত হলো, যে জায়গায় বোমা বিস্ফোরিত হয় তার আশেপাশে শত মাইল এলাকার লোকজনের বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার এবং তাদের শারীরিক ও দৈহিক অবস্থা খুব গভীরভাবে খুঁটিয়ে দেখা উচিত যে, তাদের ওপর এর কোনরকম আছর তো পড়ল না!

"এটা আদৌ অসম্ভব নয়, পৃথিবী একদিন সকালে উঠে পত্রিকার পাতায় এই খবর পড়বে, সে সব লোক যারা জাপান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বাস করত তাদের ভেতর সেই সব আলামত ছড়িয়ে পড়েছে যা পারমাণবিক বোমার মহামারীতে দেখা যায়। যদি ছোট্ট একটি পারমাণবিক বোমা নয় মাইল পর্যন্ত বাতাসকে ধূলো ও ধূয়া দ্বারা দূষিত ও বিষাক্ত করে তুলতে পারে তাহলে এটা উপলব্ধি করা অত্যন্ত সঙ্গত হবে, এর থেকে বৃহদাকারের একটি বোমা এর চাইতে কয়েক গুণ বেশি বিস্তৃত জায়গা প্রভাবিত করবে।"[1]

1. The Statesman, September, 16,1945.

ষষ্ঠ অধ্যায়

## পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব থাকাকালে পৃথিবীর পারিভাষিক ক্ষয়ক্ষতি

এখানে প্রাচ্যের এশীয় জাতিগোষ্ঠীগুলোর বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব না। পশ্চিমাদের বিজয় অভিযান চলাকালে প্রাচ্যের জাতিগোষ্ঠীগুলোকে কত বড় বড় ও বিশাল দেশ হারাতে হয়েছে এবং পশ্চিমা শক্তি কিংবা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার মুকাবিলায় পিছপা হতে হয়েছে, এ বিতর্কও এ মুহূর্তে আমাদের আলোচ্য নয় এবং এর বিস্তারিত বর্ণনার এখানে স্থান সংকুলান হবে না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অনেক লোক ও ঐতিহাসিক এ নিয়ে স্বল্প পরিসরে মধ্যম আকারে ও বড় রকমের প্রচুর পুস্তক রচনা করেছেন। আমরা এক্ষণে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবেই নয়, বরং ইশারা-ইঙ্গিতে এটা দেখাতে চাই, পাশ্চাত্যের ক্ষমতার এই প্লাবনে যা বিশ্বের তামাম ভূভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে পর্বতশৃঙ্গ, গভীর উপত্যকা, স্বাধীন জাতিগোষ্ঠীর মানস জগত, এমন কি জলবায়ু পর্যন্ত কিছুই নিরাপদ থাকতে পারেনি—পৃথিবীকে এর ফলে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ, মৌলিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি বরদাশ্ত করতে হয়েছে। এই বিশ্বজয়ী ও সর্বগ্রাসী বিপ্লবে সব চাইতে বড় ক্ষতি বরদাশ্ত করতে হয়েছে মুসলমানদেরকেই। কেননা জাহিলিয়াতের অনেক বৈপরীত্য ও মতভেদ এই জীবন ব্যবস্থার সঙ্গেই। তাই জাহিলিয়াতের বিজয় অর্জন ও প্রাধান্য বিস্তারে তাকেই সর্বাধিক ক্ষতি সইতে হবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। কেননা ইসলাম ও জাহেলিয়াত হচ্ছে পাল্লার দুই প্রান্তের মত। এক পাল্লা যখন ভারী হয়ে উঠবে, তখন তার অপর প্রান্ত হাল্কা হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

### ধর্মীয় অনুভূতির অভাব

এই দুনিয়ার পরিণতি কি? এই জীবন গত হয়ে যাওয়ার পর কি আর কোন জীবন আছে? থাকলে তা কী ধরনের এবং তার প্রকৃতিই বা কেমন ? এবং তার জন্য এই জীবনে কি কোন হেদায়েত বা দিক-নির্দেশনা আছে এবং তা কোথা থেকে জানা যাবে ? এই যে পরবর্তী জীবন সেই জীবনকে আরামপ্রদ ও শান্তিদায়ক বানাবার জন্য কী মূলনীতি ও শিক্ষামালা রয়েছে এবং তার উৎসই বা কী? মানবাত্মাকে চিরস্থায়ী আরাম, সুখ ও হৃদয়-মনকে স্থায়ী ও চিরন্তন শান্তি দেবার পথ কি এবং তা কোথা থেকে জানা যেতে পারে?

এগুলোই সে সব প্রশ্ন যেগুলো প্রাচ্য ভূখণ্ডের মানুষকে শত শত নয়– হাজার হাজার বছর ধরে অস্থির করে রেখেছে, করে রেখেছে প্রশ্নের সম্মুখীন এবং যা তার অত্যন্ত বস্তুগত নিমজ্জমানতা ও আত্মবিস্মৃতির মাঝেও তার দিলের গভীরে থেকে বারবার ঠেলে ওঠে এবং উত্তর চেয়েছে। প্রাচ্য তার কোন যুগেই এই স্বাভাবিক প্রশ্নকে এড়িয়ে যায়নি। দিলের গভীর প্রদেশ থেকে নির্গত এই আওয়াজ সে শুনেছে, উপেক্ষা করেনি, বরং আপন জীবনের সর্বপ্রকার ব্যস্ততা ও মস্তিষ্কের যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও অনুসন্ধানের মধ্যে একে প্রথম স্থান দিয়েছে। সে তার সভ্যতার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে বরাবর এসব প্রশ্নের সমাধান করতে এবং এর সন্তোষজনক জওয়াব খুঁজে পেতে দ্যোদুল্যমানতার মাঝে ঝুলতে থাকে। অতিপ্রাকৃতিক দর্শন, ইলমে কালাম, তাসাওউফ, প্রাচ্য দর্শন, রিয়াযত ও মুজাহাদা (আধ্যাত্মিক সাধনা), জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অপরাপর প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল এ সবের সমাধানের লক্ষ্যেই পরিচালিত বিভিন্ন প্রয়াস। এজন্য সে ভুল পথও এখতিয়ার করেছে এবং ভুল উপায়-উপকরণও কাজে লাগিয়েছে। এক্ষেত্রে সে সফল হওয়ার চেয়ে ব্যর্থই হয়েছে বেশি। কিন্তু এ দিয়ে এই ঘটনার ওপর এ প্রভাব পড়ে না যে, প্রাচ্যের লোকদের জীবনে এই প্রশ্ন সব সময় বর্তমান থেকেছে এবং এটাই প্রথম গুরুত্ব লাভ করেছে।

এক্ষেত্রে যদি আমরা দর্শনের ভাষাই ব্যবহার করি তাহলে আমরা বলব, প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ছাড়াও আরও একটি ইন্দ্রিয় আছে যাকে আমরা ধর্মীয় ইন্দ্রিয় বলতে পারি। যে রকম অন্যান্য ইন্দ্রিয় যার যার কাজ করে এবং সে সবের মাধ্যমে অনুভব ও উপলব্ধি করে, ঠিক তেমনি এই ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ ধর্মীয় ইন্দ্রিয়েরও কিছু কিছু অনুভূত ও উপলব্ধ বিষয় আছে যা প্রাচ্য জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান ও অনুষঙ্গ হিসাবে বর্তমান।

এতে সন্দেহ নেই, য়ূরোপীয় রেনেসাঁর প্রাথমিক যুগে এসব প্রশ্ন রীতিমত বিদ্যমান ছিল এবং জ্ঞানী-গুণী ও চিন্তাশীল মহল দীর্ঘকাল ধরে এর ওপর নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জীবন-দর্শনের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যুগের সাথে সাথে যে পরিমাণ প্রকাশিত ও উত্থিত হতে থাকে এবং জীবনে পাশ্চাত্যের যে পরিমাণ চিন্তা-ভাবনা ও লিপ্ততা বেড়েছে সেই পরিমাণ ঐ সব প্রশ্নের গুরুত্বও কমে গেছে এবং তা বাস্তব জীবনে পেছনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অতি প্রাকৃতিক দর্শনের ব্যাপারে তাত্ত্বিক ও শিক্ষিত মহলে এখনও এসবের ওপর মতামত প্রকাশিত হয়ে থাকবে। কিন্তু জীবন থেকে এসব প্রশ্ন একেবারেই বেরিয়ে গেছে এবং তার সামনে থেকে জিজ্ঞাসার চিহ্ন মুছে



গেছে। এ সম্পর্কে সেই সব খটকা, ক্লেশ, যাতনা এবং সেসব জিজ্ঞেসপ্রবণতা যা হাজার হাজার বছর প্রাচ্যবাসীদেরকে মশগুল রেখেছে এবং এটা কোন ঈমান বা বিশ্বাস, খোলা মন ও প্রশান্ত হৃদয়ের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং এজন্য যে, তা পাশ্চাত্যের লোকদের জীবনে বহুকাল থেকে আপন গুরুত্ব খুইয়ে ফেলেছে এবং অপরাপর ব্যস্ততা ও সমস্যা-সংকটের জায়গা দিয়ে রেখেছে। এ যুগের ব্যস্ত মানুষ ঐসব সমস্যা-সংকটের সঙ্গে পরিপূর্ণ সম্পর্ক ছেদ করেছে এবং নিজেদেরকে এর থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। এসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবে এমন সময় ও অবকাশ তাদের আদৌ নেই। তাদের পক্ষ থেকে এসব প্রশ্নের উত্তরের কোন একটি দিক নিয়ে ভাববার কিংবা আকর্ষণ বোধ করার কিছু নেই। আর তা এজন্য যে, তাদের কাছে একমাত্র গুরত্বপূর্ণ হলো তাদের বর্তমান জীবন, চলমান জীবন এবং তাদের একমাত্র কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত হলো এই জীবন সম্পর্কিত বিস্তারিত দিক ও পথ-নির্দেশনা, আর কিছু নয়।

প্রাচীন প্রাচ্য ও আধুনিক পাশ্চাত্যের মধ্যে এ এক বিরাট মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য– প্রাচ্য ধর্মীয় বোধ ও অনুভূতির ধারক আর পাশ্চাত্য তার সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে সাথে ধর্মীয় বোধ ও অনুভূতি খুইয়ে বসেছে এবং যখন কোন লোকের কোন ইন্দ্রিয় নষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তখন তার সমগ্র বোধ ও অনুভূতি যা কেবল উক্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত তা বেকার হয়ে যায়, থাকা না থাকা সমান হয়ে যায়। যে ব্যক্তি শ্রবণ শক্তি থেকে বঞ্চিত তার জন্য শব্দের জগত থাকা না থাকা সমান এবং কথা বলার এই বিশাল জগত তার কাছে নীরব কবরস্থান মনে হবে। দৃষ্টিশক্তিহীনের কাছে বর্ণ-বৈচিত্র্যে ভরপুর এই জগত অর্থহীন, রঙের পার্থক্য তার কাছে কোন অর্থই বহন করে না। ঠিক তেমনি যিনি ধর্মীয় বোধরহিত –তার সেসব অনুভূতি, চেতনা, প্রভাব-প্রতিক্রিয়াও নিষ্ফল মনে হবে যা কেবল ধর্মীয় অনুভূতি ও বোধেরই পরিণতি হিসাবে দেখা দেয়। তার কাছে পারলৌকিক জীবন, পরকালীন শাস্তি, পুণ্য, জান্নাত, জাহান্নাম, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি, তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি ও সংযম, পবিত্রতা, চিরস্থায়ী মুক্তি, ধ্বংস ইত্যাদি সবই অর্থহীন শব্দ বলেই মনে হবে। তার কাছে এমন কোন আহ্বানের মধ্যে আদৌ কোন আকর্ষণ ও দিলের টান থাকবে না যার সম্পর্ক তার অনুভূত বিষয়াদি, নগদ লাভ ও স্ফূর্তি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।

দীনের দাওয়াত প্রদানকারীদেরকে প্রতিটি যুগে ও আম্বিয়ায়ে কিরাম আলায়হিমু'স-সালাত ওয়াস-সালামকে স্ব স্ব দাওয়াতী যুগে যে সব লোকের বেলায় সব চাইতে বেশি কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং যে সব লোকের ক্ষেত্রে তাঁদের বিপ্লবাত্মক দাওয়াত, পাহাড় বিচূর্ণকারী ও লৌহ প্রাকারকে মোমের মত

দ্রবীভূতকারী ব্যথা-ভরা ওয়াজ আদৌ কোন ক্রিয়া সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা ছিল সেই সব লোক যারা ধর্মীয় বোধ ও অনুভূতি থেকে মাহরূম হয়ে গিয়েছিল এবং যাদের দিলের অঙ্গারধানিকা এমনভাবেই ঠাণ্ডা ও শীতল হয়ে গিয়েছিল যে, কোনভাবেই আর তাতে উত্তাপ সঞ্চারের সম্ভাবনা ছিল না। যারা ধর্ম ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল, তারা এ সম্পর্কিত কোন কথা শুনবে না, এ নিয়ে ভাববে না, যারা তাদের যুগের দাঈ ও মুবাল্লিগদের পাথরকে মোমের মত গলিয়ে দেবার মত ওয়ায-নসীহত শুনে অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেছিল ঃ

اِنْ هِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ -

"আমরা তো কেবল পার্থিব জীবনকেই স্বীকার করি। বাঁচা ও মরা ছাড়া আর আছেটাই বা কী? মরার পর আর কেই বা জীবিত হবে" (সূরা মু'মিনূন, ৩৮) অথবা যাদের দৃষ্টি বস্তুগত সমতল থেকে হাকীকত পর্যন্ত তথা অন্তর্গত সত্য পর্যন্ত পৌঁছুবার যোগ্য নয় এবং যারা পয়গম্বরের সর্বসাধারণের পক্ষে বোধগম্য বক্তৃতা শোনার পর যা তাদেরই ভাষায় করা হয়েছিল, অত্যন্ত সাদামাটা ও সরলভাবে বলেছিল,- مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا - "তোমার অনেক কথাই আমাদের বোধগম্য নয় আর আমরা তো তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল ও শক্তিহীন দেখতে পাচ্ছি" (সূরা হূদ, ৯১)।

পাশ্চাত্য সভ্যতার এই উত্থানের যুগে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাট সংখ্যায় এমন একটি শ্রেণী জন্মে যায় যাদের পার্থিব কর্মব্যস্ততা ও মগ্নতা কিংবা দুনিয়ার ভোগের মোহ তাদের জীবনে ধর্মের জন্য এতটুকু জায়গা অবশিষ্ট রাখেনি। অনেক অনুসন্ধান চালাবার পরও যারা ধর্মের দাওয়াত দেন সেই সব দাঈ ও মুবাল্লিগদের জন্য তাদের মন ও মস্তিষ্কে এতটুকু জায়গাও মেলেনি যা দিয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক আহ্বান তাদের ভেতর পৌঁছানো যায়। যেমন কোন লোকের যদি গান শোনার মত কান এবং কাব্যের জন্য সূক্ষ্ম রুচিবোধ না থাকে তাহলে তার জন্য গানের সর্ববিধ কলা-কৌশল ও পৃথিবীব্যাপী চিত্ত-চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী কাব্যও বেকার ও নিষ্ফল প্রমাণিত হবে। ঠিক তেমনি যে ধর্মীয় অনুভূতি ও চেতনা হারিয়ে ফেলেছে তার জন্য নবী-রসূলগণের গোটা দাওয়াত এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের যাবতীয় ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপমা উৎপ্রেক্ষা ও গল্পকাহিনী সবই নিষ্ফল হবে। এটা মানুষের হৃদয়ভূমির সব চাইতে অনুর্বর অংশ যা কোন বারি বর্ষণই আর সবুজ-শ্যামল করতে পারে না।

یہاں آکے رو دیتا ہے ابر نیساں



"এখানে এসেই বসন্তকালীন বৃষ্টিপাতও কেঁদে ফেলে।" যে সমস্ত লোকের এই শ্রেণীকে সম্বোধন করার, এদের লক্ষ্য করে কিছু বলার এবং এদেরকে ধর্ম ও নৈতিকতার দিকে আহ্বান জানাবার সুযোগ ঘটে তারা কুরআন মজীদের বহু আয়াতের অর্থ বুঝতে পেরে থাকবেন এবং সেই সমস্ত কালামশাস্ত্রীয় সমস্যা ও সংকটের যা কর্মময় জীবন ও দাওয়াতের ময়দান থেকে আলাদা হয়ে বসে خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ "আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কানে মোহর করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের ওপর রয়েছে আবরণ" এবং এ জাতীয় সমর্থবোধক আয়াত সম্পর্কে সম্মুখীন হন– সমাধান আপনাআপনিই হয়ে গিয়ে থাকবে এবং এই কুরআনী হাকীকত মূর্তিমান দৃষ্টিগোচর হবে ঃ

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لاَيَسْمَعُ اِلاَّ دُعَاءً وَّنِدَاءً ط صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ -

"যারা কুফ্‌রী করে, সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদের উপমা যেমন কোন লোক এমন কিছুকে ডাকে যা হাক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না। বধির, মূক (বোবা), অন্ধ; সুতরাং তারা বুঝবে না" (সূরা বাকারা, ১৭১)।

এই যমানার আসল রোগ হলো দীন-ধর্ম সম্পর্কে অনুভূতিহীনতা, এর প্রতি অনাগ্রহ এবং ধর্মীয় জিজ্ঞাসা সম্পর্কে পরিপূর্ণ সম্পর্কশূন্যতা ও মুখাপেক্ষীহীনতা যার চিকিৎসা সব চাইতে বেশি কঠিন এবং যার বর্তমানে কোন ধর্মীয় দাওয়াতই কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে না। ধর্ম ও নীতি-নৈতিকতার দাওয়াতকে অনাচার ও পাপাচার, অবাধ্যতা ও অলসতার অন্ধকার যুগ এবং অস্বীকার ও বিরোধিতার সর্বাধিক গোলযোগপূর্ণ আমলেও সেই সব জটিলতা ও কাঠিন্য দেখা দেয়নি যা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ও মুখাপেক্ষীহীনতার এই নীরব ও শান্তিপূর্ণ যুগে সামনে এসে দেখা দিচ্ছে। যেখানে আদৌ পিপাসাই নেই, যেখানে পানির চাহিদাই নেই সেখানে পানির সযত্ন ব্যবস্থাপনা ও খিযর-এর পথ-প্রদর্শনের প্রয়োজন কোথায়?

اِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلاَتُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ -

"মৃতকে তো তুমি কথা শোনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না আহ্বান শোনাতে, যখন ওরা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।" (সূরা নাম্‌ল, ৮০)

পাশ্চাত্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিভাগের একজন অধ্যাপক এই মৌলিক সত্য পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরেছেন এবং এই পার্থক্যের সঠিক কারণ নির্ণয় করেছেন যা প্রাচীন ও আধুনিক মনস্তত্ত্বে পাওয়া যায়। তিনি একটি মাত্র বাক্যে একটি সমগ্র গ্রন্থের বিষয়বস্তু ধারণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"ধর্মীয় প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা প্রথমে দেখা দিত। সম্ভবত এর সন্তোষজনক জবাব মিলত না। কিন্তু এ যুগের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, আজ আর এসব প্রশ্ন আদৌ দেখাই দেয় না।"

### আল্লাহ-অনুসন্ধানী মানসিকতার বিশ্বব্যাপী অভাব

ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সরকারের বিশ্বব্যাপী প্রভাবের আলোচনায় আমরা বলে এসেছি যে, এর প্রভাবে গোটা বিশ্বে (যা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভাবাধীন ছিল) আল্লাহ-অনুসন্ধানী মানসিকতা ব্যাপকভাবে পাওয়া যেত। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ দীন-ধর্মের খোঁজে ও আল্লাহওয়ালা মানুষের তালাশ করতে গিয়ে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পৌছে যেত। দুনিয়াদারী ও বস্তুবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে যাবার পর ধর্মীয় প্রবণতা ও আল্লাহ-অনুসন্ধানী মানসিকতার কেন্দ্র ঐ সব মহাপুরুষের সত্তা ও তাঁদের আবাসিক স্থানগুলো ছিল যাঁরা অলসতা ও বস্তুবাদের বিশাল বিস্তৃত সমুদ্রে মনুষ্য জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ-উপদ্বীপ কায়েম করে রেখেছিলেন যেখানে তাঁরা মানুষকে বস্তুবাদের এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে বের করে এনে তাদেরকে ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দিতেন এবং তাদের ভেতর প্রলয়-তুফানের মুকাবিলা করার যোগ্যতা, সামর্থ্য ও শক্তি পয়দা করতেন। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তাঁদেরকে সূফী-দরবেশ ও ওলী-আওলিয়া নামে স্মরণ করা হয়েছে।

ঐসব মহামানব ও মহাপুরুষের দিকে প্রত্যাবর্তন এই শেষ শতাব্দীগুলোতে ধর্মের দিকে ঝোঁক, প্রবণতা ও সাধারণ মুসলমানদের আল্লাহ-অনুসন্ধানী মানসিকতার একটা সীমা পর্যন্ত মাপকাঠি যার সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে, লোকের মধ্যে সেই যুগে বস্তুবাদ ও দুনিয়াদারী থেকে কতটা পরিমাণ পলায়ন এবং ধর্মের ব্যাপারে কতখানি আগ্রহ পাওয়া যেত।

মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান ও কেন্দ্রীয় শহরের প্রায় সর্বত্রই এমন সব ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন যাঁদের বরকতময় সত্তা ছিল অন্ধকার সমুদ্রে আলোক মিনার (বাতিঘর)। মানুষ পতঙ্গের ন্যায় এই আলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। পৃথিবীর দূর-দূরান্তের এলাকাসমূহ থেকে আল্লাহপ্রার্থী মানুষ এসে তাঁদের দরবারে সমবেত হতো আর এসব স্থান হতো এক বিরাট আন্তর্জাতিক জনবসতি যেখানে একই সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উত্তর ও দক্ষিণের মুসলমানের সাক্ষাত মিলত এবং ইসলামের বিশাল বিস্তৃত জগত সেখানে জড়ো অবস্থায় দেখতে পাওয়া যেত।



মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্তে অবস্থিত আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশ ধর্মীয় আবেগ-উৎসাহ ও আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং আল্লাহসন্ধানী মানুষের এক বিরাট কেন্দ্র। এখানে প্রতিটি যুগে মুসলিম সুলতান ও রাজা-বাদশাহদের সাম্রাজ্যের পাশাপাশি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক রাজত্বের স্বাধীন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল যেখানে শত শত নয়, হাজার হাজার মানুষ আপন যুগের সর্বপ্রকার বস্তুগত প্ররোচনা ও আকর্ষণ থেকে মুক্ত থেকে এবং হুকুমত ও সিয়াসত তথা সরকার ও রাজনীতির বিবিধ বিপ্লব উপেক্ষা করে নিজেদের কাজ করতেন।

হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-র আধ্যাত্মিক নয়া উপনিবেশ গিয়াছপুর ছিল এর একটি সর্বোত্তম উদাহরণ যিনি ঠিক রাজধানীতে আট জন প্রতাপশালী সুলতানের (গিয়াছুদ্দীন বলবন, ৬৬৪-৬৮৬ খ্রি. থেকে নিয়ে গিয়াছুদ্দীন তুগলক, ৭২০-২৫ খ্রি. পর্যন্ত) শাসনামলে প্রায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তাঁর স্বশাসিত ও স্বনিয়ন্ত্রিত হুকুমত কায়েম রেখেছেন [১] এবং যেখানে সিজিস্তান[২] থেকে শুরু করে অযোধ্যা[৩] পর্যন্ত সব জায়গার আল্লাহ-সন্ধানী মানুষ পড়ে থাকত। যদি তরীকতের সমস্ত সিলসিলার বুযুর্গদের কেন্দ্রগুলোর জনসংখ্যা এবং তাঁদের দিকে যেই পরিমাণ লোক গমনাগমন করত তার বিস্তৃত বিবরণ লেখা হয় (যদ্দ্বারা সেই যুগে ধর্মের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও ঝোঁক এবং ধর্মের প্রতি মানুষের সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের পরিমাপ করা যায়), তাহলে পুস্তকের পৃষ্ঠায় তা সংকুলান হবে না। এজন্য নমুনাস্বরূপ কেবল একটি সিলসিলার (নকশ্‌বান্দিয়া-মুজাদ্দিদিয়া সিলসিলা) কয়েকজন বুযুর্গের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক এবং তাঁদের দিকে সেই যুগের ধাবমান জনস্রোতের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো যা দিয়ে পরিমাপ করা যাবে, তাঁদের যুগে যে যুগ ছিল বস্তুবাদ ও দুনিয়াদারীর উত্থানের যুগ, আল্লাহ-সন্ধানী মানসিকতার অবস্থা কি ছিল এবং ধর্মের প্রতি আকর্ষণ মানুষকে কোথায় কোথায় চুম্বকের ন্যায় টেনে আনত।

হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফেছানী (মৃ. ১০৩৪ হি.)-র সঙ্গে সম্পর্কিত ভক্ত-অনুরক্তদের তালিকার ওপর যদি দৃষ্টি ক্ষেপণ করা হয় তাহলে আপনি জানতে পারতেন, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানের কত শত শহর ও পল্লীর কী বিপুল সংখ্যক মানুষ এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলের কত বড়

---

১. হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) গিয়াছুদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে ৬৬৯ হিজরী দিল্লী আগমন করেন। কিছুদিন তিনি বিভিন্ন মহল্লায় অবস্থান করেন। এরপর বস্তি গিয়াছ পুরে (বর্তমানে বস্তি নিজামুদ্দীন) স্থায়ী আবাস গ্রহণ করেন। ৭২৫ হিজরী পর্যন্ত বিভিন্ন সুলতান তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কেউ সফল হন নি। প্রায় ৬০ বছর কাল তিনি ও তাঁর খানকাহর লোকেরা রাজদরবারের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেন। ২. শায়খ হাসান আলা সিজযী। ৩. শায়খ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিল্লী।

বড় আমীর-অমাত্য তাঁর মুরীদ ও বায়আতভুক্ত ছিলেন এবং কত দূর-দূরান্ত থেকে সরহিন্দে এসে মানুষ তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছিল।

তাঁর জলীলুল কদর খলীফা হযরত সাইয়েদ আদম বান্নুরী (মৃ. ১০৫২ হি.)-র খানকায় প্রত্যহ এক হাজার লোক উপস্থিত থাকত এবং দু'বেলা পেট পুরে খানা খেত। তাঁর সওয়ারীর সাথে হাজার হাজার মানুষ ও শত শত আলিম-উলামা থাকত। "তাযকিরায়ে আদমিয়া" নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, ১০৫২ হিজরীতে তিনি যখন লাহোরে যান তখন নেতৃস্থানীয় সাইয়েদ, ওলী-বুযুর্গ ও বিভিন্ন শ্রেণীর দশ হাজার মানুষ তাঁর সঙ্গী ছিল। প্রার্থীদের ভিড় এত বেশি থাকত যে, সম্রাট শাহজাহান এতে ভড়কে যান। তিনি কিছু টাকা পাঠিয়ে পেছনে বলে পাঠান, তাঁর ওপর হজ্জ ফরয হয়ে গেছে, তিনি যেন হারামায়ন শরীফায়ন গমন করেন। অনন্তর তিনি ভারতবর্ষ থেকে হিজরত করে চলে যান।

মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র নামকরা খলীফা ও তাঁর পুত্র হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'সূম (মৃ. ১০৭৯ হি.)-এর হাতে নয় লক্ষ মানুষ বায়আত হয় এবং তওবা করে। সাত হাজার মানুষ তাঁর খেলাফত লাভে ধন্য হয়।[১]

তাঁর পুত্র খাজা শায়খ সায়ফুদ্দীন সরহিন্দী (র) [মৃ. ১০৯৬ হি.]-র দিল্লীস্থ খানকায় প্রার্থীদের ভীড়ের পরিমাপ আপনি এখেকে করতে পারবেন যে, "যায়লুর-রাশহাত" নামক গ্রন্থের গ্রন্থকারের বর্ণনা মুতাবিক এক হাজার চার শ' মানুষ দু'বেলা তাঁর দস্তরখানে আপন পসন্দ ও ফরমায়েশ মাফিক খানা খেত।[২]

আমীর-উমারা ও বিত্তবান লোকদের বুযুর্গানে দীনের সঙ্গে (ধর্মের প্রতি ভালবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের দরুন) যে সম্পর্ক ছিল তার একটি নমুনা ছিল এই, হযরত খাজা মুহাম্মদ যুবায়র সরহিন্দী (র) [মৃ. ১১৫১ হি.] যখন মসজিদে যাবার উদ্দেশে ঘর থেকে বের হতেন তখন আমীর-উমারা রাস্তায় দোশালা ও রুমাল বিছিয়ে দিতেন যাতে তাঁর পা মাটিতে না পড়ে। কোন রোগীর সেবা-শুশ্রূষা কিংবা অন্য কোন কাজে কোথাও যেতে হলে তাঁর সওয়ারী রাজকীয় কায়দায় বের হতো এবং তাঁর মিছিলে আমীর-উমারা ও বিত্তবান লোকদের পালকি ও সওয়ারী থাকত।[৩]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক আমলে বিপ্লবী হুকুমতের কিছু কাল আগ পর্যন্ত এই মানসিকতা ও রুচি পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। মির্যা মাজহার জানে জানাঁর খলীফা হযরত শাহ গোলাম আলী (র) [মৃ. ১২৪০ হি.]-র যুগে দিল্লীর

১. নুরহাতুল খাওয়াতির, ৫ম খণ্ড; ২. প্রাগুপ্ত; ৩. দুররুল মাআরিফ, ইরশাদ রহমানিকৃত নু, খা।



মুজাদ্দিদিয়া খানকাহ সত্যানুসন্ধানীদের বিরাট বড় কেন্দ্র ছিল। স্যার সৈয়দ আহমদ খান তদীয় "আছারুস-সানাদীদ" নামক গ্রন্থে লিখছেন :

"আমি হযরতের খানকায় নিজের চোখে রোম (তুরস্ক), শাম (সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ফিলিস্তীন যার অন্তর্গত ছিল), বাগদাদ, মিসর, চীন ও আবিসিনিয়ার লোক দেখেছি। তারা দরবারে হাযির হয়ে বায়আত গ্রহণ করত এবং খানকাহর খেদমত করাকে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য জ্ঞান করত। আর ভারতবর্ষ, পাঞ্জাব ও আফগানিস্তানের মত কাছাকাছি জনপদগুলোর তো কোন কথাই নেই! এসব শহরের লোকেরা পতঙ্গের মত দলে দলে এসে হাযির হতো। হযরতের খানকায় পাঁচ শ' ফকীর-মিসকীনের কম থাকত না এবং এদের অন্নবস্ত্রের দায়-দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত ছিল।"[১]

শাহ রঊফ আহমদ মুজাদ্দিদী তাঁর "দুররুল মা'আরিফ" নামক গ্রন্থে কেবল একদিনের আগত লোকদের স্থান ও শহরগুলোর তালিকা লিখেছেন যারা ২৮শে জুমাদাল-উলা, ১২৩১ হিজরীতে আত্মিক উপকার লাভের আশায় দিল্লীর এই খানকাহ্ উপস্থিত ছিল।

"সমরকন্দ, বুখারা, গযনী, তাশকন্দ, হিসার, কান্দাহার, কাবুল, পেশাওয়ার, কাশ্মীর, মুলতান, লাহোর, সরহিন্দ, আমরোহা, সম্ভল, রামপুর, বেরেলী, লাখনৌ, জায়স, বাহরাইচ, গোরখপুর, আজীমাবাদ, ঢাকা, পুনা, হায়দরাবাদ ইত্যাদি।"[২]

এটা ছিল সেই যুগ যখন রেল ছিল না, ছিল না যাতায়াতের সে সব সুবিধা যা আমরা আজ লাভ করেছি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেই যুগে ব্রিটিশ শাসন জেঁকে বসার কিছুটা আগে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও তাঁর জলীলুল কদর সাথী মাওলানা আবদুল হাই বুরহানভী (মৃ. ১২৪২ হি.), মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (শাহাদত ১২৪৬ হি.) এবং তাঁদের একনিষ্ঠ মুবাল্লিগবৃন্দ মুসলমানদেরকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান, ففروا الى الله "আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও"র আওয়াজ তোলেন এবং অলসতা, গাফিলতি, অবাধ্যতা ও শরীয়তবিরোধী জীবনের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন। মুসলমানেরা যেই আগ্রহ-উদ্দীপনার সঙ্গে এই আহ্বানে সাড়া দেয় এবং যে রকম পতঙ্গের মত এই জামাআতের আমীরের চারপাশে সমবেত হয়, যেই উন্নত মন ও উদার মানসিকতা নিয়ে প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল এবং নিজেদের ধর্মপ্রেম ও বিনয়ের প্রমাণ দিয়েছিল, এরপর যেভাবে

১. আছারুস-সানাদীদ, ৪র্থ অধ্যায়; ২. দুরুল মা'আরিফ, ১০৬ পৃ.।

ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামের সকল বাগ-বাগিচার সর্বোত্তম ফুলের নির্যাস তাঁর সমীপে এসে পৌঁছে গিয়েছিল যা ১২৪৬ হিজরীর ঘটনায় বালাকোটের মাটিতে মিশে গিয়েছিল—এ থেকে বেশ ভালভাবেই পরিমাপ করা যায় যে, সেই অধঃপতনের যুগেও মুসলমানদের মধ্যে দীনের প্রতি, ধর্মের প্রতি কতটা আগ্রহ, দিলের টান ও আল্লাহকে পাবার জন্য কতখানি পাগলপারা নেশা, কী পরিমাণ মন-মানসিকতা এবং কতটা ভাল যোগ্যতা ও সামর্থ্য ছিল।

ধর্মের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহের পরিমাপ আপনি সেই তাবলীগী সফরের রোয়েদাদ থেকে করতে পারবেন যা সাইয়েদ সাহেব বড় বড় জামাআতসহ দোআবার কসবা ও শহরগুলোতে এবং এর পরে অযোধ্যায় করেছিলেন।[১]

মুসলমানদের আগ্রহ-উদ্দীপনার আরও কিছুটা পরিমাপ আপনি সাইয়েদ সাহেবের হজ্জ সফর থেকে করতে পারবেন যা তিনি ১২৩৬ হিজরীতে করেছিলেন। এই গোটা সফরে ভারতবর্ষের সেই পূর্বাঞ্চল যা বর্তমানে তিন প্রদেশ (যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বাঙলা) নিয়ে গঠিত এবং এই কাফেলার চলার পথ আর এই কাফেলা এ পথ দিয়েই অতিক্রম করত, অব্যাহত নড়াচড়া ও গতির মাঝে ছিল। সর্বত্রই দীনের জন্য পাগলপারা মুসলমানরা পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। বিগত জীবনের পাপ ও গাফলতি থেকে তারা তওবা করত এবং আল্লাহ্‌র কাছে নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতো। গ্রাম-গঞ্জের লোকেরা শত শত সংখ্যায় দলে দলে আসত এবং বায়আত ও তওবা করত। আগ্রহী লোকেরা কাফেলার লোকদেরকে দাওয়াত করে নিজ এলাকা ও বাড়িঘরে নিয়ে যেত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিন্তু বুলন্দ হিম্মতের অধিকারী মুসলমানেরা গোটা কাফেলাকে (যার সংখ্যা কলকাতা পৌঁছুতে পৌঁছুতে সাড়ে সাত শ'তে গিয়ে পৌঁছেছিল) এবং সেই সব শত শত মুসলমানকে যারা আশেপাশের এলাকা থেকে আসত, দিল খুলে কয়েক দিনের মেহমানদারী করত। নেতৃস্থানীয় মুসলমানেরা শাহী মনোবল নিয়ে দীনের কাজে নিজেদের সহায়-সম্পদ ব্যয় করত। এলাহাবাদের নেতৃস্থানীয় জনাব শায়খ গোলাম আলী বার থেকে পনেরো দিনে মোটামুটি হিসাব অনুযায়ী বিশ হাজার টাকা খরচ করেন। তাঁর দস্তরখানে দু'বেলা শত শত মানুষ পেট পুরে খানা খেত। কোন কোন লোকের ধারণা, প্রতি দিন এক হাজার টাকা খানাপিনায় খরচ হত।[২]

১. সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ, তৃতীয় সংস্করণ।
২. মাখযানে আহমদী (ফারসী), মওলভী মুহাম্মদ আলীকৃত (ম. ১২৬৬ হি.)।



মানুষ সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র)-এর দিকে যেভাবে ঝুঁকেছিল এবং সত্যানুসন্ধানী মানুষের ভীড় এভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সমগ্র শহরগুলোতে খুব কম লোকই এমন ছিল যারা তওবা ও বায়'আত করেনি এবং এই কাফেলার বরকত থেকে মাহরূম হয়ে থাকবে। এলাহাবাদ, মির্যাপুর, বানারস, গাযীপুর, আজীমাবাদ, পাটনা ও কলকাতায় মোটামুটি কয়েক লক্ষ মুসলমান বায়আত হয়, অতীতের গোনাহ থেকে তওবা করে। ধর্মের সাধারণ গুরুত্ব ও এর প্রতি আগ্রহের পরিমাপ এর থেকেও করা যাবে যে, বানারসে হাসপাতালের রোগীরা এই পয়গাম পাঠায়, আমরা অসহায় ও অক্ষম। আপনার খেদমতে যাওয়া আমাদের পক্ষে কষ্টকর। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আপনি যদি আমাদের কাছে আসতেন তাহলে আমরা বায়আত হতে পারতাম। তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে একদিন তিনি কয়েকজন সাথীসহ সেখানে যান এবং ঐসব রোগীকে বায়'আত ও তওবা করান।[১]

কলকাতায় তিনি দু'মাস অবস্থান করেন। দৈনিক এক হাজারের মত মানুষ তাঁর হাতে বায়আত হতো। প্রতিদিনই বায়আত গ্রহণকারীদের ভিড় বেড়ে চলে। বায়আত গ্রহণের জন্য আগত লোকের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, সকাল থেকে রাত দু'টো আড়াইটে পর্যন্ত নারী-পুরুষের ভিড় থাকত। সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) একমাত্র সালাত আদায় ছাড়া খানাপিনা ও মানবীয় প্রয়োজন পূরণের ফুরসত পেতেন না। এক একজন করে পৃথকভাবে বায়আত গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। একটি বিরাট প্রশস্ত হল ঘরে সকলে জমায়েত হতো। তিনি আসতেন। সাত-আটটা পাগড়ী তিনি মানুষের হাতে ধরিয়ে দিতেন। লোকে এগুলো ধরত। এরপর তিনি বায়আতের শব্দগুলো আযানের ন্যায় উচ্চ কণ্ঠে বলতেন। উপস্থিত লোকেরা সেগুলো সাথে সাথে উচ্চারণ করত। দিনে সতেরো-আঠারো বার একইভাবে বায়আত গ্রহণ অনুষ্ঠিত হতো। আর এভাবেই দৈনিক হাজার হাজার মানুষ বায়আতভুক্ত হতো।[২]

ফজর সালাতের পর সাইয়েদ আহমদ শহীদ ১৫-২৯ দিন পর্যন্ত ওয়াজ করেন। দু'দু' হাজার আমীর-উমারা, আলিম-উলামা ও সূফী-দরবেশ প্রতিদিনই তাঁর খেদমতে আসতেন। দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের তো কোন সীমা-সংখ্যাই ছিল না! মাওলানা আবদুল হাই সাহেব জুমুআ ও মঙ্গলবার দিন জোহরের সালাতের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওয়াজ করতেন এবং মানুষ পতঙ্গের মত সমবেত হত। দৈনিক ১০-১৫ জন হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করত।[৩]

২. মাখযানে আহমদী (ফারসী), মওলভী মুহাম্মদ আলীকৃত (ম. ১২৬৬ হি.)।
২. ওয়াকায়ে আহমদী, (পাণ্ডুলিপি)। ৩. প্রাগুক্ত।

সংস্কার-সংশোধন ও দীনদারী, তওবা ও আল্লাহ্‌র দিকে রুজু'র এই সাধারণ পরিবেশের শুভ ক্রিয়া হলো। একেবারে হঠাৎ করেই মদ তৈরির কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। শুঁড়িখানার মালিকরা বৃটিশ গভর্নমেন্টের কাছে অভিযোগ পেশ করল, আমরা অকারণে সরকারী ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছি। বেচা-বিক্রি না থাকায় আমাদের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। যেদিন থেকে একজন বুযুর্গ তাঁর কাফেলা নিয়ে এই শহরে এসেছেন, শহর ও গ্রামের সব মুসলমান তাঁর মুরীদ হয়েছে এবং প্রতিদিনই হচ্ছে। এরপর থেকে তারা যাবতীয় মাদক দ্রব্য থেকে তওবা করেছে। এখন আর কেউ আমাদের দোকানের দিকে ফিরেও চায় না।[১]

দীন ও দীনদার লোকদের প্রতি মানুষের ভালবাসার অবস্থা ছিল এরূপ, যখন হাজীদের এই কাফেলা যাদের সংখ্যা ছিল সাত শ', মক্কা মুআজ্জমা থেকে ফেরার পর মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী দেওয়ান গোলাম মুর্তযার বাড়িতে গিয়ে উঠল তখন দেওয়ান সাহেব প্রকাশ্য বাজারে ঘোষণা করে দিলেন, সাইয়েদ সাহেবের কাফেলার কোন লোক বাজার থেকে কোন কিছু কিনলে অথবা কাউকে দিয়ে কোন কাজ করালে তার মূল্য কিংবা মজুরি আমি পরিশোধ করব। সাইয়েদ আহমদ শহীদ তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, আপনি এতটা দায়বদ্ধ কেন হচ্ছেন? তিনি জওয়াব দিলেন, কোন মুসলমানের ঘরে যখন হাজী সাহেবের আগমন ঘটে তখন তার বড়ই সৌভাগ্য লাভ ঘটে। আপনাদের পদার্পণ আমার জন্য যেই সৌভাগ্য বয়ে এনেছে এর জন্য আমি যতই গর্ব করি না কেন, তা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকরই হবে। আমার পরম সৌভাগ্য, এত বিপুল সংখ্যক হাজীর শুভাগমন আমাকে ধন্য করেছে।[২]

এরপর যখন সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) মুসলমানদেরকে জিহাদের দাওয়াত জানালেন তখন মুসলমানরা অত্যন্ত স্যোৎসাহে তা কবুল করে। কৃষক তার লাঙ্গল ছেড়ে, দোকানদার দোকান বন্ধ রেখে, কর্মচারী ও চাকুরীজীবী তার মনিব ও বস্‌কে সালাম জানিয়ে, নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের মহল্লা থেকে বেরিয়ে, উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখ-ই-ইজাম স্ব স্ব মাদরাসা-মকতব ও খানকাহ ছেড়ে তাঁর সঙ্গী হয়েছেন এবং একবারের জন্যেও ঘরের দিকে ফিরে তাকান নি, এমন কি প্রাণোৎসর্গকারী জানবায মুজাহিদদের শেষ জামাতটি বালাকোটের সংকীর্ণ ও কংকরময় ঘাঁটিতে সেই সব পাথর ও কাঁকরের মাঝে, যার ভেতর দিয়ে পথ চলা পথিকের জন্য মোটেই সহজ নয়, নিজেদের চেয়ে দশ গুণ শত্রুর মুকাবিলায় জীবন বিলিয়ে দিলেন এবং মৃত্যুর মুহূর্তেও ঘরবাড়ির কথা স্মরণে আনেন নি।

---

১. ওয়াকায়ে, আহমদী; ২. মনজুরাতু'স-সুআদা, সাইয়েদ জাফর আলী নকভীকৃত।



এই সব বিস্তারিত বিবরণ এজন্য লিখিত হলো যেন এর পরিমাপ করা যায় মুসলমানদের কর্তৃত্বের শেষ যুগে এবং তাদের অধঃপতনের যৌবনকালেও, কিন্তু পাশ্চাত্য উত্থান ও বিজয় যুগের প্রথম দিকে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মের প্রতি আগ্রহ ও সম্মানবোধ, ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতি কতটা প্রবল ছিল এবং তাদের মনোবল কতটা উন্নত ছিল।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকেও যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা. তাদের নীতি-নৈতিকতা, চরিত্র ও রাজনীতির প্রভাব ভারতবর্ষের সাধারণ জনজীবনে তেমন প্রভাব ফেলেনি, প্রথম যুগের আছর বর্তমান ছিল, যদিও তা ছিল মরণ দশায় এবং হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (র) [১২১৩-১৩০৮ হি.]-র মত বুযুর্গ যিনি এই উভয় যুগই স্বচক্ষে দেখেছিলেন, নিজের যুগের ধর্মীয় দুর্দশাদৃষ্টে আফসোস করতেন এবং বড় ব্যথাভরা কণ্ঠে বলতেন ঃ

جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے

"একদা যারা দিলের দাওয়াই বিক্রি করত তারা আজ দোকান-পসারী সাজাতে ব্যস্ত।"

যদিও হেমন্তের হিমেল বাতাস বইতে শুরু করেছিল তবুও শীত মৌসুম তখনও জেঁকে বসেনি। আল্লাহ-সন্ধানী মন-মানসিকতা তখনো বিদ্যমান ছিল। আল্লাহওয়ালা লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক, আত্মিক পরিশুদ্ধি, জীবনের সংস্কার-সংশোধন ও প্রশিক্ষণকে জীবনের একটি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য শাখা মনে করা হতো। আলিম-উলামা ও দীনদার লোকদের কথা বাদ দিলে সাধারণ কারবারী মুসলমান ও দুনিয়াদার আমীর-উমারাও এই ধারণা থেকে শূন্য ও এই আগ্রহ থেকে মাহরূম ছিলেন না। বড় বড় কেন্দ্রীয় শহর বাদ দিলে ঐ ছোট ছোট গ্রাম ও কসবাও আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী ও আল্লাহ্‌র নাম শিক্ষা দানকারী মুসলমানদের জনবসতি, শহর, নগর-বন্দর, গ্রামগঞ্জ ও পল্লীগুলোতে এমন অব্যাহতভাবে পাওয়া যেত যে, এমন একটা যুগ পাওয়া যাবে না যখন তাঁরা ছিলেন না। আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর পূর্বের ভারতবর্ষের দিকে তাকান কিংবা কোন বর্ষীয়ান মুরুব্বী থেকে শুনুন, দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এক সারি আলোকমালা চোখে পড়বে।

ক্রমে ক্রমে এসব ভোরের শুকতারা এক এক করে নিভতে শুরু করে। এক প্রদীপ থেকে আরেক প্রদীপ জ্বলবার চিরাচরিত ধারা থেমে যায়। এই টিমটিমে

প্রদীপটুকুও অবশেষে নিভে যায়। মৌসুম ক্রমান্বয়ে তার পরিপূর্ণ প্রভাব জাঁকিয়ে বসে। হেমন্তকালে গাছপালা হেলাতে এবং শুকনো পাতা ঝরাতে কে দেখেছে? কিন্তু মৌসুম ও আবহাওয়ার প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় পাতা ও ফুল শুকিয়ে শুকিয়ে আপনাআপনিই ঝরে যায়। ইংরেজ শাসকদের পক্ষ থেকে কখনো এ ঘোষণা আসে নি, খানকাহ্গুলো বন্ধ করে দিন এবং সংস্কার-সংশোধন ও পথ প্রদর্শনের কাজ গুটিয়ে ফেলুন। এর বিপরীতে সে যুগে ভ্রমণের রাস্তা খুলে যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে দূরদরাজ এলাকায় ভ্রমণ পূর্বের তুলনায় খুবই সহজ হয়ে যায়। কিন্তু হলে কী হবে? মানুষের মন থেকে সেই আগ্রহ-উদ্দীপনাই হারিয়ে যায়, যে আগ্রহ-উদ্দীপনা একদিন সুদূর বুখারা ও সমরকন্দ থেকে ইলম পিয়াসীদের পায়ে হাঁটিয়ে এখানে টেনে আনত। তারা এই বৃক্ষের ওপর কখনো কুড়াল মারে নি, কখনো এই বৃক্ষে আগুন লাগায় নি, কিন্তু গাছের গোড়ায় পানি না ঢালায় ও অনুকূল আবহাওয়া ও উপযুক্ত পরিবেশ না পাওয়ায় তার ডালপালাগুলো নিজের থেকেই শুকিয়ে যেতে থাকে এবং ফলে-ফুলে সুশোভিত হওয়া অনেক দিন থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

জীবনে আল্লাহ্কে পাবার কোন ঘর এবং ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কোন কোণ থাকল না। হৃদয় ও আত্মার জায়গাও পেট ও পাকস্থলী দখল করে নিল। জীবনের সমস্ত উন্নত, পবিত্র ও সূক্ষ্ম হাকীকত চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এখন দীর্ঘকাল থেকেই অদৃশ্য লোক থেকে এই আওয়াজ ভেসে আসছে ঃ

نہ ڈھونڈھ اہل دل کواب کہ جوش قلزم فنا

متاع درد جن میں تھی وہ کشتی ڈبوچکا ۔

"এখন আর তুমি হৃদয়বান মানুষ সন্ধান করো না; কেননা লোহিত সাগরের উত্তাল ঊর্মি থেমে গেছে।

ব্যথার পুঁজি যাদের ভেতর ছিল সেই নৌকাগুলো ডুবে গেছে।"

## দুনিয়া কামনার রোগ

বর্তমান যুগ আল্লাহ্কে চাইবার পরিবর্তে দুনিয়া চাইবার যুগ এবং তার চাইতেও অধিক জোরেশোরেই এসেছে এই যুগ। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ক্ষমতায়নের এই যুগে দুনিয়া কামনা ও উদর পূজার যেই তুফান এসেছে তার জন্য রোগ-ব্যাধি ও প্রলাপের চাইতে কমতম কোন শব্দসমষ্টি যথেষ্ট নয়। বিত্ত-সম্পদের এ এক অতৃপ্ত ক্ষুধা ও না মেটবার মত পিপাসা যাকে রাক্ষুসে



ক্ষুধা-তৃষ্ণা বলাই সঙ্গত। চতুর্দিকে কেবল আরও চাই, আরও চাই ধ্বনি। জীবনের কামনা-বাসনা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীবন মান এত উন্নত হয়ে গেছে যে, লোভী পথিকের দু'দণ্ড কোথাও দাঁড়াবার কিংবা বিশ্রাম নেবার ফুরসৎ নেই। লোভী ও অতৃপ্ত এই পাখী কেবলই ঊর্ধ্বাকাশে ডানা মেলতে চায়, কোথাও একদণ্ড জিড়োবার মত স্থান বা সময় নেই। সম্পদের যত পাহাড়ই সে গড়ুক, সম্মান ও পদমর্যাদার যত শীর্ষেই সে আরোহণ করুক, কোথাও সে তৃপ্ত নয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ক্ষমতার এই যুগে মূলত না প্রকৃত জ্ঞানের প্রতিই মানুষের আগ্রহ আছে, আর না আছে ধর্মের প্রতিই কোন আকর্ষণ অথবা অন্য কোন কিছুর প্রতি কোনরূপ সূক্ষ্ম চাহিদা। একমাত্র পেট যার দৈর্ঘ্য এক বিঘতের বেশী নয়, জীবনের সকল ব্যাপ্তি ও প্রশস্ততাকে ঘিরে রেখেছে। কল্পনার জগতে পুস্তক রচনাকারী সুখ স্বপ্নের অধিকারী লেখক যা খুশী লিখুক, ব্যস্ত জীবনে এই মুহূর্তে কেবল একটিই সক্রিয় শক্তি এবং একটিই জীবন্ত সত্যের সাক্ষাত পাওয়া যায় আর তা হল পেট কিংবা পকেট।

মি. জোডের কথা কেবল য়ূরোপ সম্পর্কেই সঠিক নয়, বরং পাশ্চাত্যের মানস সন্তান গোটা বিশ্ব সম্পর্কেও যথার্থ ও সঠিক।

"যেই জীবন-দৃষ্টি এই যুগের ওপর চেপে বসে আছে, বিজয়ী হিসেবে জেঁকে আছে তা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ এবং প্রতিটি সমস্যা ও প্রতিটি বিষয়কে পেট কিংবা পকেটের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ও যাচাই-বাছাই করা।"

কোন যুগ ও যমানার রুচি, স্বাদ ও সাধারণ প্রবণতা ও জীবনের সত্যিকার সমস্যার সঠিক পরিমাপ সে সব গ্রন্থ থেকে করা যায় না যে সব গ্রন্থ সেই যুগে লেখা হয় (যদিও সাধারণ রুচি-প্রকৃতি ও প্রবণতার প্রভাব থেকে কোন গ্রন্থই একেবারে মুক্ত হয় না এবং কয়েকটি পর্দার আড়াল থেকেও এর আভা দৃষ্টিগোচর হয়), কিন্তু কোন কোন সময় এসব গ্রন্থের লেখকরাও তাদের একক রুচি কিংবা জাতির কোন ক্ষুদ্র দলের প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন এবং কোন কোন সময় ঘটনাবলীর পরিবর্তে আপন কামনা-বাসনাকেই ঘটনা হিসেবে পেশ করে থাকেন। যুগের রুচি ও প্রবণতার সঠিক পরিমাপ দৈনন্দিন জীবন, খোলামেলা ও অসংকোচ আলাপ-আলোচনা, বৈঠকী আলাপের বিষয়বস্তু এবং লোকের সাথে মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাতের হয়ে থাকে। কবি আকবর ইলাহাবাদীর ভাষায় ঃ

نقشوں کوتم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو

کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے

"ছবি যাচাই করো না, লোকের সাথে মিলিত হয়ে দেখ, কোন জিনিস জীবিত হচ্ছে আর কি মারা যাচ্ছে।"

এই মূলনীতিকে সামনে রেখে রেলপথের দীর্ঘ সফরে, সকাল-সন্ধ্যার পায়চারীর মুহূর্তে, খানা কিংবা চায়ের টেবিলে, সবুজ পার্ক ও ভ্রমণ কেন্দ্রগুলোর ইতস্তত পদচারণা ও আড্ডার সময় এবং বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খোলামেলা ও অন্তরঙ্গ আলোচনার মওকায় কান লাগিয়ে শুনুন, কি নিয়ে ও কোন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, আলোচনার বিষয়বস্তু কী? শুনতে পাবেন, কথা হচ্ছে বেতন বাড়ল কিংবা কমলো, অফিসারদের সন্তুষ্টি কিংবা অসন্তুষ্টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বদলি, তাদের মেযাজ-মর্জি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা, ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভালাভ, ব্যাংকের লেনদেন, সুদের হার, কোম্পানীর শেয়ার, শেয়ার বাজার, বীমা কোম্পানীর পলিসি, পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ড, চাকুরী থেকে অব্যাহতি কিংবা অবসর গ্রহণের পরবর্তী অবস্থা, চাকুরীর সম্ভাবনা, জেতার নানা ঘটনা, সৌভাগ্যবানদের নিয়ে ঈর্ষা, ভাগ্যহতদের ব্যাপারে আফসোস এবং এ জাতীয় বিষয় নিয়ে কথা ছাড়া আপনি হাজার চেষ্টা করলেও এর বাইরে অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করতে দেখতে পাবেন না।

অথবা আপনি দেখবেন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা ও পর্যালোচনা হচ্ছে, কিন্তু কোন নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। কোন ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থার ওপর নীতিগত সমালোচনা এবং কোন সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা ও আশাবাদ এতে আপনি পাবেন না। পাশ্চাত্যের লোকেরা এ ব্যাপারে অগ্রণী এবং ভারতের হিন্দুরা প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের হুবহু অনুসারী। দুঃখের ব্যাপার হলো, মুসলমানরাও এখন তাদের পদাংক অনুসরণ করছে।

**নৈতিক অধঃপতন**

য়ুরোপিয়ানরা এদেশে যখন প্রথমে বণিক, অতঃপর বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করল তার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই এখানে অধঃপতন শুরু হয়ে গেছে। প্রাচ্যের ও ইসলামী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলো হয় তো পতনের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান অথবা এর মধ্যে বাড়াবাড়ি ও বিকৃতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এরপরও এমন কতকগুলো নৈতিক বৈশিষ্ট্য এতে পাওয়া যেত এবং এতে এমন উন্নতি হয়েছিল যার কল্পনা করাও এ যুগে দুরূহ। প্রাচ্যের লোকেরা কতক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে উন্নত করতে করতে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, তা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এর মধ্যে এমন সূক্ষ্মতা ও পেলবতা দান করেছিল পাশ্চাত্যে যা কেবল কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পকলারই অংশ।



মুসলিম প্রাচ্যে সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এতটা দৃঢ়, মযবুত, স্থায়ী ও গভীর ছিল আজকে তা কল্পনা করাও কঠিন। পিতামাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, সন্তানের ও ছোটদের প্রতি পিতামাতা ও গুরুজনদের বাৎসল্য ও স্নেহ, বড়দের প্রতি ছোটদের ভক্তি-শ্রদ্ধা, নারীদের সতীত্ব, সম্ভ্রমবোধ, স্বামীর আনুগত্য ও তার প্রতি বিশ্বস্ততা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আমানতদারী ও নেমক হালালী, যুবকদের চারিত্রিক সততা ও দৃঢ়তা, অভিজাত ও শরীফ লোকদের আচার-আচরণ, ব্যবহার, আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা, দেখা-সাক্ষাত, সময়ানুবর্তিতা, নিয়মিত আমলসমূহ আদায়, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সাম্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য ত্যাগ, কুরবানী ও সংবেদনশীলতা ইত্যাদি। এর এক একটি শিরোনামের আওতায় এত ব্যাপক ও বিস্তৃত ঘটনা বর্ণিত আছে যা কালের বিবর্তনে আজ সহজে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এর এত প্রচুর কারণ রয়েছে যে, বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না।

পিতার প্রতি সন্তানের আনুগত্যবোধ মুসলিম প্রাচ্যে এই কিছুকাল আগে পর্যন্ত (এবং কোথাও কোথাও এখন পর্যন্ত) রসূলুল্লাহ (সা)-র নির্দেশ পালনার্থে বিদ্যমান ছিল, যে নির্দেশ তিনি জনৈক ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন আর তা ছিল এই ঃ انت ومالك لابيك 'তুমি ও তোমার সম্পদের মালিক তোমার পিতা'। পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং তাদের প্রাপ্য হক আদায়ের এই প্রেরণা পিতামাতা জীবিত থাকা পর্যন্তই সীমিত ছিল না, বরং তাদের মৃত্যুর পরও তা অব্যাহত থাকত। পিতামাতার বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত একান্ত জনদের প্রতি আচার-ব্যবহার, সাহায্য-সহযোগিতা, উপহার-উপঢৌকন ও হাদিয়া-তোহফা প্রদানের মাধ্যমে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করা সৌভাগ্যবান সন্তানের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল। বস্তুতপক্ষে এটাও ছিল নববী তা'লীমেরই ফলশ্রুতি। এই তা'লীমে বলা হয়েছিল ঃ

من ابرء البر حلة الرجل اهل ابيه بعدان يوفى -

"সর্বোত্তম নেকীর আমলসমূহের অন্যতম হল পিতার ইনতিকালের পর তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা" (আল-হাদীস)

অপর দিকে সন্তান-সন্ততির প্রতি পিতামাতার আচরণও ছিল বিশুদ্ধ কল্যাণ কামনার ওপর নির্ভরশীল এবং তাদের এই আচরণ ছিল মুসলিম প্রাচ্যের ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রকৃষ্টতম নমুনা। সন্তানের কল্যাণ কামনায় তারা নিজেদের জীবনের যাবতীয় স্বাদ-আহ্লাদ, আনন্দ, সুখ-শান্তি ও চাওয়া-পাওয়া বিসর্জন

দিতেন এবং তাদের সুশিক্ষা ও বিশুদ্ধ প্রশিক্ষণ দেওয়া তাদের মৌলিক কর্তব্য জ্ঞান করতেন। তাদের সুশিক্ষা, নৈতিক সতর্কতা ও উস্তাদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় শাস্তি প্রদানের সময় পিতামাতা তাদের দিলকে পাথর বানিয়ে নিতেন। এমত ক্ষেত্রগুলোতে সন্তানের পক্ষ গ্রহণ ও উস্তাদের গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশকে আভিজাত্য ও ভদ্রতার পরিপন্থী মনে করা হতো যার জন্য কোন শরীফ পিতাই প্রস্তুত হতেন না, এমন কি এক্ষেত্রে অনেক সময় অশিক্ষিত পিতামাতা পর্যন্ত উস্তাদের বাড়াবাড়িকে সমর্থন করতেন এবং সন্তানকেই বরং উল্টো ধমক দিতেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করতেন। সাধারণত সকল পিতামাতার মুখেই একথা ফিরত, "উস্তাদের হক পিতামাতার চাইতে বেশী।"

মুসলিম সমাজে বড়-ছোটর সম্পর্ক এই হাদীসের আলোকে নির্ণীত হতোঃ من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا "যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের কেউ নয়।"

প্রাচ্যের নৈতিকতা ও সভ্যতার মূল সম্পদ হলো এর স্থিরচিত্ততা, দৃঢ়তা ও জীবন-যিন্দেগীর একই রকম হওয়া। বিগত যুগে এই পতনোন্মুখ সমাজেও এ সম্পর্কিত অত্যাশ্চর্য সব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে লোক একবার যে কাজ শুরু করত বছরের পর বছর সেই কাজ করত। যে পেশা একবার নির্ধারণ করে নিত তা মৌসুমী পরিবর্তন, স্বাস্থ্যগত উত্থান-পতন সত্ত্বেও এতে এতটুকু ফাঁক-ফোকর, মামুলী সুযোগ ও অলসতাবশত পার্থক্য সৃষ্টি হতে দিত না। যার সঙ্গে যেমনতরো ব্যবসায়িক লেনদেন শুরু করা হতো শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করা হতো, তা এতে যা-ই কিছু ঘটুক না কেন এবং অবস্থার যতই পরিবর্তন সাধিত হোক না কেন।

সে যুগে খান্দানী ও গোত্রীয় জীবনে ব্যক্তির সম্মান-শ্রদ্ধা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মাপকাঠি ও সম্পর্কের যোগসূত্রের শর্ত কেবল ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যই ছিল না। একই খান্দান ও একই পরিবারে বিভিন্ন সদস্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা স্তরের হয়ে থাকে। কেউ হয় ধনী, কেউ হয় নিঃস্ব গরীব। কিন্তু পারিবারিক সমাবেশ ও মিলন মেলাগুলোতে কারোর এ ক্ষমতা বা দুঃসাহস হতো না যে, আর্থিক পার্থক্যের কারণে একই খান্দান ও পরিবারের লোকদের মাঝে আচার-ব্যবহারে পার্থক্য করবে। কদাচিৎ এ ধরনের ভুল হয়ে গেলে এর বিরুদ্ধে সমগ্র খান্দান ও গোটা পরিবার প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠত। কখনো তা সম্পর্ক ছেদের পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে গড়াত। একজন গরীব অভিজাত পরিবারের সন্তান অন্য সচ্ছল ভাইয়ের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে স্বচ্ছন্দে কথা বলত এবং সচ্ছল ভাইও গরীব ভাইয়ের



সঙ্গে তার পারিবারিক আভিজাত্য ও আত্মীয়তার দরুন সমান আচরণ করত। এ ব্যাপারেও সযত্ন প্রয়াস চালানো হতো যাতে করে দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার কথা নিকটতম ও ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়-স্বজন ছাড়া বাইরের লোকেরা জানতে না পারে, অন্যের সামনে যেন তা প্রকাশ না পায়।

ইসলামী পরিবেশের শেষ যুগ পর্যন্ত অভিজাত, ভদ্র ও নীতিবান লোকদের বিবেক তার সম্মান-সম্ভ্রম, তথা ইজ্জত-আব্রু ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মতই এমন এক সম্পদ মনে করা হতো যা বিক্রয়যোগ্য নয়, এমন কি এর বিনিময়ে যত মূল্যই প্রদান করা হোক না কেন। ১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লবের আগে পিছে মুসলিম অভিজাতদের অনেক দৃষ্টান্ত মিলবে যেখানে তারা নিজেদের মৃত্যুকে কবুল করে নিয়েছে, কিন্তু বিবেককে খুন করা পসন্দ করে নি। তারা এজন্য গুলী খেয়েছে কিংবা ফাঁসি কাষ্ঠে জীবন দিয়েছে, তবুও মিথ্যা বলতে রাজী হয় নি। তার সামনে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে, মিথ্যা বলে সে নিজেকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে পারে এবং সে এই বিপ্লবে যোগ দেয়নি কিংবা কোনভাবেই সে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না, এই বলে সাফাই পেশ করে সে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। কিন্তু না, তা তারা করে নি। কেননা তা ছিল প্রকৃত সত্যের পরিপন্থী এবং তার বিবেকের বিরোধী।

মিল্লাত ও জাতির স্বার্থেও সে এভাবে নিজেকে সাচ্চা ও সত্যবাদী প্রমাণ করত যেভাবে প্রমাণ করত ব্যক্তি ও পারিবারিক স্বার্থের ক্ষেত্রে। জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থপূজার যে নগ্ন হাওয়া আজ পাশ্চাত্যের জাতিগুলোর মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে তখন পর্যন্ত তা এদেশে দেখা দেয় নি। তারা জাতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতেও মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াকে তেমনি পাপ ও অপরাধ মনে করত যেমন মনে করত নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে। শরীয়তের হুকুম-আহকামকে তারা ব্যক্তিগত ও জাতীয় সকল বিষয়ে ও সমস্ত ব্যাপারে সমভাবে প্রযোজ্য ভাবত। তাদের সামনে ছিল কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত হেদায়েতসমূহ ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى

اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ۔

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায় ও ইনসাফের পতাকাবাহী ও আল্লাহ্‌র পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যাও যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতামাতা ও আত্মীয়-পরিজনের বিরুদ্ধেও হয়।"( সূরা নিসা ঃ ১৩৫)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى - وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط

"কোন জাতিগোষ্ঠীর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অন্যায় বিচারে প্ররোচিত না করে। ন্যায় বিচার করবে; এটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করবে।" (সূরা মায়েদা ঃ ৮)

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ط

"যখন তোমরা বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে সালিশ নিযুক্ত হও তখন ন্যায়বিচার করবে।" (সূরা নিসা ঃ ৫৮)

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ج

"যখন তোমরা কথা বল তখন ইনসাফের ভিত্তিতে বল, যদি তা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও যায়।" (সূরা আনআম ঃ ১৫৩)

ইংরেজ শাসনামলের প্রথম দিকের ঘটনা। মুজাফফর নগর জেলার কান্দেহ্লা নামক কসবার এক স্থানে একটি জায়গা নিয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, জায়গাটি হিন্দুদের মন্দিরের, নাকি মুসলমানদের মসজিদের। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর মুসলমানদের কিছু লোককে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! হিন্দুদের মধ্যে কি এমন কোন লোক আছে যার সত্যবাদিতার ওপর আপনারা আস্থা রাখতে পারেন এবং যার সাক্ষ্যের ওপর ফয়সালা দেওয়া যায়? তারা জানাল, তাদের নজরে এমন কোন লোক নেই। এরপর তিনি হিন্দুদের ডেকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, বড় মুশকিলের ব্যাপার! কেননা ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। তারপরও মুসলমানদের মধ্যে একজন বুযুর্গ আছেন যিনি কখনো মিথ্যা বলেন না। আমাদের বিশ্বাস, এ সময়ও তিনি সত্যই বলবেন।

এই বুযুর্গ ছিলেন হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভীর শাগরিদ এবং স্যাইয়েদ আহমদ শহীদ (র)-এর খলীফা মুফতী ইলাহী বখ্শ সাহেবের খান্দানের। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বুযুর্গের খেদমতে চাপরাশী পাঠিয়ে তাঁকে আদালতে ডেকে পাঠালেন। বুযুর্গ বললেন, আমি কসম খেয়েছি কখনো ইংরেজের মুখ দেখব না। ম্যাজিস্ট্রেট এরপর বলে পাঠালেন, আমার মুখ দেখার দরকার নেই। তবুও আপনি মেহেরবানী করে আসুন। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি না আসলে ফয়সালা হচ্ছে না।



অবশেষে বুযুর্গ এলেন এবং ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে গেলেন। গোটা বিষয়টি বুযুর্গের সামনে পেশ করা হলো এবং এ বিষয়ে তিনি যা জানেন তা বলতে বলা হলো। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকের দৃষ্টি বুযুর্গের প্রতি নিবদ্ধ এবং সকলের কান তাঁর জওয়াব শোনার জন্য উদ্গ্রীব যেই জওয়াবের ওপর এই গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক সংঘাতপূর্ণ বিষয়টির ফয়সালা নির্ভর করছে। এমন সময় বুযুর্গ বললেন, আসল কথা হলো, জায়গাটা হিন্দুদের। মুসলমানদের এই জায়গার সঙ্গে আদৌ কোন সম্বন্ধ নেই। ব্যস! আদালতের ফয়সালা হয়ে গেল। জায়গা হিন্দুরা পেল আর মুসলমানরা মোকদ্দমায় গেল হেরে। কিন্তু মুসলমানরা হারলেও ইসলামের নৈতিক বিজয় হলো। সত্যবাদিতা ও ইসলামী আখলাক প্রকাশ কয়েক হাত মাটি হারিয়ে বহু অমুসলিমের বিবেক-বিবেচনা ও মন-মস্তিষ্ক জিতে নেয়। অনেক হিন্দু সেদিনই বুযুর্গের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়।

বিবেক-বুদ্ধি ছাড়াও জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধাশক্তিকে এমন এক পবিত্র ও মূল্যবান সম্পদ মনে করা হতো যা ইতর-ভদ্র-নির্বিশেষে যে কোন মানুষের কাছে বিক্রি করা হতো না। যারা এ ব্যাপারে সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তারা কোনক্রমেই তা বিক্রয় করা পসন্দ করতেন না এবং একে আল্লাহ্তাআলার মূল্যবান অনুগ্রহ ও আমানত মনে করতেন। বিশেষত তা কুফর ও পাপকর্মে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতায় ও শক্তি বৃদ্ধিতে একে কাজে লাগানো কিংবা কোনরূপ ভ্রান্ত মতাদর্শের ধারক-বাহক সাজাকে বড় রকমের খেয়ানত ও ঈমান বিক্রয় মনে করতেন।

এই একই মানসিকতা ও চরিত্রের বুযুর্গ ছিলেন মাওলানা আবদুর রহীম রামপুরী (মৃ, ১২৩৪ হি.)। রোহিলা খণ্ডের ইংরেজ শাসক মি. হকিন্স তাঁকে বেরেলী কলেজে (প্রভাষক হিসেবে) অধ্যাপনার জন্য প্রস্তাব দেন এবং মাসে ২৫০ টাকা বেতন দেওয়া হবে বলে জানান (আজ থেকে প্রায় দেড় শত বছর পূর্বের ২৫০ টাকার বর্তমান মান যে কয়েক হাজার টাকা হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়) এবং অল্পদিনেই উল্লিখিত বেতন বৃদ্ধি করা হবে বলে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তিনি এই বলে তাঁর ওযর পেশ করেন, রামপুর রাজ্য সরকার থেকে তাঁকে প্রতি মাসে যে দশ টাকা মাসোহারা দেওয়া হয় তা বন্ধ হয়ে যাবে। মি. হকিন্স তাঁকে বলে পাঠান, আপনি রাজ্য সরকার থেকে যা পান আমি তো তার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশি বেতন দিতে চাচ্ছি। অতএব, এই বিরাট অংকের বেতনের মুকাবিলায় রাজ্য সরকারের মাসোহারা তো নিতান্তই তুচ্ছ! এরপর মাওলানা আবদুর রহীম পরবর্তী ওযর পেশ করলেন, আমার বাড়িতে একটি কুল

গাছ আছে। এর ফল খুব মিষ্টি যা আমি খুব পসন্দ করি। বেরেলী গেলে আমি কুল খেতে পারব না। বোঝা যায়, ইংরেজ শাসক তখনও মাওলানার মনের কথাটি ধরতে পারেন নি। তিনি বললেন, রামপুর থেকে কুল আনাবার ব্যবস্থা করা হবে। আপনি বেরেলীতে বসেই আপনার বাড়ির ফল খেতে পারবেন। এবার মাওলানা বললেন, আমার আরেকটি অসুবিধা আছে। আমার যেসব ছাত্র রামপুরে আমার কাছে পড়ে তারা মাহরূম হবে এবং আমিও তাদের খেদমত থেকে মাহরূম হব। ইংরেজ শাসক এরপরও হার মানতে রাজী নন। তিনি বললেন, আপনার ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে। ফলে তারা বেরেলীতে আপনার কাছে থেকেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে। এবার মুসলমান আলেম এমন তীর নিক্ষেপ করলেন যার জওয়াব ইংরেজ শাসক মি. হকিন্সের কাছে ছিল না। মাওলানা বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু আমি যদি লেখাপড়া শেখাবার বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করি তবে কাল কেয়ামতে যখন আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে তখন আল্লাহ্‌র দরবারে কী জওয়াব দেব? ভারতবর্ষ বিজেতা ইংরেজ শাসককে অবশেষে হার মানতে হলো। অপর দিকে মাওলানা আবদুর রহীম রামপুরী রামপুর রাজ্যের শাসক নওয়াব আহমদ আলী খান প্রদত্ত দশ টাকা মাসোহারার ওপর তাঁর অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দেন। আল্লাহ্ পাক মরহুমের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।[১] (নুযহাতুল খাওয়াতির)

এই নৈতিক শক্তি ও কীর্তির মুকাবিলা এ যুগের বিদ্যাবুদ্ধি বিক্রির সঙ্গে করুন। এ যুগের বুদ্ধিজীবীরা তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, মেধা ও যোগ্যতাকে নিলামে চড়িয়েছে। যে সর্বোচ্চ দাম দিতে স্বীকৃত হবে তার হাতে বিক্রি করবে। যদি কোন ইসলামী কিংবা মুসলিম প্রতিষ্ঠান এক শ' টাকা দেয়, পক্ষান্তরে কোন খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান এর মুকাবিলায় ১০৫ টাকা দিতে রাযী থাকে, তখুনি সে তার ওখানে চলে যাবে। আবার কোন য়াহূদী রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান যদি আরও পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দেয় অমনি সে তার হাতেই নিজেকে বিক্রি করে দেবে। সে এটা দেখবে না প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার মন-মানসিকতা, রুচি-প্রকৃতি ও বিষয়ের মিল আছে কিনা। অবস্থা যদি অনুমতি দেয় তবে দেখা যাবে, শিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা কেবল নামকাওয়াস্তে প্রমোশন কিংবা বর্ধিত বেতনের নিশ্চয়তা পেয়ে পুলিশ বিভাগে অথবা নৌচলাচল বিভাগে হৃষ্ট চিত্তে বদলি হয়ে যাবে। একজন পণ্ডিত ব্যক্তি যিনি কোন জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেছেন, তাত্ত্বিক ও জ্ঞানগত বিষয়ে যিনি গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে থাকেন, একদিন হঠাৎ করেই শুনতে পারেন, তিনি সামান্য উচ্চ বেতনের লোভে এমন এক সামরিক কিংবা প্রশাসনিক চাকরীতে যোগ দিয়েছেন যার সঙ্গে তার মানসিক ও জ্ঞানগত আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।



আজ কোন নিবন্ধকার এতে আদৌ কোন কষ্ট অনুভব করে না যে, সে যেই কলম দিয়ে কীর্তিমান মহাপুরুষের জীবন-চরিত লিখছে, আগামীকাল সেই একই কলম দিয়ে একজন জাতীয় বেঈমান ও গাদ্দারের প্রশংসা গাঁথা লিখছে।

জনৈক গ্রন্থ প্রেমিক উচ্চ মূল্যে যখন কোন দুর্লভ পুস্তক ক্রয় করতেন তখন আনন্দের আতিশয্যে নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করতেন। কিছুটা সংশোধন করে আজও তা পাঠ করা যায় ঃ

جمادے چند دادم جاں خریدم

بسے نازاں کوبس ارزاں خریدم

"কয়েকটি কড়ির মূল্যে আমি জীবন খরিদ করলাম; নগণ্য জিনিসের বিনিময়ে আমি মূল্যবান জিনিস খরিদ করলাম।"

এখানে "জীবন"-এর পরিবর্তে যদি "ঈমান" পাঠ করা হয় তাহলে বাস্তবতার নিরিখে তা ভুল হবে না। পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এও যে, সে সবের বুনিয়াদ সাধারণ অবস্থায় অধিকাংশই অবস্তুবাদী এবং নির্ভেজাল বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক কিংবা আত্মিক হতো এবং সে সবের মধ্যে নিজের স্বার্থ ও কামনা-বাসনার নাম-গন্ধ খুব কমই থাকত। এর ফলে কোন কোন সময় এমন সম্পর্কেরও সন্ধান মিলত এবং এর শেকড় দিল ও দিমাগের এত গভীরে প্রোথিত হতো যার কোন বস্তুগত ও বাণিজ্যিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। উস্তাদ-শাগরিদের সম্পর্ক এমন ছিল যার সামনে এ যুগের পিতা-পুত্রের ও প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কও গৌণ ও নিষ্প্রভ। বর্তমান যুগের মানুষ এটা জেনে বিস্ময়ে হতবাক হবে যে, ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম ও খ্যাতনামা উস্তাদ দরসে নিজামীর প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা নিজামুদ্দীন লাখনবী (মৃ. ১১৬১ হি.)-র ইনতিকালের খবর শুনে শোকাহত হয়ে তদীয় শাগরিদ সাইয়েদ কামালুদ্দীন আযীমাবাদী ইনতিকাল করেন এবং অপর শাগরিদ সাইয়েদ যরীফ আযীমাবাদী কাঁদতে কাঁদতে চোখ নষ্ট করে ফেলেন। অবশ্য পরে জানা যায়, ইনতিকালের খবর সঠিক ছিল না।[১]

য়ূরোপে ভোগ-বিলাস তথা আনন্দ-ফূর্তি ও ফায়দা হাসিলের দু'টো নৈতিক দর্শন ও চিন্তাধারা ফলে-ফুলে বিকশিত হতে থাকে। প্রাচ্যীয় ও ইসলামী নৈতিকতার ওপর দু'টোরই প্রভাব পড়েছে। প্রাচ্যের ইসলামের নৈতিক দর্শন এই উভয় দর্শন ও চিন্তাধারার চেয়ে অনেক উন্নত। উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি ও স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদী মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা থেকেও তা মুক্ত।

১. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৬ষ্ঠ খণ্ড

খ্রি. ১৭শ শতাব্দী থেকে লাভালাভের ধারণা প্রবল হতে থাকে। পাশ্চাত্যের নীতিশাস্ত্রবিদগণ বুক ফুলিয়ে বলতে শুরু করলেন, নৈতিকতার মধ্য থেকে যে বস্তুর উপকারিতা বা লাভ প্রকাশ পাবে না তা বিবেচনাযোগ্য নয়। তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই লাভ বা উপকারিতার সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য যেই মানসিকতা তুলাদণ্ডের ভূমিকা পালন করত, দুঃখের বিষয়, তা আগাগোড়া বস্তুবাদী ধারণায় রূপ লাভ করে চলেছিল। এর কাঠামো ও অনুর্বর ভূমি দিনকে দিন এমন হতে চলেছিল যে, কোন অবস্তুবাদী ও অপার্থিব লাভের ধারণা করতেও তা অক্ষম ছিল এবং এ ব্যাপারে তাদের অনুভূতি ও মেধা ছিল সীমিত ও নির্ধারিত। ফল হলো, এই নৈতিকতার সীমা নির্ধারণ ও লাভের রূপ বা প্রকৃতি নির্বাচন থেকে কৃত এই নাযুক কাজই বিচারক ও সালিশের কাছে সোপর্দ করা হলো তিনি তার প্রকৃতিগত পতিত মেযাজের কারণে কোন অবস্তুবাদী ও অপার্থিব লাভকে মেনে নেবার যোগ্যই ছিলেন না। এভাবেই লাভের সীমা নির্ধারণ স্বাভাবিক ও অবচেতনভাবেই বস্তুবাদী হয়ে যায় এবং কার্যত নৈতিক দর্শন বা নীতিশাস্ত্রের এমন কোন বস্তুর সঙ্গে আদৌ কোন সম্বন্ধই রইল না যার কোন বস্তুগত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লাভ নেই। ক্রমান্বয়ে এই বস্তুবাদী মানসিকতা ও লাভের ধারণা গোটা জীবনকেই ছেয়ে ফেলে।

বিগত শতাব্দীগুলোতে য়ূরোপের সাহিত্যে যেসব শব্দ সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে এবং যেসব শব্দ য়ূরোপের জন্য সর্বাধিক আকর্ষণীয় সেসব শব্দের অন্যতম "ফিতরত তথা প্রকৃতি"। কিন্তু যেসব জিনিস বা বস্তুর মুকাবিলায় এবং যেসব মওকায় এই শব্দটি বলা হতো তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, "প্রকৃতি" বলতে একান্তই পশু প্রকৃতি বোঝানো হয়েছে যা সর্বপ্রকার সূক্ষ্ম অনুভূতি, নৈতিক বিবেক, প্রশান্ত হৃদয় ও বুদ্ধি এই উভয়টি থেকে মুক্ত, যা সব ধরনের বাধ্যবাধ্যকতা ও সীমারেখাকে ভয় পায় যার দাবি হলো কেবল 'খাও, দাও, ফুর্তি কর, বাধা-বন্ধনহীন মুক্ত জীবন যাপন কর'। এজন্য কোন প্রকার হক বা অধিকার, দাবি ও মানবীয় দায়িত্ব বা কর্তব্য নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের উৎস বা উৎপত্তি সম্পর্কে যে গবেষণা করা হয় এবং যে মতবাদ সাধারণভাবে সকলেই মেনে নিয়েছ (অর্থাৎ জীববিজ্ঞানী ডারউইনের Theory of Evolution বা বিবর্তনবাদতত্ত্ব পরবর্তীকালে যা অসার বা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।-অনুবাদক) তা জীবনের সকল শাখাকে প্রভাবিত করে, নৈতিকতার ওপরও এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত প্রভাব পড়ে।

অতঃপর ঐ যুগে য়ূরোপে যান্ত্রিক যুগ শুরু হয়। মানুষের ধ্যান-ধারণা নির্ভেজাল জড়বাদী হয়ে যায়। ফলে যেই ছিটেফোঁটা নমনীয়তা ও জীবন-যিন্দেগী পশুসুলভ ধ্যান-ধারণাতেও অবশিষ্ট ছিল এ যুগে তাও বিদায় নেয়।



প্রখ্যাত য়ূরোপীয় নও মুসলিম মুহাম্মদ আসাদ য়ূরোপের এই নৈতিক ও চারিত্রিক পরিবর্তনের ওপর গভীর ও বিবেচনাপ্রসূত পর্যালোচনা পেশ করেছেন। যদি প্রাচ্যের ওপর পাশ্চাত্যের এই মানসিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য এভাবেই বজায় থাকে এবং খোদ য়ূরোপের বুকেই যদি বড় রকমের কোন বিপ্লব না সাধিত হয় তাহলে আজ পাশ্চাত্য সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে আগামী কাল প্রাচ্য সম্পর্কেও তাই বাস্তব হয়ে দেখা দেবে এবং এর লক্ষণও এখন থেকেই দেখা যাচ্ছে। জীবনের প্রতিটি শাখা ও বিভাগের ন্যায় প্রাচ্যের নৈতিকতাও আধুনিক পাশ্চাত্য ছাঁচে রূপ নিতে যাচ্ছে। যে মহলটি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত, তাদের নৈতিকতা পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শন ও চিন্তা-চেতনার সর্বোত্তম নমুনা। মুহাম্মদ আসাদ লিখছেন ঃ

"(য়ূরোপে) মানুষের এমন একটি দল সৃষ্টি হয়ে গেছে যাদের নীতিবোধ ও নৈতিকতা নিছক উপযোগবাদের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ, যাদের কাছে ভাল-মন্দের সর্বোচ্চ মাপকাঠি হচ্ছে একমাত্র বস্তুবাদী সাফল্য।

"পশ্চিমের সামাজিক জীবনে বর্তমানে যেই নিগূঢ় পরিবর্তন ঘটছে তাতে দিনের পর দিন উপযোগবাদী নীতিবোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারিগরী যোগ্যতা, দেশাত্মবোধ, জাতীয়বাদী দলীয় বোধের মত বস্তুবাদী সমাজ কল্যাণের সাথে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্ট সকল দিককে দেয়া হচ্ছে উচ্চ মর্যাদা এবং কখনো কখনো তার মূল্য অহেতুক অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে; সন্তান বাৎসল্য বা দাম্পত্য জীবনের বিশ্বস্ততার মত যেসব গুণকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত নিছক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হতো সে সবের গুরুত্ব দ্রুত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। কারণ সমাজের ওপর সেসবের নির্দিষ্ট বস্তুবাদী কল্যাণ দেখা যাচ্ছে না। শ্রেণী বা গোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য বলিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধনের চূড়ান্ত প্রয়োজন অনুভূত হতো যে যুগে, আধুনিক পাশ্চাত্যে তার স্থান অধিকার করেছে ব্যাপকতরো শিরোনামযুক্ত এক নতুন সমাজ সংহতির যুগ। যে সমাজ অপরিহার্যরূপে শিল্প বিজ্ঞান প্রভাবিত এবং যা দ্রুত ক্রমবর্ধমান গতিতে স্রেফ যান্ত্রিক ধারায় গড়ে উঠছে, সেখানে পিতার প্রতি পুত্রের আচরণের কোন বিশেষ সামাজিক গুরুত্ব থাকতে পারে না, যতক্ষণ ব্যক্তি বিশেষ তার আচরণে পারস্পরিক সংযোগ সম্পর্কে সমাজের নির্ধারিত সাধারণ শালীনতার সীমার মধ্যে থেকে কাজ করে। ফলে পাশ্চাত্যের পিতা প্রতিদিন পুত্রের ওপর তার কর্তৃত্ব ক্রমাগত হারিয়ে ফেলছে এবং সম্পূর্ণ ন্যায়সংগতভাবে পুত্র পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হারাচ্ছে। যে যান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত প্রবণতা রয়েছে ব্যক্তি বিশেষের ওপর অপরের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা লোপ করার, তার বিধান তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ধীরে ধীরে প্রাধান্য বিস্তার করছে এবং

প্রকৃতপক্ষে তাকে অচল করে দিচ্ছে। কারণ উপরিউক্ত ধারণার ন্যায়সঙ্গত বিকাশের খাতিরে পারিবারিক সম্পর্কের সুযোগ-সুবিধাও লোপ পেতে বাধ্য।"[1]

## হীনমন্যতা

মুসলিম প্রাচ্যে মানুষের উন্নতি-অগ্রগতি ও চরমোৎকর্ষের মান ছিল খুবই উন্নত। এজন্য দীন ও দুনিয়া এবং ইলম ও আমলের সমন্বয়ে বহুবিধ মানবীয় গুণ দ্বারা ভূষিত এবং মানবীয় উৎকর্ষ এমন বহু বিক্ষিপ্ত শাখা-প্রশাখার সম্মিলন অনিবার্য ছিল যার মধ্যে এ যুগের হীনমন্যতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টি পরস্পরবিরোধী মনে করে থাকে এবং কোন মানুষের মধ্যে একই সময় এসব গুণের যে সমাবেশ ঘটতে পারে তা কল্পনা করতেও অধিকাংশ অক্ষম। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে কেবল ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম রাজা-বাদশাহ, তাদের উযীর-নাযীর ও আমীর-উমারার জীবন-চরিতের ওপরই দৃষ্টিক্ষেপণ করুন। আপনি দেখবেন বুলন্দ হিম্মতি, উন্নত মনোবল, চরমোৎকর্ষ ও নিত্য-নতুন বৈশিষ্ট্য, রাজকীয় পোশাকের নিচে দরবেশী আলখাল্লা, রাজনৈতিক অভিযান মগ্নতার সঙ্গেই ইবাদত-বন্দেগীতেও মশগুল ও তৎপর, সেই সাথে লেখাপড়া ও জ্ঞান চর্চার এমন সব দুর্লভ নমুনা মিলবে যার নজীর সাধারণ মানব ইতিহাসে মেলা ভার এবং যার সত্যতা এ যুগের সংকীর্ণ মানসিকতা ও মানবীয় উন্নতি ও চরমোৎকর্ষ সম্পর্কে সীমিত ধারণা বিশ্বাস করতে বারবার পীড়া অনুভব করবে।

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও এর রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও রাজনীতি বিষয়ক ব্যস্ততার অবস্থা ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই জানা। কিন্তু এই সাথে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে, তাঁর ইন্তিজামী ব্যস্ততা, রাজকীয় প্রয়োজন, এর চাহিদা ও দাবি এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ভ্রমণের আধিক্য তাঁর ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা ও নিয়মিত আমলসমূহ পালনের ক্ষেত্রে এতটুকু ব্যত্যয় সৃষ্টি করতে পারে নি। হযরত কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী(র) ইনতিকালের সময় ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন, আমার জানাযা তিনি পড়াবেন যাঁর আসরের সুন্নত ও তকবীরে উলা কখনো ফওত হয়নি। অতঃপর এই ওসিয়ত ঘোষিত হলে সুলতান স্বয়ং সম্মুখে অগ্রসর হন এবং তাঁর জানাযা পড়ান।

1. Islam at the Crossroads, the tragedy of Europe, (অনুবাদ 'সংঘাতের মুখে ইসলাম' নামক পুস্তক থেকে গৃহীত, পৃ. ৩১, ইফাবা প্রকাশিত, তৃতীয় মুদ্রণ। অনুবাদঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ।



সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন, নাসিরুদ্দীন মাহমূদ, ফীরোয শাহ তুগলক প্রমুখের ধর্মীয় জীবন ও মযহাবী আনুগত্যের অবস্থা সম্পর্কে সকলেই অবগত। গুজরাটের সুলতানগণ, বিশেষভাবে দীন ও দুনিয়ার সমন্বয়কারী এবং এক একজন বাহ্যত প্রভাবশালী শাসক হলেও স্বভাবগতভাবে যুগের "জুনায়দ বাগদাদী" তুল্য দরবেশ ছিলেন। মাহমুদ শাহ ১ম ও তদীয় পুত্র সুলতান মুজাফফর শাহ হালীম-এর জীবন কাহিনী এর সর্বোত্তম সাক্ষ্য। ভারতীয় ঐতিহাসিক মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আবদুল হাই(র) মুজাফফর শাহ হালীম-এর জীবন কাহিনী লিখতে গিয়ে তদীয় "ইয়াদে আয়্যাম" নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

"মাহমুদ শাহ্‌র পর তদীয় উপযুক্ত সন্তান মুজাফফর শাহ হালীম পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার ক্ষেত্রে তিনি আল্লামা মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ এলায়েজীর শাগরিদ ছিলেন এবং হাদীস পড়েছিলেন আল্লামা জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন ওমর বাহরুকের কাছে। তিনি এমন বয়সে কুরআন মজীদ হেফজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন যেই বয়স সম্পর্কে শেখ সাদী বলেন ঃ

درایام جوانی چناں کہ افتد دانی

"এই ইলমী যোগ্যতার সাথে তাকওয়া ও আযীমতরূপ সম্পদও তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ করেছিলেন। গোটা জীবনটাই কুরআন ও হাদীসের ওপর আমল করেছেন। সব সময় ওযূ অবস্থায় থাকতেন। জামাআতের সাথে সালাত আদায় করতেন। সমগ্র জীবনে একদিনের জন্যেও সিয়াম পরিত্যাগ করেন নি। কখনো মদ স্পর্শ করেন নি, কখনো কারোর প্রতি অহেতুক কঠোরতা প্রদর্শন করেন নি। অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করে কখনো নিজের মুখ কলুষিত করেন নি। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, পবিত্রতার এই প্রতিমূর্তির মধ্যে সৈনিকসুলভ গুণাবলী ও রাজ্য পরিচালনার কুশলতার সর্বোত্তম মাত্রায় সমন্বয় ঘটেছিল। মালব বিজয়ের কাহিনী ইতিহাসে পাঠ করুন। এ থেকেই তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব পরিমাপ করুন। যে সময় মালবের সুলতান মাহমুদ শাহ্‌র অলসতা ও ভুল ব্যবস্থাপনার দরুন তদীয় মন্ত্রী মন্দলে রায় রাজ্যভার নিজের হাতে তুলে নেন এবং মাহমুদ শাহকে উৎখাত করে রাজ্য থেকে ইসলামের যাবতীয় নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করে পৌত্তলিক প্রথার প্রচলন ঘটাতে সচেষ্ট হন, তখন মুজাফফর শাহ হালীমের ইসলামী মর্যাদাবোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তিনি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মালব অভিমুখে যাত্রা করেন এবং মাণ্ডো পৌঁছে তা অবরোধ করেন। মন্দলে রায় সে একা এই বাহিনীর মুকাবিলা করতে পারবে না ভেবে রানা সংঘকে মূল্যবান উপহার-উপঢৌকনের প্রলোভন দিয়ে তাকে সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠান। রানা সংঘ তখনো সারেঙ্গপুর অবধি পৌঁছে নি, ওদিকে সুলতান মুজাফফর শাহ হালীম

তাকে সৌজন্য প্রদর্শনের উদ্দেশে ফৌজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আগেই পাঠিয়ে দেন। ফলে রানা সংঘ আর সামনে অগ্রসর হতে সাহস পায় নি। এদিকে মন্দলে রায় চতুর্দিক থেকে সামরিক সাহায্য পাবার পূর্বেই সুলতান দুর্গ দখল করে নেন।

"অতঃপর দুর্গ দখলের পর যেই মুহূর্তে সুলতান মুজাফফর শাহ্ হালীম দুর্গের ভেতর প্রবেশ করেন এবং সঙ্গী আমীর-উমারা সুলতান সমভিব্যাহারে মালব সুলতানের রাজকীয় শোভা-সমৃদ্ধি, রাজকোষ ও গুপ্ত ধনভাণ্ডার পরিদর্শন করেন এবং রাজ্যের সমৃদ্ধি সম্পর্কে অবহিত হন, তখন তারা সাহস করে সুলতান মুজাফফর শাহ্ সমীপে নিবেদন করেন, এই যুদ্ধে প্রায় দু'হাজার বীর সেনানী আমাদের শাহাদত লাভ করেছে। এত বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির পর এই দেশ আবার সেই সুলতানকে প্রত্যর্পণ করা সমীচীন নয় যাঁর ভ্রান্ত ব্যবস্থাপনার দরুন মন্দলে রায় এই রাজ্য দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। সুলতান মুজাফফর শাহ একথা শুনতেই পরিদর্শনে সেখানেই ক্ষান্ত দেন এবং দুর্গের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে মাহ্মুদ শাহকে বললেন, আমার সঙ্গী-সাথীদের কাউকেই আর দুর্গের ভেতর যেতে দেবেন না। মাহমুদ শাহ্ অনেক পীড়াপীড়ি করলেন এবং আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন, সুলতান কয়েকটা দিন দুর্গের ভেতর বিশ্রাম করুন। কিন্তু সুলতান মুজাফফর তাঁর এই অনুরোধ কবুল করেন নি। তিনি পরে নিজেই এই রহস্য প্রকাশ করেছিলেন, আমি এই জিহাদ কেবল আল্লাহ্র রেযামন্দী হাসিলের জন্যই করেছিলাম। কিন্তু আমীর-উমারার প্রকাশিত বক্তব্য থেকে আমার আশংকা হলো, আল্লাহ না করুন, কোন খারাপ নিয়ত আমার দিলে সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আমার নিয়তের সততা ও ইখলাস নষ্ট না হয়ে যায়। আমি সুলতান মাহমুদের ওপর কোন অনুগ্রহ করিনি, বরং মাহমুদই আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। ফলে তাঁর কারণেই এই (জিহাদে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে) মহামূল্যবান সৌভাগ্য লাভ হলো।

"ইনতিকালের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসতেই সুলতান উলামায়ে কিরাম ও সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গের এক মজলিসে নে'মতের শুকরিয়া হিসেবে বলেছিলেন, আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ ও কৃপায় আমি কুরআন হেফ্জ করার সাথে সাথে প্রতিটি আয়াত সংশ্লিষ্ট জরুরী মসলা-মাসাইল, হুকুম-আহকাম, শানে নযূল ও তাজবীদ সংক্রান্ত মূলনীতির ইল্ম হাসিল করি। স্বীয় উস্তাদ আল্লামা জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ওমর বাহরূক থেকে যেসব হাদীসের সনদ নিয়েছি সেসব হাদীস সনদ ও মতন (মূল পাঠ ও এর বর্ণনাসূত্র) বর্ণনাকারী রাবীদের হালতসহ আমার মুখস্থ আছে। আল্লাহ্র ফযলে ফিক্হ বিষয়ে আমার সেই জ্ঞান আছে যেই জ্ঞান



সম্পর্কে হাদীস পাকে বর্ণিত من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين "আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দীনের সমঝ (ফিক্হ) তথা জ্ঞান দান করেন। তাকে ফকীহ্ বানিয়ে দেন।" আর বর্তমানে কয়েক মাস থেকে সূফিয়ায়ে কেরাম ও মাশায়েখে ইজামের তরীকায় আত্মশুদ্ধির সাধনায় (তাযকিয়ায়ে নফ্স) মশগুল এবং من تشبه بقوم فهو منهم (যে যেই কওম বা সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অনুসরণ করবে সে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হবে)-এর ভিত্তিতে তাঁদের বরকত লাভের ব্যাপারেও আশাবাদী। আল্লামা বাগাবীর তফসীর 'মাআলিমু'ত-তানযীল' একবার খতম করেছি। এরপর দ্বিতীয়বার শুরু করেছি। অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছে গেছি। বাকীটুকু আশা করছি, ইনশাআল্লাহ জান্নাতে গিয়ে শেষ করব।

"জুমুআর নামাযের নিকটবর্তী হতে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। তিনি উপস্থিত লোকদের মসজিদে যাবার হুকুম করলেন এবং নিজে জোহর সালাত আদায় করলেন এবং বললেন ঃ সালাতুজ্জোহর তোমাদের এখানে আদায় করলাম, আসর আল্লাহ্ চাহেত জান্নাতে গিয়ে আদায় করব। ইনতিকালের সময় তাঁর যবানে হযরত ইউসুফ আলায়হি'স -সালামের এই দোআ উচ্চারিত হচ্ছিল যা ছিল স্বয়ং সুলতানের নিজের অবস্থারই প্রতিচ্ছবি ঃ

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الاَحَادِيْثِ ج فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قف اَنْتَ وَلِيٌّ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ج تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ -

"হে আমার রব! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ। হে আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত কর।" (সূরা ইউসুফ, ১০১ আয়াত)

শের শাহ সূরীর (মৃ. ৮৫২ হি.) সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মিত আমলসমূহের তালিকাসূচী যা ঐতিহাসিকগণ তাদের ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, দেখা যেতে পারে। এ যুগের একজন মধ্যম শ্রেণীর ব্যস্ত মানুষের পক্ষেও যেখানে এই সময়সূচী অনুসরণ করা কঠিন সেখানে এরকম একজন ব্যস্ত-সমস্ত বাদশাহ্র পক্ষে যাঁকে মাত্র পাঁচ বছরের স্বল্পতম মুদ্দতে শত বছরের কাজ করতে হবে এবং বাহ্যত যাঁকে আপন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যস্ততা এক মুহূর্তের জন্যও অবকাশ দিতে প্রস্তুত ছিল না, দেওয়া সম্ভবও ছিল না —এটা কারামতই বলতে হবে।

"শের শাহ রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতেই ঘুম থেকে জেগে যেতেন। এরপর তিনি গোসল করতেন এবং নফল পড়তেন। ফজর নামাযের পূর্বেই নিয়মিত ওজীফা ও তসবীহসমূহ আদায় শেষ করতেন। এরপর বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভাগের হিসাবাদি দেখতেন এবং দিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পর্কে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করতেন এবং রোজকার করণীয় কাজ সম্পর্কে বলে দিতেন যাতে দিনের বেলা নানাবিধ প্রশ্ন তাঁকে পীড়িত না করে। এই সব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সালাতুল ফজরের জন্য ওযূ করতেন এবং জামাআতের সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করতেন। অতঃপর যিকির-আযকার ও বিভিন্ন ওজীফা আদায়ের মধ্যে মশগুল হয়ে যেতেন। ইতোমধ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সম্রাটকে সালাম দেবার জন্য হাযির হতেন। সম্রাট সালাতুল ইশরাক থেকে ফারেগ হয়ে আগত লোকদের কার কি প্রয়োজন জেনে নিতেন এবং ঘোড়া, এলাকা কিংবা জায়গীর ও ধন-সম্পদ যার যেমন প্রয়োজন পড়ত দিতেন। অতঃপর মামলা-মোকদ্দমার বাদী-বিবাদীর দিকে মনোযোগ দিতেন, উপস্থিত অভিযোগের প্রতিকার করতেন এবং তাদের অভাব পূরণ করতেন। এরপর শাহী ফৌজ ও অস্ত্রশস্ত্র পরিদর্শন করতেন এবং ফৌজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীর যোগ্যতা পরিমাপপূর্বক যোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ দানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর রাষ্ট্রের দৈনন্দিন আমদানী ও অর্থ পরিদর্শন করতেন। এরপর সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্যবর্গ, আমীর-উমারা, রাষ্ট্রদূত ও আইনজীবিগণ হাযির হতেন। সম্রাট তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। এরপর প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দের আর্জি পেশ করা হত। তিনি তা শুনতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ লেখাতেন। এরপর দুপুরের খানা খেতেন। উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখ দস্তরখানে তাঁর সঙ্গে শরীক হতেন। এরপর জোহরের সালাত পর্যন্ত দু'ঘন্টা তিনি ব্যক্তিগত কাজকর্ম করতেন এবং খাবারের পর সামান্য বিশ্রাম (কায়লূলা) করতেন। অতঃপর জামা'আতের সঙ্গে জোহরের সালাত আদায় করতেন। এরপর কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন। এর থেকে মুক্ত হয়ে তিনি পুনরায় রাষ্ট্রীয় কাজে মশগুল হয়ে যেতেন। ঘরে কিংবা বাইরে যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, এই নিয়মের কোন ব্যত্যয় হতো না। তিনি বলতেন, বড় মানুষ তো তিনি যিনি তাঁর গোটা সময় জরুরী ও প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করেন।"

সম্রাট আওরঙ্গযীব আলমগীরের বিস্তারিত জীবন-ইতিহাস পাঠ করলে জানতে পারবেন, এই দুনিয়াদার বাদশাহ যিনি কাবুল ও কান্দাহার থেকে নিয়ে সুদূর দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে রাজ্য পরিচালনা করতেন এবং এই সমগ্র বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্বয়ং দেখাশোনা করতেন, তত্ত্বাবধান করতেন, তিনি তাঁর বুলন্দ



হিম্মত ও অটুট ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে এতটা সময় বের করে নিতেন যে, তামাম রাষ্ট্রীয় ব্যস্ততা সত্ত্বেও আওয়াল ওয়াক্তেই তিনি জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করতেন। জুমুআর সালাত জামে মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন। সুন্নত ও নফলের পাবন্দী করতেন। ভীষণ গ্রীষ্মেও তিনি রমযানের পুরো রোযাই রাখতেন এবং রাত্রে তারাবীহ পড়তেন। রমযানের শেষ দশকে মসজিদে ই'তিকাফ করতেন। সোমবার, বৃহস্পতিবার ও জুমুআর দিন নিয়মিত সিয়াম পালন করতেন। সর্বদাই ওযূ অবস্থায় থাকতেন। যিকর-আযকার ও দো'আ মাছূরার পাবন্দ ছিলেন। প্রতিদিন সকালে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন এবং শতাধিক রকমের রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যস্ততা ও বিক্ষিপ্ত তবিয়ত সত্ত্বেও এমন পরিপূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র)-র পৌত্র হযরত খাজা সায়ফুদ্দীন থেকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন যে, তিনি অর্থাৎ খাজা সায়ফুদ্দীন তদীয় পিতা খাজা মুহাম্মদ মা'সূম (র)-কে সম্রাটের মধ্যে যিকরে ইলাহীর আছর জাহির হবার কথা লিখে জানান। দৈনন্দিন ব্যস্ততা সত্ত্বেও আরও এতটা সময় তিনি বের করে নিতেন যাতে করে 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি' নামক সুপ্রসিদ্ধ ফতওয়ার কিতাব সংকলনের কাজে যা তাঁর নির্দেশে সে যুগের উলামায়ে কেরাম সংকলিত ও বিন্যস্ত করছিলেন, সময় দিতে পারেন। প্রতিদিন সংকলনের কাজ যতদূর অগ্রসর হতো তিনি সেটুকু শুনতেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করতেন।

সম্রাট আলমগীরের সিংহাসন আরোহণের কাল কতটা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ও ঝটিকাসংকুল ছিল ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই তা জানা। এ যুগেই তাঁকে সাম্রাজ্যের আমূল পুনর্গঠন করতে হয়। উত্থিত ফেতনা তাঁকে দমন করতে হয়। কিন্তু এটা সম্রাট আলমগীরেরই অদম্য মনোবল ও অটুট ইচ্ছাশক্তির পরিচায়ক ছিল যে, তিনি এরূপ উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ যুগেও যখন তাঁর মাথা তোলার অবকাশ ছিল না তখন তিনি কুরআন মজীদ হেফ্জ করবার জন্য সময় বের করেছিলেন এবং তদীয় "হাদীসে আরবাঈন"-এর ভাষ্য লিখেছিলেন। আলমগীরেরই একটি স্বরচিত কবিতা এরূপ ঃ

غم عالم فراواں است ومن یک غنچه دل دارم
چناں درشیشه ساعت کنم ریگ بیابان را

'কিন্তু তিনি এই شیشه ساعت-এর মধ্যে যেভাবে ریگ بیابان বন্ধ করেছেন তা তাঁর উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকেই পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত।

আমীর-উমারা ও উযীরদের মধ্যে দেখলে আপনি আবদুর রহীম বৈরাম খান খানান, জুমলাতু'ল মালিক সা'দুল্লাহ খান আল্লামী, মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন

মুহাম্মদ এলায়েজী, ইখতিয়ার খান, আফযাল খান ও মসনদে আলী আবদুল আযীয আসিফ খানের মত সর্বগুণসম্পন্ন বুযুর্গ দেখতে পাবেন। এঁদের মধ্যে কেবল দু'জনের (আবদুর রহীম খান খানান ও আসিফ খান) সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হলো।

আবদুর রহীম খান পাঠ্য কিতাব মাওলানা মুহাম্মদ আমীন ইবন জানী ও কাযী নিজামুদ্দীন বাদাখশানীর কাছে পড়েন এবং হাকীম আলী গীলানী ও আল্লামা ফতহুল্লাহ্ শীরাযী থেকেও তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হন। অতঃপর গুজরাটে অবস্থানকালে আল্লামা ওয়াজীহুদ্দীন ইবন নসরুল্লাহ গুজরাটী থেকে আরও অধিক ইল্‌ম হাসিল করেন। এসব খ্যাতনামা শিক্ষক ছাড়াও তাঁর দরবার বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের কেন্দ্র ছিল। এসব পণ্ডিতের সঙ্গে কৃত আগাগোড়া জ্ঞানগর্ভ আলোচনা দ্বারা তিনি উপকৃত হতেন, এমন কি তিনি সব ধরনের বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। জ্ঞানের অধিকাংশ শাখায় ও সাহিত্যের ময়দানে সুন্দর রুচি, সমালোচনামূলক দৃষ্টি ও চূড়ান্ত মতামত প্রদানের অধিকার রাখতেন। তিনি ভাষাবিদ ছিলেন, বিশেষত সাতটি ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল স্বীকৃত। আবদুর রাযযাক খানী "মা'আছিরু'ল-উমারা" নামক গ্রন্থে লিখেন, আরবী, ফারসী, তুর্কী ও হিন্দী ভাষায় তাঁর পরিপূর্ণ দখল ছিল। এসব ভাষায় তিনি অলংকারপূর্ণ ও ওজস্বী কণ্ঠে কথা বলতেন এবং অবলীলায় কবিতা রচনা করতেন।

জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সাথে সাথে যুদ্ধবিদ্যা ও সৈনিকবৃত্তির ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অনন্য এবং শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের ক্ষেত্রেও ছিলেন যশ ও খ্যাতির অধিকারী। গুজরাট, সিন্ধু ও দাক্ষিণাত্য বিজয় তাঁর বীরত্ব ও সুশাসনের স্মৃতিবাহী।

আচার-ব্যবহার ও দয়া-দাক্ষিণ্যের দিক দিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন, সমস্ত ঐতিহাসিক তাঁর উত্তম চরিত্র, কোমল ব্যবহার, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, বিনয় ও নম্রতার প্রশংসায় মুখর।

যদি আপনি তাঁর বদান্যতার দিকে তাকান তবে সেক্ষেত্রে সাইয়েদ গোলাম আলী বিলগিরামীর সাক্ষ্য নিন। তিনি বলেন, যদি আবদুর রহীম খানখানাঁর প্রতিদান ও পারিতোষিক দাঁড়িপাল্লার একদিকে রাখা হয় আর অন্য দিকে রাখা হয় সাফাবী বাদশাহদের প্রতিদান ও পারিতোষিক তাহলে আবদুর রহীম খান-খানাঁর পাল্লাই ভারী হবে।[১]

১. খাযানায়ে আমেরা;



লেখাপড়ার প্রতি দুর্নিবার আগ্রহ ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মগ্নতার অবস্থা ছিল এই যে, ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে বইয়ের পাতা খুলে রাখতেন যাতে পড়তে পারেন। গোসলের সময়ও কিতাব হাতে থাকত। খাদেমগণ সামনে দাঁড়িয়ে থাকত বই খুলে। গোসল করবার সাথে সাথে তাঁর বই পড়াও অব্যাহত থাকত।

ধর্মের প্রতি ঝোঁক ও স্বভাব-প্রকৃতির সামর্থ্যের অবস্থার পরিমাপ আপনি এ থেকে করতে পারবেন হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র)-র মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণের দ্বারা তিনি ধন্য ছিলেন এবং তিনি সেই সব সৌভাগ্যবানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁদেরকে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী (র) চিঠি লিখেছিলেন এবং যাঁরা তাঁর আস্থাধন্য ছিলেন। তাঁকে লিখিত মুজাদ্দিদ সাহেবের পত্রাদি থেকে তাঁর প্রতি তাঁর হৃদয়ের টান ও গভীর সম্পর্কের কথা জানা যায়।

গুজরাটের উযীর আসিফ খানের অবস্থা সম্পর্কে আপনি পড়লে দেখবেন, সামগ্রিকতা ও চরম উৎকর্ষের অন্য আরেকটি চিত্র দৃষ্টিগোচর হবে।

আসিফ খানের আসল নাম ছিল আবদুল আযীয। তিনি ছিলেন পিতা হামীদুল মুল্‌ক-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিছু কিতাব তিনি তাঁর পিতা থেকেই পাঠ করেন এবং হাদীস ও ফিক্‌হ কাযী বুরহানুদ্দীন নহরওয়ালে থেকে হাসিল করেন। দর্শনশাস্ত্রে উস্তাদ আবুল ফযল গাযারূনী ও আবুল ফযল আস্ত্রাবাদীর ছাত্র ছিলেন। লেখাপড়ার পাট চুকাবার পর শাহী দরবারে গমন করেন। বাহাদুর শাহর যুগে মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। মাহমুদ শাহর যুগে এটর্নী জেনারেল-এর পদে অধিষ্ঠিত হন। এত সব পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি পঠন-পাঠন ও জ্ঞানগত আলোচনার ধারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কায়েম রাখেন।

বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক বিপ্লবের দরুন দীর্ঘকাল তিনি মক্কা মুআজ্জমায় অবস্থান করেন। সেখানে হারামায়ন শারীফায়ন-এর উলামায়ে কিরাম ও অপরাপর শহর নগরের জ্ঞানী-গুণী তাঁর ইলমী ও আমলী যোগ্যতা, ধর্মীয় দৃঢ়তা ও মযবুতী এবং ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে গভীর মগ্নতাদৃষ্টে অত্যন্ত অভিভূত হন। সে যুগের বিখ্যাত আলেম আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী আসিফ খানের মর্যাদা ও প্রশংসায় একট স্বতন্ত্র পুস্তকই লিখেছেন এবং সম্ভবত কোন উপমহাদেশীয় আলেমের প্রশংসা বর্ণনায় একজন স্বীকৃত আরব আলেমের এটাই সর্বপ্রথম লিখিত পুস্তক যেখানে তাঁর মর্যাদাগত শ্রেষ্ঠত্ব, তাকওয়া-পরহেযগারী ও পবিত্রতার বিরাট স্তব-স্তুতি গাওয়া হয়েছে।

হারামায়ন শারীফায়ন-এর উলামায়ে কিরামের সাক্ষ্য যে, আশপাশের প্রতিবেশী, খাদেমকুল ও উচ্চ পদমর্যাদা সত্ত্বেও তাঁর মক্কা মুআজ্জমায় অবস্থানকালীন জীবন ছিল একেবারেই দরবেশসুলভ। তাহাজ্জুদ নামাযে দশ পারা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। ইবনে হাজার মক্কীর সাক্ষ্য এই যে, মক্কা মুআজ্জমায় দশ বছর অবস্থানকালীন মসজিদে হারামে তাঁর কোন জামা'আত কাযা হয়নি। মাতাফের একেবারে সামনেই ছিল তাঁর আবাস। সব সময় তাঁকে নফল সালাত, যিক্র-আযকার, তসবীহ-তাহলীল, মুরাকাবা কিংবা অধ্যয়নের মধ্যেই ডুবে থাকতে দেখা গেছে। বড় বড় কিতাবের দরস ও উলামায়ে কিরামের সঙ্গে ইলমী আলোচনা-সমালোচনা ও গবেষণার ধারা অব্যাহত থাকত। হারাম শরীফের উলামায়ে কিরাম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁর ইল্মী মাহফিলগুলোতে শরীক হতেন। সর্বোচ্চ দর্জার পাঠ্য কিতাব ও ধর্মীয় সর্বোন্নত মানের কিতাবাদির জটিল বিষয়গুলোর ওপর জ্ঞানগর্ভ ও তাত্ত্বিক আলোচনা হতো এবং এসবের ওপর গবেষণা চলত।

জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ও মর্যাদা প্রদানের অবস্থা ছিল এরূপ, ইবনে হাজার মক্কী বলেনঃ যে যুগে আসিফ খান মক্কায় এসে বসবাস করছিলেন সে সময় মক্কায় বিস্ময়কর রকমের রওনক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। উলামায়ে কিরাম ও ফুকাহায়ে ইজাম তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্যকে দুর্লভ সম্পদ মনে করতেন। জ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছিল। মক্কার লোকেরা ইল্ম হাসিলের জন্য বিরাট প্রয়াস চালিয়েছিল। চতুর্দিক থেকে ছাত্ররা ছুটে এসেছিল, তারা ইল্ম হাসিলের ওপর স্থায়ীভাবে মনোনিবেশ করেছিল এবং জ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যসমূহকে এই উদ্দেশে অনুসন্ধান চালাত যাতে সেগুলোকে আসিফ খানের সামনে পেশ করতে পারে, দৃঢ়তা জন্মাতে পারে এবং কঠিন বিষয়গুলোকে আত্মস্থ করে যাতে করে এর মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে। এসবই এই উদ্দেশে ছিল যে, তিনি জ্ঞানী-গুণীদের ওপর অনুগ্রহ ও বদান্যতার বৃত্তকে এতটা বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন যার নজীর তাঁর সমকালে বরং দীর্ঘকাল থেকেই মেলা ছিল ভার, এমন কি মক্কা মুআজ্জমার প্রতিটি অলি-গলিতে তাঁর জন্য এভাবে দুআ উচ্চারিত হতো যেভাবে হজ্জ মৌসুমে 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' আওয়াজ উত্থিত হয়।

আসিফ খানের খ্যাতি ও গুণাবলীর চর্চা এত দূর গিয়ে পৌঁছে ছিল যে, তুরস্কের সুলতান তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং মক্কার শরীফের মাধ্যমে শাহী সম্মান ও মর্যাদা সহকারে তাঁকে কনস্টান্টিনোপলে ডেকে পাঠান এবং অত্যন্ত মনোযোগ ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে ব্যাপক গুণাবলীর আধার এই গুণী মনীষীর সাথে কথা বলেন।



একজন সফর সঙ্গী, যিনি মক্কা মু'আজ্জমা থেকে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত আসিফ খানের সঙ্গে সফর করেছিলেন, বর্ণনা করেছেন, এই গোটা সফরে আসিফ খান কখনো কোন রুখসতের ওপর আমল করেন নি, বরং সর্বদাই তিনি আযীমতের ওপর আমল করেছেন যেমনটি তিনি ঘরে থাকা অবস্থায় করতেন। মিসরের শাসনকর্তা খসরু পাশা আসিফ খানের জন্য খেলাত প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণে তাঁর অপারগতা প্রকাশ করলে মিসরীয় দূত এই বলে গ্রহণ করতে পীড়াপীড়ি করেন, শাসনকর্তার সন্তুষ্টির নিমিত্ত আপনি একবারের জন্য গায়ে দিন যাতে বলা যায়, আপনি তা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আসিফ খান এই বলে আবারও তা গ্রহণে তাঁর আপত্তি জ্ঞাপন করেন, খেলাত হিসেবে প্রেরিত কুবাটি রেশমের তৈরি বিধায় কোনভাবেই আমি তা গায়ে চড়াতে পারি না।

এতে কোনই সন্দেহ নেই, সব রাজা-বাদশাহ্ই মুজাফফর শাহ হালীম কিংবা আলমগীর আওঙ্গযীব নন এবং সকল আমীর ও উযীরই আবদুর রহীম খান খানান ও আসিফ খান ছিলেন না। কিন্তু এতেও সন্দেহ নেই, মানুষের মহত্ত্ব ও উৎকর্ষের মাপকাঠি সে যুগে সাধারণভাবে অনেক উন্নত ছিল। তার বড়ত্ব ও সফলতার জন্য এমন বহু গুণ ও উৎকর্ষ অপরিহার্য ভাবা হতো যা পরবর্তীকালে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী শাসন কর্তৃত্বের যুগে মর্যাদার আবশ্যকীয় শর্তবহির্ভূত হয়ে গেছে। যে মাপকাঠি লোকের দৃষ্টির সামনে সব সময় থাকত, সাধারণ মানুষও তা আশা করত এবং হিম্মতের অধিকারী লোকেরাও নিজেদেরকে এর এতটা পাবন্দ মনে করত যে, সব সময় এর সাধ্য-সাধনা করত এবং এ ব্যাপারে অলসতা প্রদর্শনকে ক্ষমার অযোগ্য ভাবত। পার্থিব উন্নতি ও মর্যাদার উন্নত থেকে উন্নততর সিঁড়িও তাদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে দোটানা ভাব সৃষ্টি করতে পারত না। জাগতিক ও বৈষয়িক কর্মব্যস্ততার ভীড় এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্য, এমন কি সুন্নত ও নফলের মত ইবাদতের ব্যাপারেও সামান্যতম অলসতা সৃষ্টি হবার অবকাশ দিত না। আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ ও সম্পদ তাদের ভেতর দৈহিক আরাম-আয়েশ কামনা সৃষ্টি হতে দিত না। অপরাপর বিষয় ও শাখার অধঃপতনের সাথে এই উন্নত মানসিকতা ও সামগ্রিকতার মধ্যেও অবনতি দেখা দেয় এবং সেই নমুনা যা প্রতিটি যুগেই অধিক হারে দৃষ্টিগোচর হয় তা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। কিন্তু তারপরও সেই মানদণ্ড অবশিষ্ট ছিল এবং মানুষের দিল ও দিমাগ তথা মন ও মস্তিষ্কের ওপর এরই রাজত্ব ছিল। স্ব স্ব যুগের উন্নত মনোবল ও অটুট ইচ্ছাশক্তির অধিকারী লোকেরা এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবার জন্যে সচেষ্ট থাকতেন এবং এজন্য নিজেদের আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও কামনা-বাসনাকে কুরবান করতেন। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের কিছু আগের এবং এরপর ভারতবর্ষের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও জ্ঞানী-গুণী লোকদের দিকে তাকান।

আপনি মুফতী সদরুদ্দীন খান, নওয়াব কুতুবুদ্দীন খান, টুংকের শাসনকর্তা নওয়াব উযীরুদ্দৌলা মরহুম, রামপুর রাজ্যের শাসনকর্তা নওয়াব কাল্‌বে আলী খান, প্রধান সচিব মুনশী জামালুদ্দীন খান, ভুপাল রাজ্যের মন্ত্রী নওয়াব সাইয়েদ সিদ্দীক হাসান খান প্রমুখের মত সামগ্রিক গুণাবলীর অধিকারী এমন সব বুযুর্গের সাক্ষাৎ মিলবে যাঁদের মধ্যে রাজ্য ও প্রশাসন এবং জ্ঞান ও গরিমার সাথে সাথে সংসারবিরাগীর বৈরাগ্য তথা যুহ্‌দ, ইবাদতগুযারদের তৎপরতা, শিক্ষার্থীদের ন্যায় গভীর একাগ্রতা ও অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহ এবং সৈনিকদের ন্যায় স্ফূর্তির সমাবেশ ঘটেছিল এবং এ তারই পরিণতি ছিল, জীবনের আদর্শ ও মানদণ্ড সমুন্নত ছিল এবং সর্বকালে দিল্‌ ও দিমাগের ওপর আদর্শেরই রাজত্ব চলে।

পাশ্চাত্যের বস্তুগত ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ও সভ্যতা-সংস্কৃতির যুগে মানুষের জীবনের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ এবং দৃষ্টান্তমূলক কল্পনা অনেক নীচে নেমে গেছে। কেবলই ভাল খাবার, ভাল বেশ-ভূষা ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান, সমাজে সম্মানিত ও বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে পরিগণিত হওয়া এবং সমশ্রেণীর লোকদের মধ্যে সম্মান ও পদমর্যাদা লাভই জীবনের একমাত্র আদর্শে পরিণত হয়েছে। নবী-রসূলদের জীবন-চরিত আজ মানুষের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেছে। দীন ও দুনিয়ার সমন্বয়, মেধা ও জ্ঞানগত, আধ্যাত্মিক ও ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষ, হালাল রুযী উপার্জন প্রভৃতির ন্যায় গুণে গুণান্বিত লোকদের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ও প্রাধান্য লোপ পেয়েছে এবং এমন সব লোকের প্রভাব তাদের মস্তিষ্কের ওপর জেঁকে বসেছে এবং আদর্শ, নমুনা ও জীবনে সফলতা লাভের চূড়ান্ত কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দৃষ্টি ও কল্পনার সামনে পাহাড়সম দাঁড়িয়ে গেছে যারা নৈতিক চরিত্র ও মেধাগত দিক দিয়ে ত্রুটিযুক্ত এবং কীর্তিকাণ্ডের দিক দিয়ে অত্যন্ত অধঃপতিত, জ্ঞানগত উৎকর্ষ ও যথার্থ গুণাবলী থেকে মাহরূম, চারিত্রিক মানের দিক দিয়ে নীচ ও সাধারণ পর্যায়ের, নীচু শ্রেণীর মানুষ কিংবা অর্থনৈতিক জীব এবং টাকা উপার্জনের চেতনাহীন ও নিষ্প্রাণ মেশিন। দৈহিক আরাম-আয়েশপ্রিয়তা এতটা প্রাধান্য লাভ করে এবং ক্রীড়া-কৌতুক জীবনের এমন এক বিরাট অংশ জুড়ে বসে যে, ইবাদতবন্দেগী, ধর্মীয় অবধারিত কর্তব্যসমূহ পালন ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনাদির দিকে মনোনিবেশ দেবার জন্য আর কোন অবকাশ থাকেনি। এই মুহূর্তে আপনি যদি প্রগতিশীল ও সংস্কৃতিবান লোকদের সময়সূচীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহলে প্রাচীন ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক ঐসব লোকের সময়সূচী এবং বিংশ শতাব্দীর বর্তমান সময়সূচীর মধ্যে এত বিরাট ফারাক দেখতে পাবেন, মনে হবে এরা একই দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর সদস্য নন এবং এ দুয়ের মধ্যে বছরের নয়, শতাব্দীর দূরত্ব ও বিশাল সাগরের ব্যবধান রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

# জীবনের ময়দানে মুসলিম বিশ্ব

## অতীত মুসলিম নেতৃত্বের প্রভাব

পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন বিশ্ব দ্রুত গতিতে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং পৃথিবীর বুকে এমন কোন শক্তি ছিল না যা পতনোন্মুখ মানবতাকে হাত ধরে বাঁচাতে পারে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব পৃথিবীকে এমন একটি দলের নেতৃত্ব প্রদান করে যাঁরা ছিলেন আসমানী গ্রন্থ ও একটি শরীয়ত ও বিধানের মালিক, যাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহ-প্রদত্ত রৌশনীর আলোকে পরিচালিত হতো, যাঁরা দুনিয়ার বুকে হক ও ইনসাফের পতাকাবাহী ছিলেন, যাঁরা রাজত্ব ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন নবুওত ও রিসালতের সুদৃঢ় নৈতিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আত্মশুদ্ধি লাভের পর, যাঁরা কোন জাতির খেদমতগুযার এবং কোন বংশ ও দেশের প্রতিনিধি ছিলেন না, যাঁদেরকে ভারসাম্যময় মেযাজ ও উপযোগী স্বভাব-প্রকৃতি দান করা হয়েছিল। এই দলের অস্তিত্ব মানব জাতির সার্বিক ধ্বংসের রাস্তায় তাৎক্ষণিক প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দেয় এবং ক্রমান্বয়ে মানবতাকে কয়েক শতাব্দীর জন্য সেই সব ফেতনা-ফাসাদ ও সমূহ বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেয় যা বিশ্বের বুকে ছেয়ে ছিল। সে মানুষকে সাথে নিয়ে সহীহ মনযিলের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। তাঁদের শাসনামলে মানুষ সমান্তরাল গতিতে উন্নতি করে এবং মানুষের সর্বপ্রকার প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন শক্তি একই রূপ ইচ্ছা-অভিপ্রায় ও সৌষ্ঠবসহকারে ক্রমোন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে এবং এমন এক পরিবেশ কায়েম হয় যেখানে মানুষের জন্য খুব সহজেই আপন পরিপূর্ণতায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়।

এই দলটির প্রভাবে জীবনের ধারা ও পৃথিবীর গতিপথ পাল্টে যায়। বিপুল বিস্তৃত আকারের আত্মহত্যা এবং বিশ্বব্যাপী গতিধারা আল্লাহ-বিস্মৃতি ও আত্মবিস্মৃতির দিক থেকে সর্বব্যাপী আল্লাহ-পরস্তী ও আত্মপরিচিতির দিকে বদলে যায়। মানুষের মেযাজ, বোধ-বুদ্ধি ও দিল্‌ যায় পাল্টে। ভ্রান্ত নৈতিক মূল্যবোধ ও মিথ্যা পরিমাপের পরিবর্তন ঘটে। উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শ মানদণ্ড হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে। জীবন-যিন্দেগী ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিমিত্ত নির্ভেজাল

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষামালা তুলাদণ্ডের মর্যাদা লাভ করে। এই সভ্যতার যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের সাথে নৈতিক চরিত্র ও প্রকৃষ্টতারও উত্থান ঘটে এবং বিজয়ের বিস্তৃতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতারও একইভাবে বিস্তার ঘটে। ধর্মীয় সম্বন্ধ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ঐক্য এবং সমঝোতা-সম্প্রীতি ও প্রেমপ্রীতি পৃথিবীটাকে সাক্ষাত বেহেশ্‌তে পরিণত করে যেখানে পারস্পরিক শক্তি পরীক্ষা ও লড়াই-ঝগড়া ছিল না। খোদাপরস্তী ও পাক-পবিত্রতার রাস্তা যা জাহিলিয়াত যুগে কাঁটায় ভর্তি ছিল এবং দীর্ঘকাল থেকে নির্জন ও জনশূন্য অবস্থায় পড়েছিল, বিপদমুক্ত রাজপথে পরিণত হয় যেই পথের ওপর দিয়ে কাফেলা নির্ভয়ে পথ চলত। আল্লাহ্‌র আনুগত্য যা প্রথমে মুশকিল ছিল এখন তা সহজ এবং নাফরমানী যা প্রথমে সহজ ছিল এখন তা কঠিন হয়ে গেল। দীনের প্রতি দাওয়াতের মধ্যে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ এবং নৈতিক প্রশিক্ষণ ও সংস্কার-সংশোধনের মধ্যে ক্রেনের শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায় যা লক্ষ কোটি মানুষকে পশু জীবন ও চারিত্রিক অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচিয়ে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছিয়ে দেয়। মানুষের মেধা, জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ ও স্বভাব-প্রকৃতির উদ্দাম গতি যা দীর্ঘকাল থেকে নষ্ট হচ্ছিল কিংবা অপাত্রে ব্যয়িত হচ্ছিল তা সঠিক দিক অবলম্বনপূর্বক পৃথিবীকে প্রকৃত উন্নতি ও অগ্রগতি দান করে। মোটকথা, মনুষ্য কাফেলা মনযিলে মকসূদের নিকটবর্তী হয় এবং এর সম্মুখ ভাগ মনযিলে পৌঁছে যায়।

### পাশ্চাত্য নেতৃত্ব ও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

কিন্তু পেছনের মুসাফির মনযিলে পৌঁছুবার পূর্বেই হঠাৎ কাফেলা থেমে গেল। মনে হলো, কাফেলার নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটেছে। কাফেলার সালারকে এজন্যই নেতৃত্ব হারাতে হয়, তিনি কাফেলার নিরাপত্তার পরিপূর্ণ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে করেন নি।[১] এক অপরিচিত মুসাফির[২] যাকে কাফেলার কেউ চিনত না, জানত না, তলোয়ারের জোরে ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নেতৃত্বের বাগডোর হাতে তুলে নিল।

নতুন দলপতি এই অসহায় মনুষ্য কাফেলাকে এমন এক রাস্তার দিকে নিয়ে যায় যে রাস্তা ছিল অত্যন্ত দুর্গম ও বন্ধুর, চড়াই-উৎরাইয়ে পরিপূর্ণ, দিনের বেলায়ও[৩] যেখানে রাত্রির ঘন অন্ধকার। কাফেলার যাত্রীরা যেখানে বারবার

১. মুসলমানদের বস্তুগত দুর্বলতা ও শক্তির উপকরণের ব্যাপারে অলসতা ও অসতর্কতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যদ্দরুন কার্যকারণ এই পৃথিবীতে শাস্তি হিসাবে তাদেরকে নেতৃত্ব হারাতে হয়।

২. পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠী;

৩. বৈদ্যুতিক আলোয়।



হোঁচট খেত, হুমড়ি খেয়ে পড়ত এবং আর্তস্বরে ফরিয়াদ জ্ঞাপন করত। কিন্তু কাফেলার অধিনায়ক শক্তির দম্ভে, নেশায় ও দ্রুত পৌঁছুবার তাগিদে কাফেলা হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এটা কোন রূপকথা নয়, বরং বাস্তব সত্য। দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বাগডোর মুসলমানদের পর পাশ্চাত্যের সেই সব জাতিগোষ্ঠী নিজেদের হাতে তুলে নেয় যাদের কাছে প্রথম থেকেই হিকমতে ইলাহীর কোন পুঁজি ও সহীহ-শুদ্ধ ইলম-এর কোন স্বচ্ছ-সুন্দর ঝর্ণাধারা ছিল না। নবূওতের আলোক-শিখা সেখানে মূলত পৌঁছেই নি, পৌঁছুতে পারেনি। হযরত ঈসা মসীহ (আ)-র শিক্ষামালার আলোক-শিখা যা সেখানে পৌঁছে ছিল তা বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যা-বিবৃতির অন্ধকার আবর্তে হারিয়ে যায়। তারা সেই আসমানী আলোর শূন্য স্থান রোম ও গ্রীসের দফতরে রক্ষিত অন্ধকার দ্বারা পূরণ করে। অজ্ঞ ও মূর্খ গ্রীস ও রোমের জাহিলী পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের উত্তরাধিকার হিসেবে হস্তগত হয় এবং বংশগতভাবে তাদের সকল প্রকৃতিগত, মেধাগত, নৈতিক ও মেযাজগত বৈশিষ্ট্যসমূহ তাদের ভেতর স্থানান্তরিত হয়। ইন্দ্রিয় পূজা, আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরত্ব, ভোগ-বিলাসপ্রবণতা, স্বদেশ নিয়ে বাড়াবাড়ি, সীমাহীন ব্যক্তিস্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা গ্রীস থেকে এবং ঈমানী দুর্বলতা, আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ, শক্তি সম্পর্কে পবিত্রতার ধারণা এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রেতাত্মা রোম থেকে স্থানান্তরিত হয়। খ্রিস্টীয় শিক্ষামালার ছিটে-ফোঁটা পুঁজিটুকু (যা সম্ভবত মূলের এক-দশমাংশও নয়) রোমান মূর্তিপূজা এবং সেন্ট পল ও সম্রাট কন্স্টান্টাইনের মুনাফিকী ডুবিয়ে দেয়। আর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকেও সেটুকু ধর্মীয় পণ্ডিতদের বিকৃতি ও মনগড়া ব্যাখ্যার ধূম্রজালের আড়ালে হারিয়ে যায়। বৈরাগ্যবাদের পাগলামী বস্তুবাদের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গির্জাধিপতিদের ভোগ-বিলাস ও দুনিয়াদারী ধর্মাধিকারীদের প্রতি মানুষের অনাস্থা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে। সরকার ও গির্জার মধ্যকার টানাটানি ও টানাপোড়েন জাতীয় মেযাজের মধ্যে বিদ্রোহ ও ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে এবং ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে। ধর্ম ও বুদ্ধিবৃত্তির রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ধর্মীয় মহলের স্থবিরতা ও স্বল্প-বুদ্ধিতা এবং গির্জাধিপতি পোপ ও পাদরীদের লোমহর্ষক জুলুম-নিপীড়ন নামেমাত্র ধর্মের বিরুদ্ধে বংশীয় ও মৌরসী শত্রুতার বীজ বপন করে। অপক্ব ও অপরিণত প্রগতিবাদীদের তাড়াহুড়া, গোড়ামি ও পক্ষপাতিত্ব ধর্মের শেষ তসমা তথা অবশেষটুকু কেটে দেয় এবং ধর্মের ছিটেফোঁটা কল্যাণটুকু থেকেও মানুষকে মাহরূম করে দেয়। শেষ পর্যন্ত সমগ্র পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীর ওপর বস্তুবাদের যুগ এসে হাযির হয় এবং গোটা

পাশ্চাত্যের ওপর আল্লাহ-বিস্মৃতি ও এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে আত্মবিস্মৃতির জগত ছেয়ে যায়। অর্থপূজা ও বিত্তপূজা ধর্মের আসন গ্রহণ করে। বস্তুবাদের নির্ভেজাল অর্থনৈতিক ওয়াহদাতুল ওজূদের দর্শন জন্ম দেয় যার শ্লোগান হলো–

لا اله الا الخبز لاموجود الا البطن "(ভাত) রুটি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং পেট ব্যতিরেকে আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।"

অন্যদিকে জীবনের সঠিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মিশন ও বিশ্বজয়ী কোন পয়গাম না থাকায় আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হয়, পরিণত হয় জাতীয় বৃত্তি ও পেশায়। জাতীয় জীবন স্থায়ী রাখবার জন্য অপর জাতির প্রতি ঘৃণা ও ভীতির আবেগ প্রকাশ পায় এবং একদিকে সমগ্র প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের মুকাবিলায় প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। অপরপক্ষে অভ্যন্তরীণ জাতীয়তার সীমারেখা গোটা পাশ্চাত্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খেলাঘরে রূপ দেয় এবং এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীর মাঝে একটি সীমারেখা টেনে দেয়। এর বাইরে যে মানুষ থাকতে পারে তার কল্পনাও করা যেত না। সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র বিশ্বকেই দাস বিক্রির এক বাজার (যেখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর কেনাবেচা হতো) এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুনিয়াটাকে কামারের চুলা বানিয়ে দেয় যেখানে সব সময় আগুনের খেলা চলে, লোহা উত্তপ্ত করে ও পিটিয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র বানানো হয়।

নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রশিক্ষণবিহীনভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের গবেষণা ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ক্রমোন্নতির ফলে শক্তি ও নীতি-নৈতিকতার মধ্যে কোনরূপ ভারসাম্য বজায় থাকে নি। মানুষ পাখীর মত বাতাসের বুকে ভর দিয়ে আকাশে উড়তে শিখেছে আর মাছের মত পানিতে সাঁতার কাটতে শিখেছে বটে, কিন্তু যমীনের বুকে মানুষের মত চলা ভুলে গেছে। লাগামহীন ও বোধহীন বিদ্যা-বুদ্ধি চোর-ডাকাতের হাতে তালা ভাঙার হাতিয়ার এবং সকল মস্তানের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর বখাটে ও অবুঝ পোলাপানের কাছে বিজ্ঞান খেলার জন্য শাণিত ও বিপজ্জনক হাতিয়ার বণ্টন করেছে যা দিয়ে সে নিজেকে যেমন ক্ষত-বিক্ষত করছে, তেমনি ক্ষত-বিক্ষত করছে নিজের ভাইকেও। অবশেষে অন্ধ ও বধির এই বিজ্ঞান পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার আকারে মানুষের হাতে আত্মহত্যার হাতিয়ার তুলে দিয়েছে।



এই সব ধর্মহীন জাতিগোষ্ঠীর রাজত্বকালে মানুষ সেই ধর্মীয় অনুভূতি থেকেও মাহরূম হতে থাকে যা অপরাপর মানবীয় অনুভূতির সঙ্গে প্রাচ্যের হাজারো বছরের জীবনে অপরিহার্য প্রয়োজন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লাহ্প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার সাধারণ রুচির স্থলে জাগতিক কামনার ব্যাধি বাসা বাঁধে। আচার-ব্যবহার, মৌলিক ও সত্যিকার মানবিক গুণাবলী ও উৎকর্ষের ক্ষেত্রে বিরাট রকমের অধঃপতন দেখা দেয়। মোটকথা, লোহা-লক্কড় ও ধাতব পদার্থের সর্বপ্রকার উন্নতি ঘটে আর মনুষ্যত্বের ঘটে সার্বিক অধঃপতন।

### বিশ্বব্যাপী জাহিলিয়াত

এ সময় এমন কোন শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠী, সম্প্রদায় কিংবা দল সাধারণ মানুষের সামনে নেই যে এ সব পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে আকীদাগত ও দৃষ্টিভঙ্গীগত মতপার্থক্য পোষণ করে এবং তাদের জাহিলী দর্শন ও বস্তুবাদী জীবন-ব্যবস্থার বিরোধী। এমন জাতি, সম্প্রদায় কিংবা দল এই মুহূর্তে না যূরোপে আছে আর না আছে এশিয়া কিংবা আফ্রিকায়। যূরোপের জার্মান হোক কিংবা এশিয়া মহাদেশের কোন জাপানী অথবা কোন ভারতীয় অধিবাসী, সকলেই এই জাহিলী দর্শন ও এই বস্তুবাদী জীবন-ব্যবস্থার সমর্থক ও ভক্ত বিশ্বাসী। আর তা না হলেও বিশ্বাসী সমর্থকে পরিণত হতে যাচ্ছে। থাকল সেই সব রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষ যা এই মুহূর্তে বিভিন্ন দর্শন কিংবা যুদ্ধের আকারে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তা শুধুই এ নিয়ে যে, এই বস্তুপূজার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে। এক জাতির পৌরুষ ও জাতীয় মর্যাদাবোধ এটা সইতে রাজী নয়, অন্য জাতি দীর্ঘকাল ধরে দুনিয়ার বুকে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকবে, জীবন-সমস্যা ও সমূহ কল্যাণ থেকে ফায়দা লুটবে এবং বিশ্বের বাজার ও নয়া নয়া উপনিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ জাঁকিয়ে বসবে, অথচ শক্তি-সামর্থ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি ও যোগ্যতার দিক দিয়ে সে কারুর পেছনে নয় কিংবা কারুর চেয়ে কম নয়। থাকল এই যে, সে স্বয়ং অপর কোন মনযিলের দিকে অগ্রসর হতে এবং অন্য জাতিগোষ্ঠীগুলোকে নিয়ে যেতে চায়, পৃথিবীর বুকে ন্যায়নীতি, শান্তি ও ইনসাফ কায়েম করতে চায় এবং দুনিয়ার গতিমুখ ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদিতার দিকে থেকে ঘুরিয়ে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিকে, চরিত্রহীনতা থেকে আখলাক-চরিত্রের দিকে এবং নফস-পরস্তী ও শয়তান পূজার দিক থেকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর দিকে পাল্টে দিতে চায়। তা এই গরীব এর দাবিদার যেমন নয়, তেমনি কখনো এর আকাঙ্ক্ষীও নয়।

### সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও পুঁজিবাদী পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য

এখন থাকল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, যার জীবন-দর্শন যদিও দৃশ্যত বর্তমান পাশ্চাত্য জাতিগুলো থেকে পৃথক মনে হয়, তা জাহিলী পাশ্চাত্য সভ্যতার এমন এক ফল যা পেকে গেছে। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকুই, সে মুনাফেকী, ভণ্ডামি ও প্রতারণার মুখোশ তার মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং যে দর্শন, নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে পশ্চিমা জাতিগুলোর চিন্তাবিদ, লেখক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদরা শতাব্দীকাল থেকে লিখছে এবং ঐ সব জাতি সেগুলো মনেপ্রাণে মানছে সেই দর্শন এবং ঐ সব নীতি ও আদর্শ রাশিয়া একবার সাহস করে নিজেদের দেশে বাস্তবায়িত করেছে এবং কার্যত তা করে দেখিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক নেতারা এ গতিতে সন্তুষ্ট ছিল না যে গতিতে য়ূরোপীয় জাতিগোষ্ঠী ধর্মদ্রোহিতা, ধর্মহীনতা, বল্গাহীন স্বাধীনতা ও পাশবিক বস্তুবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তারা দ্রুতগতিতে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু করে এবং সেই মনযিলে পৌঁছে এখন তারা দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি নিজেদের হাতে তুলে নিতে চাচ্ছে এবং বিশ্বের অপরাপর জাতিগুলোকেও তারা সেই মনযিলে নিয়ে যেতে চাচ্ছে যেই মনযিলে তারা পৌঁছে গেছে।[১]

### এশীয় ও প্রাচ্যের জাতিগোষ্ঠীসমূহ

এশীয় ও প্রাচ্যের জাতিগুলো ও বিভিন্ন সাম্রাজ্য বিভিন্ন গতিতে সভ্যতা ও রাজনীতির সেই মনযিলের দিকে ধাবমান যার ওপর তারা পাশ্চাত্যের জাতিগুলোকে দূর থেকে দেখছে। তারা সভ্যতা-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও সামাজিকতার সেই নীতিমালা ও দর্শন এবং জীবন ও জগত সম্পর্কে সেই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে যাচ্ছে যা ঐসব পশ্চিমা জাতিগুলোর পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্নে পরিণত হয়েছে। তাদের লোকদের জীবনাদর্শ পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠীগুলোর লোকদের থেকে খুব একটা বেশি ভিন্নতর নয়। কেবল এতটুকু ভিন্ন, তারা রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতিপূজার ওপর ভিত্তি করে বিদেশী হুকুমতের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মানতে এখন আর রাজী নয় এবং তারা এটা চায় না, পাশ্চাত্য জাতিগুলোর বড় বড় সাম্রাজ্য ও শাহানশাহী কায়েম থাকুক, ঐ সব বিজয়ী জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তির দরুন বস্তুগত লাভ ও স্বার্থ দ্বারা লাভবান হোক এবং আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ ও ভোগ-বিলাসের

১. আল্লাহর শোকর এবং তাঁর অপার কুদরতের এ এক বিস্ময়কর নিদর্শন, এই লাইনগুলো লেখার কয়েক বছর পর কল্পনার বিপরীত রাশিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং সেখানকার মুসলমানরা অনেকখানি ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং নতুন প্রজন্মের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, হজ্জ গমন ও মুসলিম দেশগুলো ভ্রমণের স্বাধীনতা পেয়েছে যে সম্পর্কে কয়েক বছর আগেও ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন ছিল। আল্লাহতাআলা এ অবস্থা কায়েম রাখুন এবং এর উন্নতি ঘটুক।



জীবন যাপন করুক। ঐসব মজলুম প্রাচ্য জাতিগোষ্ঠীর স্বয়ং নিজেদের ভূখণ্ডেই এসব ফায়দা জুটুক। মূলত ঐসব পাশ্চাত্য জাতিগোষ্ঠীর জীবন-দর্শন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের মৌলিক ও নীতিগত কোন মতপার্থক্য বা বিরোধ নেই। গোটা জাতীয়তাবাদী সাহিত্যে এর প্রতি সামান্যতম ইশারা-ইঙ্গিত পর্যন্ত পাবেন না। ঐসব প্রাচ্য ও এশীয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কেবল এ নিয়ে মতভেদ যে, এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাদের দেশে বিদেশীরা পরিচালনা করবে। তারা এতটুকু কাটছাঁট না করে এবং এর ব্যাপক ও খুঁটিনাটির মধ্যে আদৌ কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করে এই ব্যবস্থাই নিজেরাই নিজেদের দেশে চালাতে চায়। ব্যাপারটা যেন এরকম, তারা দাবার বোর্ড পাল্টাতে চায় না, কেবল খেলোয়াড়ের পরিবর্তন ঘটাতে চায়। অতঃপর তাদের মধ্যে বহু জাতিগোষ্ঠীর স্বয়ং নিজেদের প্রাচীন জাহিলিয়াত রয়েছে যা সহকারে তাদের ভেতরকার বহু জাতিই ফিরিঙ্গী জাহিলিয়াত এখতিয়ার করেছে এবং তারা যদি কখনো কিংবা যখনই ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হবে ঐ দুই জাহিলিয়াতের সর্বোত্তম উপাদান ও অংশগুলোর বাস্তবায়ন করবে।

### মুসলমান জাহিলিয়াতের মিত্র

মজার ব্যাপার হলো এই যে, জাহিলয়াতের প্রাচীন ও বংশগতসূত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান এই যুগে দুনিয়ার অনেক প্রান্তেই জাহিলিয়াতের মিত্রে পরিণত হয়েছে। তারা নিজেদের বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছে এবং দুনিয়ার কোন কোন অংশে তারা ঐ সব পাশ্চাত্য জাহিলী জাতিগোষ্ঠীর নিমিত্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে এবং দিচ্ছে। জাহিলিয়াতের এর চেয়ে বড় সাফল্য আর কী হতে পারে যে, কোন কোন মুসলিম জাতি ও সাম্রাজ্য এবং কতকগুলো মুসলিম দল ঐ সব জাতিগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যকে নিজেদের সাহায্যকারী, সমর্থক ও অভিভাবক এবং সত্য, ন্যায় ও ইনসাফের পতাকাবাহী মনে করতে শুরু করেছে, যারা এ যুগে জাহিলী আন্দোলনের নিশানবরদার এবং যারা জাহিলিয়াতের মরা লাশে জীবনের নতুন প্রাণ স্পন্দনের সঞ্চার করেছে। সাধারণ মুসলমানরা দুনিয়ার নেতৃত্ব দানের ধারণাই পরিত্যাগ করেছে এবং মুসলিম জনতার নেতা হবার পরিবর্তে জাহিলিয়াতের কাফেলার সর্দার হবার ধারণাতেই তুষ্ট এবং এতেই তারা গর্ব অনুভব করছে।

সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্যের জাহিলী নীতি-নৈতিকতা ও আচার-আচরণ এভাবে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে যেভাবে গাছের শিরা-উপশিরার মধ্যে পানি ও তারের মধ্যে বিদ্যুৎ দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ তার পরিপূর্ণ শান-শওকতের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়।

প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার অন্ধ আনুগত্য জীবনের এমন এক পিপাসা যা মেটার নয় এবং এমন এক ক্ষুধা যা দূর হবার নয়, সৃষ্টি হতে চলেছে এমন এক জাতির মধ্যে যার কাছে পারলৌকিক জীবনই আসল জীবন। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার প্রভাবে পরকালের ধারণা প্রতিদিনই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে চলেছে এবং ইহলৌকিক জীবনের গুরুত্ব ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্মান, গৌরব, গর্ব, অহংকার ও উচ্চ পদমর্যাদা লাভের প্রতিযোগিতায়, সমুন্নতি ও নেতৃত্ব লাভের প্রয়াসে উৎসাহী ও প্রগতিশীল মুসলমানেরা য়ূরোপের উন্নত লোকদের পদাংক অনুসারী। নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রের ওপর স্বার্থ ও কল্যাণ চিন্তাকে প্রাধান্য দেবার ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে এবং বস্তুপূজারী জাতিগুলোর অনুকরণে বাহ্যিক ও ফাঁকা প্রদর্শনীর বাতিক বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের গোলামী, শক্তি ও সম্পদের সামনে মস্তকাবনতি ও শাহপরস্তীর ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও এই তৌহীদবাদী ও মুজাহিদ উম্মাহ অংশীবাদী কাফের মুশরিক ও দাসসুলভ মনোবৃত্তিসম্পন্ন জাতিগুলো থেকে খুব বেশি আলাদা হিসাবে দেখতে পাওয়া যায় না।

### আশার আলোক শিখা

এসব কিছুর পরেও এবং এই ঘন ঘোর অন্ধকারেও এখানেই আশার আলোক-শিখা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। অপরাপর জাতিগোষ্ঠীসমূহ আসমানী হেদায়েত ও নবী-রসূলগণের শিক্ষামালা ও প্রজ্ঞার পুঁজি একেবারেই হারিয়ে বসেছে এবং শত শত বছর পূর্বেই তাদের কিশতী ও তাদের বক্ষের ভেতরকার এই আলো হারিয়ে গেছে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষাকারী সম্পর্কের একটি সূত্রকে কালের হাত কেটে ফেলেছে। ঐসব জাতিগোষ্ঠীর ধর্মীয় সংস্কারের ইতিহাস আমাদেরকে বলে দেয় যে, তাদের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার ও পুনর্জাগরণের আহ্বান কোন ব্যাপক ও বিস্তৃত বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারত না এবং বড় রকমের কোন পরিবর্তনও আনতে পারত না। গো-শাবকের এই মৃতদেহে কোন সামেরী ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের কোন নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পরেনি। বস্তুপূজা, সম্পদ ও শক্তি পূজা পুরোপুরিভাবেই তাদের ওপর জেঁকে বসেছে। জাহিলিয়াতের কর্তিত পোশাক একের পর আরেকটি তাদের শরীরে খাপ খেতে পারে, কিন্তু ধর্মের পোশাক এখন আর তাদের শরীরে ফিট হয় না। জাহিলিয়াতের একেবারে বিরোধী ও সমান্তরাল ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যবস্থা, সমাজ-সম্মেলন ও রাজনীতিকে তাদের শত শত বছরের গঠিত মস্তিষ্কজাত কাঠামো এখন আর কবুল করে না।

এর বিপরীতে মুসলমানদের ধর্মীয় পুঁজি, আসমানী হেদায়েত ও হেকমতের উৎস নিরাপদ ও সুরক্ষিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীরাত



তথা জীবন-চরিত ও সাহাবায়ে কিরামের জীবন ও যিন্দেগী যার ভেতর পরিপূর্ণ উম্মাহ সৃষ্টির শক্তি নিহিত রয়েছে, তাদের কাছে বিদ্যমান। এরপর ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (মুজাদ্দিদ)-দের এক অবিচ্ছিন্ন ধারা এবং সংস্কার ও বিপ্লবের ধর্মীয় দাওয়াতের এমন এক ধারাবাহিকতা রয়েছে যা এই উম্মাহকে কোন যুগেই জাহিলিয়াতের মধ্যে হারিয়ে যাবার সুযোগ দেয়নি। জাহিলিয়াতের নির্ভেজাল বস্তুবাদী ব্যবস্থা এই উম্মাহর মেধা ও মনন (যত দিন পর্যন্ত তার অবয়ব বা কাঠামো ভেঙে গোড়া থেকে নতুন করে না বানানো হয়) পুরোপুরিভাবে হযম করতে পারে না এবং মুসলমান জাহিলিয়াতের মেশিনারীর ভেতর এভাবে খাপ খেতে পারে না যেভাবে একটি ঢিলাঢালা যন্ত্র খাপ খেয়ে যায়।

### খোদায়ী দীনের পতাকাবাহী ও দুনিয়ার তত্ত্বাবধায়ক

আল্লাহ্‌র রসূল (সা) বদর প্রান্তরে বলেছিলেনঃ

اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد

"আয় আল্লাহ! আজ যদি তুমি এই ক্ষুদ্র দলটিকে ধ্বংস করে দাও তাহলে আর দুনিয়ার বুকে তোমার ইবাদত হবে না।"

মুসলমানদের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই বাস্তব সত্য আজও দিবালোকের ন্যায় অব্যাহতভাবে ভাস্বর। জাহিলিয়াত বিশ্বের জন্য যেই চিত্র লালন-পোষণ করে এবং যেই চিত্রের ওপর সে আজ দুনিয়াকে পরিচালিত করছে তার বিপরীতে যদি কোন চিত্র থেকে থাকে তবে তা কেবল মুসলমানদের কাছেই আছে, যদিও মুসলমান নিজেরাই তা ভুলে গেছে। কিন্তু এই চিত্র আজও নষ্ট হয় নি এবং কখনো তা নষ্ট হবে না, হতে পারে না। মুসলমান তার ধর্মের দিক দিয়ে দুনিয়ার ন্যায়পাল তথা তত্ত্বাবধায়ক ও খোদায়ী ফৌজদার। যেদিন সে জাগবে এবং আপন দায়িত্ব পালন করবে সেদিন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতিগুলোর জন্য হবে হিসাব-কিতাবের দিন। মুসলিম উম্মাহ্‌র ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চাপা পড়ে আছে যা কোন না কোন দিন জ্বলে উঠে জাহিলিয়াতের খড়কুটো জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে।

আল্লামা ইকবাল মরহুম এই বাস্তব সত্যকেই জাহিলী জীবন-ব্যবস্থার পতাকাবাহী ও এর নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ইবলীসের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের পরামর্শ সভায় বিশ্বের শয়তানগুলো একত্র হয়ে ঐসব সমূহ বিপদ উত্থাপন করে যা ইবলীসী জীবন-ব্যবস্থার জন্য গভীর উদ্বেগ ও পেরেশানীর কারণ এবং যেগুলোর দিকে যথাসত্বর মনোনিবেশ করা ছিল অত্যন্ত জরুরী। একজন পরামর্শক গণতন্ত্রের নাম নিল এবং একে নতুন বিশ্বের জন্য

জীবন্ত ফেতনা হিসেবে উল্লেখ করল। অপরজন সমাজতন্ত্রকেই বিরাট বিপদ হিসেবে আখ্যায়িত করল এবং তাদের সর্দার ইবলীসকে সম্বোধন করে বলল ঃ

فتنه فردا کی بیبت کایه عالم ہے که اج
کانپتے ہیں کوہسار ومرغزار وجوئبار
میرے اقا! ولاجہاں زیر وزبرہونے کوہے
جس جہاں کاہے فقط تیری سیادت پرمدار

অনাগত যুগ কাঁপে দুরু দুরু অজানা আশঙ্কায়,
হায় হায় আজ পাহাড়ে-পাথারে প্রতি নদী মোহনায়।
মনিব সে সব ওলট-পালট হওয়ার ভীষণ ভয়,
যেথায় চলিত শুধু তব রাজ সেথা হবে পরাজয়।

অধিবেশনের সভাপতি (ইবলীস) তার পরামর্শকদের ঐসব ফেতনা সম্পর্কে আশ্বস্ত করল এবং তার গভীর ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা জানাশোনার ভিত্তিতে আসল সত্য তাদের সামনে তুলে ধরল যা তাদের বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি এবং ঐসব ফেতনা নির্মূলের পথ বাত্‌লে দিল যা সে প্রথম থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

শেষে সে তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে আসল বিপদ সম্প্রর্কে বলল যার ব্যবস্থা সম্পর্কে সে ভেবে রেখেছিল। কিন্তু ভবিষ্যতের ভয়াবহতা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে তার শরীরে কাঁপন দেখা দিত এবং তার রাতের ঘুম হারাম হয়ে যেত। সে বলছে ঃ

ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تواس امت سے ہے
.......... یه کتاب الله کی تاویلات میں الجھارہے

খৎরা কিছু থাকলে আমার কেবল এই উম্মা থেকে,
পোড়া ছাইয়ের মাঝে যাহার সম্ভাবনার আগুন জ্বলে।
এখনো এই উম্মা মাঝে বিরল কিছু ব্যক্তি আছে,
চোখের জলে ওযু করে জালেম রাতের শেষের ভাগে।
তত্ত্বজ্ঞানী দিব্যজ্ঞানে দেখতে পারে পরিষ্কার,
সমাজতন্ত্র নয় কো চ্যালেঞ্জ, ইসলামেই আছে ধার।
জানি প্রবল আঁধার রাতে নেই সে মূসার উজল হাত
কিন্তু নবীর তথ্য ফাঁসে হবে মোদের বদ-বরাত।



এ যে কেমন আইন রে বাবা বাঁচায় সবায় অধিকার
নারী-পুরুষ, শ্রমিক-মজুর সকলে পায় যা পাওয়ার।
দাসত্বের যম মৃত্যুসমন, এ-আইনে সব সমান
এ আইনে ফকীর নয় কেউ, নহে কেহ রাজ খাকান।
বিত্তে কর শুদ্ধ বিমল চিত্তে করে পরিষ্কার
ধনীরে কয় 'আমীন' তুমি আমানতের যিম্মাদার।
ইহার চেয়ে বিপ্লব বড় কী-ই বা বলো হতে পারে
যমীন কেবল আল্লাহ্ তা'আলার নয় তা কোন শাহানশার
বিশ্ববাসীর চোখে গোপন থাকলে এটা চমৎকার
আল্লার ভয় খোদ মুমিনই হারিয়েছে একীন তার
দিবস রাত কাটুক এদের 'এলাহিয়াতের' ধান্ধা নিয়ে
প্রতিপাদ্য থাক এদের কুরআন ব্যাখ্যার বাছ-বিচার।

এরপর সে তার পরামর্শকদের নিম্নরূপ পরামর্শ দেয় ঃ

توڑڈالیں جس کے تکبیر یں طلسم شش جہات
ہے حقیقت جس کے دیں کی احتساب کائنات

## মুসলিম বিশ্বের পয়গাম

দুনিয়ার জন্য মুসলিম বিশ্বের কাছে এখনও নতুন পয়গাম এবং জীবনের নতুন আহ্বান আছে, আছে দাওয়াত। সেই পয়গাম যে পয়গাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দ শ' বছর আগে তাকে সোপর্দ করেছিলেন। এ এক শক্তিশালী, সুস্পষ্ট ও আলোকোজ্জ্বল পয়গাম যার চেয়ে অধিক ইনসাফপূর্ণ, সমুন্নত, শ্রেষ্ঠ ও বরকতময় পয়গাম এই সমগ্র সময় পর্বে আর কারো মুখ থেকে বিশ্ব শোনে নি।

এ হুবহু সেই পয়গাম যা শুনে মুসলমানরা মদীনা থেকে বেরিয়ে তামাম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যে পয়গাম একজন মুসলিম দূত পারস্য সাম্রাজ্যে সেই প্রশ্নের উত্তরে যে, তোমরা আমাদের দেশে কোন্ উদ্দেশে এসেছ, সংক্ষিপ্ত বাক্যে এভাবে বলেছিলেন ঃ

الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن ضيق
الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام

যে তকবীর দেয় করে দশদিকের কিস্তিমাত,
তা না বুঝুক ধার্মিকেরা না পোহাক তার অমা-রাত।
কর্মকাণ্ডের জগৎ থেকে রেখো তারে অনেক দূরে
জীবন জগত থেকে দূরে অনেক দূরে পগার পার।
মুমিন রবে গোলাম হয়ে এই তো খুব-চমৎকার।
দুনিয়ার কাজ অন্যে করুক, নশ্বর ধরায় কী কাজ তার?
তাহার তরে কাব্য-গজল তাসাওউফ বেশ মানায়
যাতে চোখে না পড়ে তার দুনিয়াদারীর ধুন্ধুমায়রা।
প্রতি পলে ভয় যে আমার উম্মাহ্ কখন উঠে জেগে–
দীনের যাহার মর্মকথা চলবে কেমনে এ সংসার।
(কারণ, সে যে খলীফা খোদার নেতৃত্বই কাজটি তার।)

অনুবাদ ঃ ইবনে সাঈদ

"আল্লাহ আমাদেরকে এজন্য পাঠিয়েছেন যেন আমরা তাঁর অভিপ্রায় মাফিক মানুষকে বান্দার গোলামী থেকে মুক্ত করে সেই ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহুর গোলামীতে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে তার প্রশস্ততার মাঝে এবং নানা ধর্মের জুলুম-নিপীড়ন ও অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্তি দিয়ে ইসলামের ন্যায় ও ইনসাফের মধ্যে দাখিল করি।"

এই পয়গামে আজও একটি হরফের পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কিংবা কমবেশি করবার প্রয়োজন নেই। আজ একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর নিমিত্ত তা তেমনি নতুন, জীবন্ত ও উপযোগী যেমন ছিল খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পৃথিবীর জন্য।

আজও মানুষ হাতে গড়া না গড়া মূর্তির সামনে তার মস্তক অবনত করছে, প্রণতিপাত করছে। আজও একক স্রষ্টার বন্দেগী অচেনা ও অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে। আজও গায়রুল্লাহ (আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছু)-র বন্দনা গীতি ও শক্তির বাজার গরম। আজও প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার মূর্তি প্রকাশ্য রাজপথে পূজিত হচ্ছে। আজও সাধু-সন্তু, রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রী-মিনিস্টার, ক্ষমতাদর্পী শাসক ও বিত্ত-সম্পদের অধিকারী পুঁজিপতি, জননায়ক অধিপতি, রাজনৈতিক দল ও তার নেতৃবৃন্দ আল্লাহ্কে ফেলে প্রভু প্রতিপালক সেজে বসে আছে। এদের জন্য আজ তেমনি নযরানা পেশ করা হচ্ছে, নৈবেদ্য সাজানো হচ্ছে, ভেট চড়ানো হচ্ছে এবং তাদের আস্তানায় তেমনি বন্দনা গীতি গাওয়া হচ্ছে যেমনটি হয়ে থাকে বাতিল দেবমূর্তিগুলোর সামনে।



আজ মনুষ্য জগত আপন ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি, সফর উপকরণের প্রাচুর্য, যাতায়াতের সহজসাধ্যতা এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে নিকট সম্পর্ক সত্ত্বেও পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে বস্তুবাদী মানুষ এই দুনিয়ার বুকে অপর কোন সত্তার স্বীকৃতি দিচ্ছে না, মানছে না এবং নিজের কল্যাণ, প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা ও আত্মপূজা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি তাঁর আদৌ আকর্ষণ নেই। স্বার্থপরতা আজ এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, বিশাল বিস্তৃত এই ভূখণ্ডে দু'জন মানুষ পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে যে জীবন যাপন করবে, এতটুকু অবকাশও তার রাখেনি। সংকীর্ণ দৃষ্টি ও দেশপূজা এমন প্রত্যেক মানুষকে যার জন্ম দেশের বাইরে, অপরাধী ভাবছে এবং তাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখছে। ফলে তার সকল গুণ ও নৈপুণ্যই অস্বীকৃত হচ্ছে এবং তাকে সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। অতঃপর এই জীবনের ছিটেফোঁটার যেটুকু ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি রয়েছে ঐসব রাজনীতিবিদ ও সরকারী লোকেরা তা আরও সংকীর্ণ করে দিয়েছে যারা জীবন-যিন্দেগী, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপায়-উপকরণ ও রুটি-রুযীর উৎস ও ভাণ্ডারের ওপর নিয়ন্ত্রণ জাঁকিয়ে বসে রয়েছে। তারা যাকে ইচ্ছা ও যার নিমিত্ত ইচ্ছা এই জীবনকে সংকীর্ণ ও দুর্বিষহ করে তোলে এবং যার জন্য চায় ব্যাপক ও বিস্তৃত করে দেয়। বড় বড় বিশাল বিস্তৃত শহর ও সবুজ শ্যামল ভূখণ্ড মানুষের জন্য বরকতশূন্য ও শ্রীহীন হয়ে গেছে এবং গোটা আবাদী ও জনবসতি নাবালক শিশু ও অবুঝ এতিমের ন্যায় অন্যের তত্ত্বাবধানে করুণা ভিখারী হয়ে জীবন যাপন করছে। মানুষের ওপর মানুষের বিশ্বাস নেই। প্রত্যেকেই একে অন্যকে সন্দেহ ও সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখছে এবং প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে। কুরআন মজীদের অলংকারিক ও অলৌকিক শব্দসমষ্টি মুতাবিক 'যমীন তার সকল বিস্তৃতি সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গেছে' এবং স্বভাব-তবিয়ত ভেতর ভেতরেই নিভতে শুরু করেছে। সভ্যতা ও সরকারের নিত্য-নতুন বেড়ি ও গোলামীর শেকল লোকের ওপর বোঝা হয়ে চেপে বসছে। প্রতিনিয়ত ট্যাক্স ও নিত্য-নতুন করভারে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের আশংকা বিরাজ করছে। বাইরের ও অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে, গোলযোগ ও অরাজকতা, ধর্মঘট, হরতাল জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে।

নিঃসন্দেহে আজও মানুষকে বিভিন্ন ধর্মের জুলুম-নিপীড়ন ও বেইনসাফী থেকে ইসলামের ন্যায় ও সুবিচারের দিকে টেনে আনার প্রয়োজন রয়েছে। এই উদার ও প্রগতির যুগেও এমন অনেক ধর্মের সাক্ষাত মেলে যেসব ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস ও শিক্ষামালা খুবই হাস্যকর যা তার অনুসারীদের নির্বোধ ও

চেতনাহীন পশুর মত জোয়ালে বেঁধে রেখেছে এবং তাদেরকে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করার অনুমতি দেয় না। এরপর এমন কিছু ধর্ম ও বিধি-ব্যবস্থাও আছে যেগুলো ধর্ম নামে কথিত হবার উপযোগী নয় বটে, কিন্তু আপন নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার আওতায়, স্বীয় অপরিসীম শক্তি ও সরকারের মধ্যে এবং আপন অনুসারীদের অন্ধ আনুগত্য ও ভক্তির আবেগাতিশয্যে প্রাচীন ধর্মগুলো থেকে কোনক্রমেই কম নয়। এগুলো সেই সব রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক দর্শন যেগুলোর ওপর আজকে মানুষ ঠিক তেমনি বিশ্বাস পোষণ করছে যেমনটি আগে বিভিন্ন ধর্ম ও জীবন-দর্শনের ওপর পোষণ করত। এগুলো হচ্ছে এ যুগের জাতীয়তাবাদ, ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্র, সমূহবাদ ইত্যাদি। এসব নতুন ধর্ম নিজেদের একচোখা নীতি, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও হৃদয়হীনতার ক্ষেত্রে প্রাচীন জাহিলী যুগের বিভিন্ন ধর্ম ও মযহাবের চাইতেও এক ডিগ্রী বেশি। কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস ও অর্থনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে দ্বিমত পোষণের শাস্তি আজ তার চেয়েও অধিক ভয়াবহ যতটা ভয়াবহ ছিল প্রাচীন যুগে কোন ধর্ম ও জীবন-দর্শনের সঙ্গে মতভেদের ক্ষেত্রে। আজ যখন কোন দল বা পার্টির কিংবা নীতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বিরোধী দলের বেঁচে থাকার অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাকে তার মতভেদ পোষণের কঠিন শাস্তি পেতে হয়। এ যুগের দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ কোন ধর্মীয় মতানৈক্যের ভিত্তিতে কিংবা কোন ধর্মীয় দল-উপদলের আন্দোলনের পরিণতিতে সংঘটিত হয়নি, বরং তা হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাত ও জাতীয় স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে। স্পেন ও চীনের গৃহযুদ্ধ যার সামনে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর খ্রিস্টান জগতের ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ এবং মধ্যযুগের গীর্জা ও রেনেসাঁর অগ্রপথিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের সংঘাত-সংঘর্ষও নিষ্প্রভ মনে হবে, তা কোন ধর্মীয় মতানৈক্যের কারণে ছিল না, বরং তা ছিল শুধুই একটি রাজনৈতিক মূলনীতি কেন্দ্রিক মতভেদ এবং ক্ষমতাভিলাষী দল-উপদলগুলোর মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ।

আজও মুসলিম বিশ্বের পয়গাম এক আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী ও একমাত্র তাঁরই আনুগত্য এবং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত নবী-রাসূলদের নবুওত ও রিসালত, বিশেষত শেষ পয়গম্বর ও শ্রেষ্ঠতম রসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-র নবুওত ও রিসালতের ওপর ঈমান আনয়ন এবং পারলৌকিক জীবনের প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত জ্ঞাপন। এই দাওয়াত কবুলের পুরস্কার ও বিনিময় হবে এই, এই বিশ্ব ঘন ঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে যেই অন্ধকারের মধ্যে সে শত শত



বছর থেকে হাত-পা ছুঁড়ছে, আলোর দিকে এসে যাবে, তারই মত মানুষের দাসত্ব ও গোলামী থেকে মুক্তি পেয়ে এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও গোলামীরূপ মহামূল্যবান নে'মত পাবে, জীবনের এই বদ্ধ কারাগার থেকে যেখানে সে শতাব্দীকাল থেকে বন্দী জীবন যাপন করছে, মুক্তি পেয়ে জীবনের উন্মুক্ত প্রান্তরে ও খোলা ময়দানে এবং দুনিয়ার উন্মুক্ত আকাশে ও মুক্ত বাতাসে পা ফেলতে পারবে, বিশ্বাসগত ও রাজনৈতিক ধর্মসমূহের নিগড় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে প্রকৃতির ধর্ম, স্বভাব-ধর্ম ও শরীয়তের ইলাহীর ন্যায় ও ইনসাফের ছায়াতলে স্থান পাবে।

এই পয়গামের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, এর শ্রেষ্ঠত্ব ও সমুন্নতি সম্পর্কে যতটা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা লাভ আজ সম্ভব হয়েছে এবং এ সম্পর্কে উপলব্ধি আজ যতখানি সহজ হয়ে গেছে এর আগে তেমনটি আর কখনো হয়নি। জাহিলিয়াত আজ জনসমক্ষে অবমানিত। এর নেকাবঢাকা গোপন চেহারা আজ সবার সামনে নগ্নভাবে উদ্ভাসিত। মানুষ আজ জীবন সম্পর্কে অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে এবং এই মুহূর্তের জাহাজের কাপ্তানদের সম্পর্কে হতাশ। দুনিয়ার নেতৃত্বের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তনের এটাই প্রকৃষ্ট সময় ও উপযোগী মুহূর্ত। এই মুহূর্তটি পর্যন্ত দুনিয়ার নেতৃত্বে যতটুকু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা এর চেয়ে বেশি ছিল না যে, যখন নৌকার মাঝি এক হাতে বৈঠা বাইতে বাইতে তার হাত ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে বৈঠা তার অন্য হাতে নেয়। এরপর সে হাত ক্লান্ত হলে আবার আগের হাতে বৈঠা ফিরিয়ে নেয়। ব্রিটেন থেকে আমেরিকা কিংবা আমেরিকা থেকে রাশিয়ার দিকে বিশ্ব নেতৃত্বের এই যে হাত বদল অথবা আন্তর্জাতিক প্রভাব ও ক্ষমতা বলয়ের এই যে পরিবর্তন এর বেশি কিছু নয়; মাঝি নৌকার বৈঠা এক হাতে থেকে অন্য হাতে নিয়েছে। এটা কাপ্তানের পরিবর্তন কিংবা জাহাজ পরিচালনার মূলনীতির পরিবর্তন অথবা সফরের দিক পরিবর্তন নয়, বরং এ তো ডান হাত বাম হাতের খেলা মাত্র!

মানুষের যাবতীয় সমস্যা ও সংকটের আজ একটাই সমাধান আর তা হলো এই, বিশ্বের নেতৃত্ব ও জীবনরূপী জাহাজের পরিচালন ভার ঐসব অপরাধী ও মানুষের রক্তে রঞ্জিত খুনীদের হাত থেকে বের করে যারা মানুষের এই কাফেলাকে ডুবিয়ে দেবার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ঐ সব আমানতদার, দায়িত্বশীল ও আল্লাহভীরু অভিজ্ঞ মানুষগুলোর হাতে তুলে দেওয়া যাদেরকে সৃষ্টির আদিতেই মানুষের এই বিশাল কাফেলা পরিচালনার জন্যই বানানো হয়েছিল। কার্যকর ও ফলপ্রসূ বিপ্লব কেবল এই, দুনিয়ার পথ প্রদর্শন ও মানুষের নেতৃত্বভার জাহিলিয়াতের শিবির থেকে, যার মধ্যে রয়েছে ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া ও তাদের পদলেহী ও তল্পীবাহী প্রাচ্য ও এশীয় জাতিগোষ্ঠীসমূহ এবং যার নেতৃত্বের বাগডোর রয়েছে আয়েশী ও বিলাসী পুঁজিবাদী ধনিক বণিক অপরাধী চক্রের

হাতে, স্থানান্তরিত হয়ে সেই উম্মাহ্র হাতে তা আসুক যার নেতৃত্ব রয়েছে মানবতার মহান নির্মাতা রহমতে আলম, সাইয়েদে বনী আদম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের হাতে এবং যাদের এই দুনিয়ার নবতর বিনির্মাণ ও মানবতার নবজাগরণের নিমিত্ত রয়েছে সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট মৌলনীতি ও শিক্ষামালা এবং যাদের ঈমান বর্তমান বিশ্বকে এই সময়কার জাহিলিয়াতের থেকে ঠিক সেভাবে বের করে আনতে পারে যেভাবে সে বের করে এনেছিল চৌদ্দ শ' বছর আগে।

**নবতর ঈমান**

কিন্তু এই মহান দায়িত্ব ও কর্ম সম্পাদনের জন্য মুসলিম বিশ্বকে আত্মপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, প্রয়োজন দেখা দেবে তার নিজের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টির। প্রথম প্রস্তুতি হবে এই, মুসলিম বিশ্ব ইসলামের ওপর নতুন ও জীবন্ত ঈমান আনবে। মুসলিম বিশ্বের জন্য নতুন ধর্ম, নতুন জীবন-দর্শন, নতুন পয়গম্বর, নতুন শরীয়ত ও নতুন তা'লীম বা শিক্ষামালার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। ইসলাম চিরশাশ্বত। সেতো সূর্যের মত, না কখনো পুরানো ছিল আর না সে এখনই পুরানো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুওত চিরস্থায়ী এবং আখেরী নবুওত। তাঁর আনীত দীন সুরক্ষিত এবং তাঁর প্রদত্ত শিক্ষামালাও জীবিত ও জীবন্ত। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই, মুসলিম বিশ্বের জন্য নতুন ঈমানের আবশ্যক। নতুন ফেতনা, নতুন শক্তি, নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রেরণা ও নতুন আহ্বান মুকাবিলা কমযোর ঈমান ও কেবল রসম-রেওয়াজ ও আচার-অভ্যাস দিয়ে করা যাবে না। কোন জরাজীর্ণ ও দশাপ্রাপ্ত প্রাসাদ নতুন সাইক্লোন ও নতুন কোন প্লাবনের ধাক্কা সইতে পারে না। অতঃপর যারা এর আহ্বায়ক হবেন, হবেন দাঈ তাদের জন্য অপরিহার্য হলো, তাকে তার আহ্বান তথা দাওয়াতের ওপর অটল ও স্থির প্রত্যয় থাকতে হবে। তার ভেতর এমন একজন মানুষের জোশ থাকবে যিনি কোন নতুন আকীদা-বিশ্বাসের ওপর নতুন ঈমান এনেছেন। এমন এক মানুষের হাসিখুশী ও আনন্দ থাকবে যিনি কোন নতুন ধনভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছেন কিংবা নতুন দেশ আবিষ্কার করেছেন। মুসলিম বিশ্ব যদি মনুষ্য জগতে নবতর রূহ ও নতুন জীবন সৃষ্টি করতে চায় এবং দুনিয়ার বর্তমানের বস্তুবাদিতা এবং সন্দেহ-সংশয় ও অস্থিরতার ওপর জয় লাভ করতে চায় তাহলে তাকে তার ভেতর নতুন ঈমানী রূহ, জীবন্ত একীন ও নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে।

**অর্থপূর্ণ প্রস্তুতি**

মুসলিম বিশ্বকে এই পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থপূর্ণ প্রস্তুতি ও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখা দেবে। প্রকাশ থাকে, মুসলিম বিশ্ব



আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ য়ূরোপের মুকাবিলা সভ্যতা-সংস্কৃতির শূন্যগর্ভ প্রদর্শনী, পাশ্চাত্য ভাষাগুলোর নৈপুণ্য ও জীবন-যিন্দেগীর সেই রঙঢঙ এখতিয়ার করে করতে পারে না, জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে সবের কোন ভূমিকা নেই। মুকাবিলা সে তার পয়গাম, সেই রূহ ও অর্থপূর্ণ শক্তির সাহায্যেই করতে পারে যেক্ষেত্রে য়ূরোপ প্রতি দিন দেউলিয়া হয়ে চলেছে। মুসলিম বিশ্ব তার প্রতিপক্ষের ওপর কেবল সেই ক্ষেত্রেই প্রাধান্য ও বিজয় লাভ করতে পারে যখন সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হবে, জীবনের প্রতি ভালবাসা যখন তার দিল থেকে বেরিয়ে যাবে, প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার শেকল থেকে মুক্ত হবে, তার লোকেরা শাহাদতের প্রতি লোভাতুর হবে, জান্নাতের প্রতি আগ্রহ তার দিলের গভীরে দোলা দিতে থাকবে, দুনিয়ার নশ্বর ধন-সম্পদ ও মালমাত্তা তার দৃষ্টিতে আদৌ কোন গুরুত্ব বহন করবে না, আল্লাহ্র রাস্তায় দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, বিপদাপদ ও বালা-মুসীবত হাসি মুখে বরদাশ্‌ত করবে। বাস্তবে এগুলোই হলো আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ ও অপরিচিতের মুকাবিলায়, যে পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাসী নয়, বরং তা অস্বীকার করে, মু'মিনের হাতিয়ার আর এটাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। আর এরই ওপর ভিত্তি করে তার থেকে আশা করা হয়েছে, তার মধ্যে সহ্য শক্তি বেশি হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَاۤءِ الْقَوْمِ ط اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ج وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَالَا يَرْجُوْنَ -

"শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা হতোদ্যম হয়ো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো তোমাদের যতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহ্র নিকট তোমরা যা আশা কর ওরা তা আশা করে না" (সূরা নিসা, ১০৪ আয়াত)।

প্রকৃত ঘটনা হলো, মুমিনের শক্তি, প্রতিপক্ষের ওপর বিজয় ও প্রাধান্য লাভের পেছনে গূঢ় রহস্য হলো, পারলৌকিক জীবনের প্রতি সুদৃঢ় প্রত্যয় ও আল্লাহ্র কাছ থেকে বিনিময় ও সওয়াব প্রাপ্তির প্রত্যাশা। যদি মুসলিম বিশ্বের সামনেও সেই সব পার্থিব ও জাগতিক উদ্দেশ্য ও বস্তুগত স্বার্থই কাঙ্ক্ষিত হয় এবং সেও যদি কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বস্তুগত উপকরণাদির কেন্দ্রজালে বন্দী হয়ে পড়ে তাহলে য়ূরোপের তার বস্তুগত শক্তি, কয়েক শতাব্দীর প্রস্তুতি ও বিপুল বিস্তৃত সাজ-সরঞ্জামের ভিত্তিতে বিজয় লাভ ও ক্ষমতা অর্জনের অধিকার বেশি থাকবে।

মুসলিম বিশ্ব এক সুদীর্ঘ কাল এমনভাবে অতিবাহিত করেছে, তার অর্থপূর্ণ শক্তির মূল্য যে কি সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না এবং সে শক্তিকে সংরক্ষণেরও চিন্তা-ভাবনা ছিল না এবং তাকে প্রয়োজনীয় খোরাক জোগাবার দিকেও তার কোনরূপ মনোযোগ ছিল না। ফল হলো এই, তার স্রোতধারা শুকিয়ে যেতে থাকে, খুব দ্রুত বেগে তার শক্তিতে ভাটা দেখা দেয়। ঠিক সেই সময়েই মুসলিম বিশ্বকে বিভিন্ন জায়গায় ও বিভিন্ন মুহূর্তে এমন অনেক যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয় যেসব যুদ্ধে তাকে ঈমান ও একীন, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং দৃঢ়তা ও সংহতির প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হয় যা উল্লিখিত গুণাবলী ব্যতিরেকে জেতা যেত না। যখন মুসলিম শক্তিগুলোতে ধাক্কা লাগল এবং তারা এই অর্থপূর্ণ শক্তির ওপর নির্ভর করতে চাইল যার জায়গায় মুসলমানদের দিল্ সংস্থাপিত ছিল তখন সে অকস্মাৎ জানতে পারল, এই শক্তি বহুকাল হয় হারিয়ে গেছে এবং দিলের অঙ্গারধানিকা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে সময় মুসলিম বিশ্ব অনুভব করল, সে সেই রূহানী ও আধ্যাত্মিক শক্তির অসম্মান করে এবং এর প্রতি অবহেলা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করে নিজের ওপর বিরাট জুলুম করেছে। এ সময় সে মজুদ ভাণ্ডারের হিসাব পরীক্ষা করে যখন দেখল তখন দেখতে পেল সেখানে এমন কোন জিনিস নেই যা তার শূন্য স্থান পূরণ করতে পারে এবং সেই ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করতে পারে।

এই সময়পর্বে মুসলিম বিশ্বকে এমন সব যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয় যেসব যুদ্ধে ইসলামের সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রশ্ন জড়িত ছিল। তার ধারণা ছিল, এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা বিক্ষোভে ফেটে পড়বে, তারা ইসলামের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ, পবিত্র স্থানগুলোর হেফাজত এবং ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং সমগ্র মুসলিম দেশ অগ্নিবৎ জ্বলে উঠবে। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে এসব ঘটনার যেমনটি আশা করা গিয়েছিল তেমন কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। জীবনের গতি পূর্বের মতই অব্যাহত থাকে। কোথাও কোথাও কিছু আওয়াজ উঠেছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তা বুদবুদের মত মিলিয়ে যায়। এরপর দুনিয়া আবার তার নিজের কাজে লেগে যায়। সে সময় মুসলিম বিশ্বের দূরদর্শী চিন্তাবিদগণ জানতে পারলেন, মুসলমানদের ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও ইসলামী অনুভূতি দুর্বল হয়ে গেছে এবং ঈমানের অগ্নিশিখা একেবারে নিভে না গেলেও তা নিভু নিভু হয়ে গেছে। সে সময় মুসলিম বিশ্বের এই দুর্বলতার কথা অন্যেরাও জেনে যায় এবং অভ্যন্তরীণ অধঃপতিত অবস্থা ও ভগ্নদশা সম্পর্কে অনুভব করে। ফলে মুসলিম বিশ্বের ভীতিকর প্রভাব তাদের মন থেকে মিইয়ে যেতে থাকে যেই প্রভাব তার



মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ গৌরব-গাঁথা পড়ে পড়ে তাদের মন-মস্তিষ্কে গেঁথে গিয়েছিল।

আজ মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এবং তার দল ও সরকারগুলোকে যা করতে হবে তা হলো এই, মুসলমানদের হৃদয়রাজ্যে ঈমানের বীজ দ্বিতীয়বারের মত বপন করতে হবে, বপনের প্রয়াস চালাতে হবে, তাদের ধর্মীয় জোশ-জযবা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা পুনরায় সক্রিয় ও গতিশীল করতে হবে এবং প্রাথমিক যুগের ইসলামের দাওয়াতের মূলনীতি ও কর্মপন্থা মুতাবিক মুসলমানদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিতে হবে এবং আল্লাহ, তদীয় রসূল ও পারলৌকিক জীবনের আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি সমগ্র শক্তি দিয়ে পুনর্বার তাবলীগ ও তালকীন করতে হবে, শেখাতে হবে এবং প্রচার চালাতে হবে। এজন্য সে সব পন্থাই কাজে লাগাতে হবে যে সব পন্থা ইসলামের প্রথম দিককার দাঈগণ গ্রহণ করেছিলেন। অধিকন্তু সে সমস্ত উপায়-উপকরণ ও শক্তি কাজে লাগাতে হবে যা বর্তমান যুগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

কুরআন মজীদ ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাত তথা জীবন-চরিত এখনও জীবন-যিন্দেগী ও শক্তির এমনই এক উৎস যদ্দ্বারা মুসলিম বিশ্বের শুষ্ক ও মৃতপ্রায় শিরা-উপশিরায় জীবনের উষ্ণ ও তাজা রক্ত পুনরায় সঞ্চারিত হতে পারে। তার অধ্যয়ন ও প্রভাবে এই জাহিলী জগতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আবেগ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় একটি নিদ্রালু ও তন্দ্রালু জাতি একটি উৎসাহী, উদ্যমী, অস্থির ও কর্মচঞ্চল জাতিতে পরিণত হয়। এর প্রভাবে (যদি তার প্রভাব সৃষ্টির মওকা দেওয়া হয়) একবার পুনরায় ঈমান ও নিফাক, দৃঢ় প্রত্যয় ও সন্দেহ-সংশয়, সাময়িক সুযোগ-সুবিধা, কল্যাণচিন্তা ও দৃঢ় আকীদা-বিশ্বাস, সুবিধাবাদী ও সুযোগ-সন্ধানী মানসিকতা ও হক পরস্ত তথা সত্যানুসারী বিবেক, বুদ্ধিবৃত্তিক উপযোগিতা ও উপযোগিতা দাহের মধ্যে আবার তাহলে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এরপর আবার দৈহিক আরাম-আয়েশ ও মানসিক প্রশান্তি এবং দৈহিক ভোগ-বিলাস ও শহীদী মৃত্যুর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাবে। সেই বরকতময় দ্বন্দ্ব যা সকল নবী-রসূল স্ব স্ব যুগে সৃষ্টি করেছিলেন এবং যা ছাড়া হক ও বাতিলের তথা সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা এবং এই দুনিয়ার সংস্কার-সংশোধন ও বিপ্লবের কোন কাজই হতে পারে না। এই মুহূর্তে মুসলিম বিশ্বের কোণে কোণে এবং মুসলমানদের প্রতিটি ঘরে ও প্রতিটি খান্দান ও পরিবারে এমন ঈমান দীপ্ত নওজোয়ান জন্ম নেবে যাঁদের প্রশংসা কুরআন মজীদে এভাবে করা হয়েছে ঃ

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى - وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا -

"ওরা ছিল কয়েকজন যুবক, ওরা ওদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান এনেছিল এবং আমি ওদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম এবং আমি ওদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম; ওরা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বলল, আমাদের প্রতিপালক আসমানরাজি ও যমীনের প্রতিপালক; আমরা কখনোই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন ইলাহ্‌কে আহ্বান করব না; যদি করে বসি তবে তা হবে অত্যন্ত গর্হিত" (সূরা কাহ্‌ফঃ ১৩-১৪)।

তখন দুনিয়াতে আরেকবার বেলাল ও আম্মার, খাব্বাব ও খুবায়ব, সুহায়ব ও মুসআব ইবন উমায়ের, উসমান ইবনে মাযঊন ও আনাস ইব্‌ন নাদ্‌র-এর ঈমানী জোশ, আত্মোৎসর্গ ও কুরবানীর নমুনা চোখের সামনে দেখা দেবে। জান্নাতের বাতাস ও ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে প্রবাহিত ঈমানী বায়ু প্রবাহ পুনর্বার প্রবাহিত হবে এবং এক নতুন মুসলিম বিশ্বের আবির্ভাব ঘটবে যার সঙ্গে বর্তমান মুসলিম বিশ্বের কোন সম্বন্ধ নেই।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে অসুস্থতা, পেরেশানী ও অশান্তি নেই, বরং সীমাতিরিক্ত প্রশান্তি ও তৃপ্তি, দুনিয়ার যিন্দেগীর ব্যাপারে তুষ্টি এবং অবস্থার সঙ্গে সন্ধি ও সমঝোতা রয়েছে। আজ বিশ্বব্যাপী ফাসাদ, মানবতার অধঃপতন এবং পরিবেশের খারাবী তার ভেতর কোন অস্থিরতা সৃষ্টি করে না। জীবনের এই ছবিতে তার কোন জিনিস ভুল ও অজায়গায় চোখে পড়ে না। তার দৃষ্টি ব্যক্তিগত সমস্যা-সংকট ও বস্তুগত সুযোগ-সুবিধার আগে অগ্রসর হয় না। তার বর্তমান নিরুত্তাপ উদাসীনতা, নির্জীবতা ও নিষ্প্রাণতার কারণ স্রেফ এই, তার পার্শ্ব দেশ বেদনাহীন এবং তার দিল্ উত্তাপশূন্য।

طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا

تیرا مرض ہے فقط ارزو بےنیشی

অর্থঃ "প্রেমের চিকিৎসক আমাকে দেখে বলল, তোমার অসুখ আর কিছু নয়, কেবল তোমার আকাঙ্ক্ষার কণ্টকশূন্যতা।"

এজন্যই প্রয়োজন সেই বরকতময় দ্বন্দ্ব-সংঘাত পুনরায় সৃষ্টি করা এবং এই উম্মাহর শান্তি ও তৃপ্তি লণ্ডভণ্ড করা। তার মধ্যে তার আপন সত্তা ও আপন



সমস্যা-সংকট নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে (যা কেবল জাহিলী জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রতীক চিহ্ন) মানবতার ব্যথা- বেদনা ও শোক-দুঃখ, হেদায়েত ও রহমতের ভাবনা এবং পারলৌকিক জীবন ও সেই জীবনে আল্লাহ্‌র সামনে জওয়াবদিহির ভীতি সৃষ্টি করা। এই উম্মাহ্‌র জন্য তৃপ্তি ও প্রশান্তির দোআ করার মধ্যে তার কল্যাণ নেই, বরং তার কল্যাণ তো এতে নিহিত যে, তার জন্য ব্যথা-বেদনা ও অস্থিরতার দোআ করা এবং খোলাখুলি ও প্রকাশ্যে বলা,

خدا تجھے کسی طوفان سے اشنا کردے

کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں

অর্থঃ "আল্লাহ তোমাকে কোন ঝঞ্ঝা কিংবা তুফানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। কেননা তোমার সমুদ্রের তরঙ্গমালাতে অস্থিরতা নেই।"

**চেতনাবোধের প্রশিক্ষণ**

কোন জাতির জন্য সর্বাধিক বিপজ্জনক বিষয় হলো, সে জাতি সঠিক জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনাবোধ থেকে মুক্ত। এমন একটি জাতি, যে সর্বপ্রকার যোগ্যতা ও সামর্থ্যের অধিকারী এবং যে ধর্মীয় ও জাগতিক সম্পদ দ্বারা সম্পদশালী, কিন্তু সে ভাল-মন্দ ও পাপ-পুণ্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, দোস্ত-দুশমন চেনে না, পেছনের অভিজ্ঞতা থেকে ফায়দা লাভের সামর্থ্য তার ভেতর নেই, তার নেতাদের কর্মকাণ্ডের হিসাব গ্রহণ ও খতিয়ান নেবার এবং জাতীয় অপরাধীদের শাস্তি দেবার তার ভেতর সাহস নেই তারা স্বার্থপর নেতাদের মৃদু মোলায়েম ও মিষ্টি কথায় অভিভূত হয়ে যায় এবং প্রতিবার নতুন করে ধোঁকা খাওয়া ও প্রতারিত হবার জন্য তৈরি থাকে, সেই জাতি তার যাবতীয় ধর্মীয় উন্নতি-অগ্রগতি ও পার্থিব সাফল্য সত্ত্বেও আস্থাযোগ্য নয়। সেই জাতি পেশাদার, স্বার্থপর ও মুনাফিক নেতাদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়, খেলনায় পরিণত হয়, জাতির সরলতা ও চেতনাহীনতার সুযোগে তাদের যা খুশী তাই করার সুযোগ মেলে। কারণ তারা জানে এবং নিশ্চিন্ত থাকে, তাদেরকে তাদের কৃত কর্মের কখনো হিসাব দেওয়া কিংবা জওয়াবদিহি করতে হবে না।

মুসলিম দেশগুলো সম্পর্কে যদি আমরা একথা বলতে নাও চাই, তারা জাগ্রত ও সচেতন নয়, তাদের বোধ-বুদ্ধি ও চেতনাবোধ খুবই দুর্বল এবং তারা চেতনার একেবারে প্রাথমিক স্তরে অবস্থান করছে, কিন্তু আফসোসের সাথে বলতেই হয়, শুভাকাঙ্ক্ষী ও অশুভাকাঙ্ক্ষী উভয়ের সাথে তাদের আচার-ব্যবহার প্রায় একই

রকম, বরং কোন কোন সময় অশুভাকাঙ্ক্ষী ও অনিষ্ঠাবান ভণ্ড লোকেরা মুসলমানদের মধ্যে খুব বেশি প্রিয় ও বিশ্বস্ত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, "সাপের একই গর্ত থেকে মু'মিন দু'বার দংশিত হয় না।" কিন্তু মুসলিম দেশগুলোর বাসিন্দারা শত সহস্রবার দংশিত হবার জন্য প্রস্তুত থাকে। তাদের স্মৃতিশক্তি নেহায়েত দুর্বল। তারা তদের নেতা ও শাসকদের অতীত ও নিকট অতীতের ঘটনাবলী খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। তাদের ধর্মীয় ও নাগরিক চেতনা খুবই দুর্বল এবং রাজনৈতিক সচেতনতা প্রায় নেই বললেই চলে। এটাই কারণ, তারা বিজয়ী জাতিগোষ্ঠী এবং স্বার্থপর ও স্বার্থশিকারী নেতাদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয় এবং খুব সহজেই তাদেরকে ইচ্ছেমতো যেদিক খুশী ঘোরানো যায়। সরকারগুলো তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফয়সালা করতে থাকে এবং যেদিকে চায় লাঠির সাহায্যে ভেড়ার পালের মত হাঁকিয়ে নিয়ে যায়।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের জাতিগুলো তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দারিদ্র্য এবং তাদের যাবতীয় খারাবী সত্ত্বেও যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা এই পুস্তকেই বিবৃত করেছি, নাগরিক ও রাজনৈতিক চেতনার অধিকারী। তারা পরিপক্ব রাজনৈতিক জ্ঞানের শীর্ষে পৌঁছে গেছে। তারা নিজেদের লাভ-ক্ষতি চেনে এবং জানে। তারা এও জানে, কে নিষ্ঠাবান আর কে ভণ্ড মুনাফিক, কে যোগ্য আর কে অযোগ্য। এ সবের মধ্যে পার্থক্য করতেও তারা জানে। তারা তাদের নেতৃত্ব এমন সব লোকের হাতে সোপর্দ করে না যারা অযোগ্য, দুর্বল ও আত্মসাৎকারী, খেয়ানতকারী এবং যখন নিজেদের ব্যাপারগুলো কাউকে সোপর্দ করে তখন ভয়-ভীতি ও সতর্কতার সাথেই সোপর্দ করে। যখনই তাদের অযোগ্যতা ও আত্মসাতের ব্যাপার ধরা পড়ে এবং দেখতে পায়, তারা তাদের যিম্মাদারী আদায় করেছে, তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, অমনি তাদেরকে তাদের পদ থেকে, তাদের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে এবং তাদের জায়গায় এমন সব লোক নিয়ে আসে যারা পূর্বের লোকদের তুলনায় অধিকতর যোগ্য ও সেই সময়কার জন্য উপযোগী। এ সময় কোন নেতা কিংবা আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত লোকের পূর্বেকার খেদমত, গৌরবময় অতীত কিংবা কোন যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এই জাতীয় সিদ্ধান্তে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এটাই কারণ, ঐ সব জাতিগোষ্ঠী পেশাদার রাজনীতিবিদ, অযোগ্য ও আত্মসাতকারী নেতাদের হাত থেকে মুক্ত ও নিরাপদ। তাদের রাজনৈতিক নেতা ও তাদের জনপ্রতিনিধিরা অত্যন্ত সতর্ক, সাবধানী ও আমানতদার হতে বাধ্য হয়। তারা মেপে মেপে পা ফেলে। জাতির ভর্ৎসনা, জনগণের ক্রোধ, অসন্তোষ, জওয়াবদিহির ভয় ও জনমতের ক্রোধাগ্নি আপতিত হবার ভয়ে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।



মুসলিম বিশ্বের এক বিরাট বড় প্রয়োজন এবং তার এক বিরাট বড় খেদমত এই যে, উম্মাহ্‌র বিভিন্ন শ্রেণী ও জনগণের মাঝে সঠিক চেতনা সৃষ্টি করা এবং সাধারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। মনে রাখতে হবে, শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর আধিক্যের দ্বারা এটা বোঝায় না, জাতির মধ্যে চেতনাবোধও বিদ্যমান। যদিও এতে কোনই সন্দেহ নেই, সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার দ্বারা চেতনাবোধ জাগ্রত করতে বিরাট সাহায্য পাওয়া যায়, কিন্তু চেতনাবোধ সৃষ্টি করার জন্য সাধারণভাবে স্থায়ী চেষ্টা-সাধনা ও প্রয়াস চালানো আবশ্যক। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও মুসলমানদের মধ্যে যারা সংস্কারমূলক কাজ করতে চান তাদের বেশ ভালভাবে বোঝা দরকার, যেই জাতির মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনার কমতি রয়েছে সেই জাতি আস্থার যোগ্য নয়, চাই কি তাদের নিজেদের নেতাদের ওপর যতই আস্থা থাকুক এবং তারা তাদের আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে যতই চোস্ত ও তৎপর কেন না হোক, তাদের আহ্‌বানে যত বড় বিরাট কুরবানীই তারা দিক। এজন্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের চেতনাবোধ তৈরি হচ্ছে এবং দৃষ্টি যতদিন না পরিণত ও ধারণা পাকাপোক্ত হচ্ছে ততদিন এই বিপদাশংকা থেকেই যাবে, তারা অন্য কোন আহ্‌বান ও আন্দোলনের হাতিয়ারে পরিণত হবে এবং দেখতে না দেখতেই শত শত বছরের শ্রম ও সাধনাকে ব্যর্থ ও নিষ্ফল করে দেবে। যে জাতির চেতনাবোধ জাগে নি এবং যাদের মধ্যে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার ও ভাল-মন্দ বোঝার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়নি তার দৃষ্টান্ত খড়-কুটো কিংবা মাঠের মধ্যে পড়ে থাকা পাখনার মত যা বিভিন্ন দিক থেকে বাতাস এসে ইচ্ছে মত এদিক থেকে ওদিক এবং ওদিক থেকে এদিক উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

ইসলাম যদিও একটি আসমানী ধর্ম এবং এর বুনিয়াদ ওহী ও নবুওতের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সেও তার অনুসারীদের ভেতর এমন এক বিশেষ চেতনা সৃষ্টি করেছে যা সমস্ত প্রকারের চেতনার মধ্যে অধিকতর পরিপূর্ণ, বিস্তৃত ও ব্যাপক এবং অনেক বেশি গভীর। সে তার অনুসারীদের মধ্যে এক বিশেষ প্রকারের চিন্তাধারা সৃষ্টি করে যা জাহিলী চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে তার অনুসারীদেরকে একটি জাগ্রত, সচেতন ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন চেতনা প্রদান করে যা স্বীয় বিস্তৃতি ও কুদরতী স্থিতিস্থাপকতা সত্ত্বেও ঐ সব চিন্তা- চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে কারক করতে পারে না যা তার স্বীকৃত বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল খায় না এবং সে সব মৌলিক উপাদান ও অঙ্গসমূহকে হযম করতে পারে না যা তার রূহ (প্রাণসত্তা) ও মুলনীতির বিপরীত।

এই ইসলামী চেতনার একটি দৃষ্টান্ত হলো এই, ইসলামের দাওয়াত ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশিক্ষণ ও সাহচর্যের দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের মন-মস্তিষ্কে একথা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, জুলুম এক নিকৃষ্ট জিনিস এবং তা ধর্মীয় ও নৈতিক অপরাধ যা কারুর জন্যই জায়েয নয় এবং এর ওপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, একজন মুসলমানকে সকলের সঙ্গেই ইনসাফ করা উচিত, চাই সে কাছের হোক অথবা দূরের, আপন হোক অথবা পর, দোস্ত অথবা দুশমন, পরিচিত অথবা অপরিচিত। তাঁরা জাহিলীসুলভ মর্যাদাবোধ ও জাতীয়, গোত্রীয়, পারিবারিক বা বংশীয় সাম্প্রদায়িকতা থেকে চিরদিনের মতো তওবা করে নিয়েছিলেন এবং বুঝে ফেলেছিলেন, ইসলামে এই অন্ধ জাতীয়তা অথবা সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। মুসলমানের জন্য আবশ্যক, তারা সত্যের সাথী ও সহযোগী হবে, তা সত্য যে পক্ষেই থাকুক না কেন। এটা তাঁদের বদ্ধমূল আকীদা ও বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং এটা তাঁদের অস্থি-মজ্জায় মিশে গিয়েছিল, অনুপ্রবেশ করেছিল তাঁদের শিরায়-উপশিরায়।

একদিন আকস্মিকভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মুখ থেকে তাঁরা শুনতে পেলেন, "তোমাদের ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে জালেম হোক অথবা মজলুম।" যদি তাঁদের প্রশিক্ষণের ভেতর সামান্যতম ত্রুটিও থাকত এবং তাঁদের মস্তিষ্ক যদি এতটুকু বিক্ষিপ্ত ও বিস্রস্ত হত তাহলে তাঁরা চুপ করে একথা শুনতেন এবং এই কথাকে তাঁরা জাহিলী অর্থে গ্রহণ করে নিতেন যে মাফিক তাঁরা লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং সমগ্র জীবন এর ওপর আমল করার মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁরা এও জানতেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (ধর্ম সংক্রান্ত) কোন কথাই নিজের খাহিশ মাফিক বলেন না। তিনি যা বলেন বা করেন তা সরাসরি ওহী হয়ে থাকে। তাঁদের চেয়ে বেশি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী এবং তাঁর সকল কথা বিনা প্রশ্নে মেনে নেবার মত আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু তারপরও তাঁরা নিশ্চুপ থাকতে পারলেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই উক্তি তাঁদের আকীদাগত বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও উপলব্ধির সঙ্গে ছিল সাংঘর্ষিক যা ছিল তৎকর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষামালা ও প্রশিক্ষণেরই ফল-ফসল। এর দ্বারা তাঁদের ইসলামী চেতনায় আঘাত লাগল এবং তাঁদের মস্তিষ্কের আল নড়বড়ে হয়ে গেল। তাঁরা তাঁদের এই কষ্টের কথা লুকোতে পারলেন না। তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা মজলুমকে তো সাহায্য করব, কিন্তু জালেমকে সাহায্য করব কিভাবে?" এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথার ব্যাখ্যায় বললেন, জালেম ভাইকে সাহায্য হলো, তার জুলুমের হাত ধরে তাকে তার কৃত থেকে বিরত রাখা। একথা শুনতেই তাঁদের মনের যাবতীয় গিঁট খুলে গেল এবং তাঁদের ইসলামী মানস চেতনা এই বাণীকে এভাবে কবুল করে নিল যেমনটি কবুল করে একটি জানাশোনা সত্যকে। এটাই ইসলামী চেতনাবোধের কমনীয়তা ও মাধুর্য এবং ইসলামী তীক্ষ্ণ অনুভূতির সুস্পষ্ট উদাহরণ।



এর আরেকটি দৃষ্টান্ত নিন। একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি সেনাদল পাঠালেন এবং একজন সাহাবীকে তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন। অতঃপর তাদেরকে আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে তাকীদ করলেন। সেখানে একটি ঘটনায় আমীর তাদের ওপর নারায হলেন যদ্দরুন তিনি একটি আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে সকলকে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দেন। সৈনিকেরা এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করল এবং বলল, আমরা তো আগুনের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করেছিলাম। এখন কি আমরা আবার তাতেই প্রবেশ করব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘটনা আনুপূর্বিক শোনার পর সৈনিকদের নির্দেশ পালনের অস্বীকৃতিকে যথার্থ বলে সমর্থন করেন এবং বলেন, যদি সৈনিকেরা আমীরের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ত তাহলে আর কখনো তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর এই অস্বীকৃতির ভিত্তি ছিল এই, তাঁরা এই উসূলের ওপর ঈমান এনেছিলেন যে, لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق স্রষ্টার নির্দেশ অমান্য করতে হয় সৃষ্টির এমন কোন নির্দেশ মান্য করা যাবে না। (হাদীস) আনুগত্য কেবল তখনই বাধ্যতামূলক হবে যখন তা বৈধ ক্ষেত্রে হবে।

ইসলামী চেতনা ও ইসলামী প্রশিক্ষণের ফলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) কোন অন্যায় ও ভুল কথা কিংবা কাজ ও বেইনসাফী বরদাশত করতে পারতেন না আর তা যদি সমকালীন খলীফার দ্বারাও সংঘটিত হতো। যদি খলীফার মধ্যেও কখনো সীমা অতিক্রম দেখতেন তবে প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে ও ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করতে তাঁরা আদৌ ইতস্তত করতেন না। একবার খলীফা ওমর (রা) খুতবা দিতে দাঁড়িয়েছেন। এ সময় তাঁর দেহে ছিল এক জোড়া কাপড়। খুতবার শুরুতেই তিনি " লোকসকল! তোমরা শোন" বলতেই জনৈক মুসলমান উঠে বলল, "না, আমরা শুনব না।" খলীফা ওমর (রা) বললেন, "শুনবে না কেন?" মুসলমান লোকটি বলল, "আপনি তো আমাদের মাঝে একটি করে কাপড় বণ্টন করেছেন, অথচ আপনার শরীরে দেখতে পাচ্ছি এক জোড়া। খলীফা হিসেবে তো আপনাকে বেশি দেওয়া হয়নি।" ওমর (রা) বললেন, "ভাই! তাড়াহুড়ো না করে

এই মজলিসে আমারই পুত্র আবদুল্লাহ আছে, সে কি বলে তা শোন।" এই বলে তিনি আবদুল্লাহকে ডাকলেন। দ্বিতীয় ডাকে জওয়াব মিলতেই তিনি আবদুল্লাহকে সম্বোধন করে বললেন, "লুঙ্গি হিসেবে যেই কাপড়টি আমি পরিধান করেছি তা কি তোমার দেয়া নয়?" পুত্র 'হাঁ' বলে জওয়াব দিতেই মুসলমান লোকটি বলে উঠল, "হাঁ, আমীরুল মু'মিনীন! এবার আপনি বলতে পারেন। এখন আমরা শুনব।"

এই ইসলামী চেতনা ও ইসলামী প্রশিক্ষণের ফল ছিল এই, বনী উমায়্যাকে তাদের বংশীয় আধিপত্য ও রাজকীয় শাসন ক্ষমতা ধরে রাখতে বিরাট বেগ পেতে হয়েছে। ইসলামী রূহ তথা ইসলামী প্রাণসত্তা বারবার এই রাজকীয় শাসনের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করেছে, বিক্ষোভ করেছে এবং বারবার এই আরব শাহীর বিরুদ্ধে জিহাদী পতাকা তুলে ধরেছে। উমায়্যা শাসকরা ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেনি যতদিন পর্যন্ত নির্ভীক ও প্রতিবাদী কণ্ঠগুলোর বংশধারা শেষ না হয়েছে, যাঁদের ইসলামী মূলনীতির আলোকে প্রশিক্ষণ লাভ ঘটেছিল এবং যাঁরা ইসলামী খেলাফত, ইসলামী রাষ্ট্রনীতি ও শাসন ব্যবস্থাকে অন্তর-মন দিয়ে ভালবাসতেন এবং এর থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়াকেও যাঁরা বেদআত ও বিকৃতির সমার্থক মনে করতেন।

কেবল তাই নয়, বরং প্রকৃত ঘটনা হলো এই, কোন রকমের সংস্কার ও সংশোধন এবং কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব চেতনার জাগরণ ও মানসিক প্রস্তুতি ব্যতিরেকে সংঘটিত হয় না, যদিও ফরাসী বিপ্লবের আলোচনা ইসলামী দাওয়াত ও বিপ্লবের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বেয়াদবী হবে বলে মনে করি। কেননা ফরাসী বিপ্লব ছিল একটি অসম্পূর্ণ, সীমিত ও ত্রুটিপূর্ণ বিপ্লব যা আবেগপূর্ণ জোশ ও ভারসাম্যহীনতা থেকে মুক্ত ছিল না। তদ্‌সত্ত্বেও আমরা তা থেকে এই ফলগত অর্থ বের করতে পারি, যখন কোন সমাজ কিংবা দেশের চেতনা জেগে যায় এবং মানসিক গতি কোন বিশেষ দিকে মোড় নেয় তখন সেই প্লাবনকে থামিয়ে রাখা বিরাট থেকে বিরাটতর পাথর খণ্ডের পক্ষেও দুঃসাধ্য ও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফরাসী বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ যাদের মধ্যে অনেকেই বেশ ভাল মন-মানসিকতা, বিদ্যা-বুদ্ধি ও সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং যাদের দলে সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও লেখকদের এক বড় বাহিনী ছিল, এক বিশেষ উদ্দেশে ও লক্ষ্যে ফরাসী জনগণের চেতনার প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। তারা জনগণের মনে দেশের পুরনো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। পুরনো নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা ও প্রথার বিরুদ্ধে এক সাধারণ



অশান্তি, অস্থিরতা ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে দেয় এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বহির্বিশ্বের থেকে আগেই তাদের চিত্তের মাঝে ক্ষোভ, ক্রোধ, ঘৃণা ও অবজ্ঞার আগুন জ্বেলে দেয়। ফল হলো এই, সেই সময়কার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা মানুষের জন্য অসহনীয় হয়ে যায়। "স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব" প্রিয় শ্লোগানে পরিণত হয়। প্রত্যেক ফরাসী নাগরিকের এটাই ছিল তপজপের একমাত্র মন্ত্র। সেই সময় এই বিদ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটল, আবেগ-উৎসাহ ও ক্রোধের আগ্নেয়গিরি লাভা উদ্‌গিরণ করল এবং পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার প্রাসাদ-সৌধ ধুলিসাৎ হলো। যদিও এই বিপ্লবের নেতা ও পথ-নির্দেশকরা একে মানবতার জন্য খুব বেশি উপকারী বানাতে পারেন নি আর সম্ভবত এটা তাদের সামনে ছিলও না; কিন্তু তারা দেশের মধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করে দেন এবং এই বিপ্লবকে কোন শক্তিই রুখতে পারে নি। এজন্য পারেনি, এই বিপ্লবের উৎসধারা জনগণের মন ও মস্তিষ্ক থেকে উৎসারিত হয়েছিল এবং এর পেছনে ছিল জাতির সাধারণ জনমত ও জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের চেতনাবোধ এজন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

আজ য়ূরোপ যেসব জিনিসকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে এবং সে সমস্ত দুর্বলতাসহ যেগুলো নিয়ে কোন জাতিই বাঁচতে পারে না, অথচ আজ তারা কেবল বেঁচেই নেই, বরং তারা আজ নেতৃত্বের আসনে সমাসীন। আর তা হলো নাগরিক জীবনের দায়িত্বশীলতার অনুভূতি ও রাজনৈতিক চেতনা। আজ পর্যন্ত ইংরেজ ও আমেরিকানদের মধ্যে এমন লোকের উদাহরণ খুব কমই মিলবে যারা জাতীয় খেয়ানতের দায়ে অভিযুক্ত কিংবা নিজের দেশকে খুব সস্তা দামে বিক্রি করেছে অথবা রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ফাঁস করে দিচ্ছে কিংবা খারাপ ও অচল অস্ত্র ও সমরাস্ত্র ক্রয় করার দায়ে অপরাধী। এ ধরনের উদাহরণ প্রাচ্যে প্রচুর, কিন্তু য়ূরোপে খুবই কম, বলতে গেলে নেই বললেই চলে। য়ূরোপে নৈতিক ও চারিত্রিক বিকৃতি ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত। এর যিম্মাদার অবশ্য বড় থেকে বড় মিথ্যা বলতে পারে, বিভিন্ন জাতিকে ধোঁকা দিতে পারে, পৃথিবীর বড় বড় জাতিগোষ্ঠীকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিতে পারে, তাদের অস্তিত্বকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তা নিজের ব্যক্তিস্বার্থের জন্য নয়, বরং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে। এটা সুনিশ্চিত, ইসলামে এ জাতীয় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অবকাশ নেই এবং অসৎ ক্রিয়া-কর্ম চাই তা ব্যক্তির সাথে হোক অথবা দলের সাথে, চাই তা ব্যক্তিগত উস্কানিতেই ঘটুক অথবা সামাজিক ও জাতীয় উস্কানির ভিত্তিতেই সংঘটিত হোক, অপরাধ অপরাধই, অন্যায় অন্যায়ই। কিন্তু পশ্চিমারা যা-ই কিছু করে বুঝে শুনে করে, সচেতনভাবে করে এবং সুনির্দিষ্ট নৈতিক দর্শনের আওতায় করে। প্রাচ্যের

লোকেরা যা করে না বুঝে করে, অবচেতনভাবে করে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উস্কানি বশে করে।

মুসলিম দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ ও ক্ষমতাসীন শাসকবর্গের পক্ষে এমনটা অসম্ভব নয়, তারা কখনো নিজেদের নগণ্য ফায়দা, আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার স্বার্থে নিজেদের দেশকে বন্ধক দেবে কিংবা বিক্রির দলীল সম্পাদন করবে অথবা নিজের জাতিকে ছাগল-ভেড়ার মত বিক্রিই করে দেবে কিংবা নিজের জাতিকে এমন কোন যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেবে যা তার জাতির মর্জির খেলাফ, তার স্বার্থের পরিপন্থী। এর চেয়েও বেশি বিস্ময়কর কথা হলো এই, এতদ্‌সত্ত্বেও জাতি তাদের নেতৃত্বের পতাকা বহন করে চলেছে, তাদের পক্ষে শ্লোগান দিচ্ছে এবং তাদের প্রশংসায় মুখে খৈ ফোটে। এই অবস্থা এছাড়া আর কিসের প্রমাণ বহন করে যে, জাতির বিবেক মরে গেছে, তার চিন্তাশক্তি স্থবির ও নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে এবং তাদের চেতনা ভোতা হয়ে গেছে। জাতি তার চেতনাবোধ থেকে মাহরূম।

বহু মুসলিম দেশ এমন আছে যেখানে জনগণের সঙ্গে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় আচরণ করা হয়। যেখানে সাধারণ মানুষ কেবল গতর খাটার জন্য, কেবলই পরিশ্রম করবার জন্য আর ওপরতলার লোকেরা কেবল ভোগ-বিলাস আর আনন্দ-ফুর্তির জন্য বাঁচে। সেখানে প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী হয় এবং হৃদয়হীন কর্মকাণ্ড ও বিবিধ অপরাধ সংঘটিত হয়। শরীয়তের বিধানসমূহকে পদদলিত করা হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও না জনগণের মধ্যে আর না সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রকার ক্ষোভ ও ক্রোধ পরিলক্ষিত হয় আর না সাধারণ কষ্টই তারা হৃদয়ে অনুভব করে। আর এ সবই মূলত মানবীয় পৌরুষ ও ইসলামী আত্মমর্যাবোধের অভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এ অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার ইঙ্গিতবাহী।

কোন বিপ্লব ও কোন বিদ্রোহেরই কোন মুল্য নেই (বাহ্যত তা দেশ ও জাতির জন্য যত উপকারীই হোক) যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ভিত্তির মাঝে কোন দৃঢ় আকীদা-বিশ্বাস, বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনা এবং প্রশিক্ষিত ও বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না জনমত পুরোপুরি গড়ে ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রাজা-বাদশাহ কিংবা সম্রাটের নির্বাসন, কোন বিপ্লবী হুকুমত ও মন্ত্রীসভার পরিবর্তন কোন প্রকার গুরুত্ব বহন করে না এবং এর ওপর নির্ভর করা যায় না। যদি জাতির মধ্যে ঐসব কাজ ও আচার-আচরণের প্রতি ঘৃণা না থাকে তাহলে এই বিপ্লব ও পরিবর্তনের দ্বারা একজন ভুল মানুষ কিংবা ভ্রান্ত দল বা পার্টির জায়গায় আরেক ভুল মানুষ বা ভ্রান্ত দল ও পার্টি আসতে পারে এবং হতে পারে,



জাতি তা অনুভবও করতে পারবে না। এজন্যই আসলে নির্ভরযোগ্য বিষয় হলো জাতির বিবেক ও চেতনাবোধ এতখানি জাগ্রত ও সচেতন হবে যে, সে কোন ভুল জিনিস ও পাপ কর্মকে কোন অবস্থাতেই এবং কোন ব্যক্তির নিমিত্তই বরদাশ্‌ত করবে না।

এজন্য মুসলিম বিশ্বের সবচে' বড় খেদমত হলো, তার ভেতর সঠিক ও সহীহ-শুদ্ধ চেতনাবোধ সৃষ্টি করা, এমন চেতনা যা কোন রকমের জুলুম ও বেইনসাফী রদাশ্‌ত করে না, ধর্ম ও নৈতিকতার বিকৃতি সহ্য করে না, যা সহীহ-শুদ্ধ ও ভুল-ভ্রান্তি, অকপটতা ও কপটতা, দোস্ত-দুশমন তথা শত্রু-মিত্র, শান্তিকামী ও অশান্তি সৃষ্টিকারীর মধ্যে খুব সহজেই পার্থক্য করতে পারে। অপরাধী ও অন্যায়কারী যেন তার অসন্তোষ ও ক্রোধের হাত থেকে বাঁচতে না পারে এবং অকপট ও নিষ্ঠাবান মানুষ যেন তার উপযুক্ত কদর ও স্বীকৃতি পাওয়া থেকে মাহরূম না হয়। সে যেন তার সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যা-সংকট ও বিষয়াদির ক্ষেত্রে একজন বুদ্ধিমান ও পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মত গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং ফয়সালা করার সামর্থ্য রাখে। যতদিন এই চেতনাবোধের উন্মেষ না ঘটবে, কোন মুসলিম দেশ ও জাতির কর্ম-প্রেরণা, কাজের সামর্থ্য ও যোগ্যতা, ধর্মীয় আবেগ ও মযহাবী জীবনের প্রদর্শনী ও দৃশ্যাবলী খুব বেশি একটা গুরুত্ব বহন করে না।

### স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তি পূজার অবকাশ নেই

'আল্‌ফ লায়লা' নামক বিখ্যাত আরব্য উপন্যাস সেই যুগের প্রতিনিধিত্ব করে যে যুগে জীবন কেবল একজন মানুষ ও একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো যাকে খলীফা কিংবা বাদশাহ বলা হতো অথবা কয়েকজন মানুষের একটি ক্ষুদ্র দলের চারপাশকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো যাদেরকে উযীর ও শাহযাদা বলা হতো। যমীন সেই সব খোশনসীব ব্যক্তিদের মালিকানা মনে করা হতো আর জাতি বলতে বোঝাত ক্রীতদাস ও মেহনতী মানুষের দঙ্গলকে। এই মানুষটিকে তাদের ধন-সম্পদ, জমি-জিরাত, ক্ষেত-খামার ও মান-সম্ভ্রমের মালিক মনে করা হতো এবং সমগ্র জাতি ছিল মূলত সেই এক ব্যক্তির ছায়া। গোটা জীবন, তার ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাব্য-কবিতা সব তারই চারপাশে চক্রাকারে ঘুরত। যদি কেউ সেই যুগের ওপর চোখ বুলাত এবং সেই যুগের সাহিত্য পর্যালোচনা করত তাহলে সে দেখতে পেত, সেই লোকটি সেই কালের সমাজ ও সোসাইটির ওপর এভাবে কর্তৃত্ব জমিয়ে জেঁকে বসে আছে যেভাবে কোন বিরাটকায় বৃক্ষ তার ছায়ায় উদ্‌গত ছোট ছোট চারা গাছ ও লতাপাতার ওপর ডালপালা বিস্তার করে থাকে এবং বায়ু ও সূর্য তাপ প্রতিরোধ করে। ঠিক তেমনি

সমগ্র জাতি সেই একজনের মধ্যে হারিয়ে যায়। এরপর না ছিল তাদের কোন স্থায়ী ব্যক্তিত্ব, না ছিল ইচ্ছা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা, না ছিল স্বাধীনতা আর না ছিল আত্মমর্যাদাবোধের অনুভূতি।

এই ব্যক্তি তিনি হতেন যাকে কেন্দ্র করে এবং যার জন্য জীবনের চাকা চক্রাকারে আবর্তিত হতো। তার জন্য চাষী হাল বইত, তারই জন্য ব্যবসায়ী পরিশ্রম করত, তারই নিমিত্ত শিল্পী ও কারিগর তার শিল্প- নৈপুণ্য প্রদর্শন করত, তারই খাতিরে লেখক বই-পুস্তক লিখত, গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনা করত এবং কবি তার বাকশক্তির পারঙ্গমতা প্রদর্শন করত। তারই জন্য বাচ্চার জন্ম হতো এবং তার পথেই সেনাবাহিনী আক্রমণ পরিচালনা করত, এমন কি তারই খাতিরে যমীন তার ভাণ্ডার তুলে ধরত এবং সমুদ্র তার সম্পদরাজি নিক্ষেপ করত। আর জনগণ যারা মূলত এই সব সম্পদ ও প্রভাব-প্রাচুর্য, সবুজ শ্যামলিমা ও উর্বরতার কারণ হতো এবং এসবের ভিত্তি তাদের ওপর করেই হতো তারা ক্রীতদাসের মত দিন কাটাত। বাদশাহ্র দস্তরখানে এঁটোকাঁটা যা কিছু বাঁচত তারা তা পেয়েই খুশী থাকত। আর শাহী লোকজনের পক্ষ থেকে কিছু মিললে সেজন্য শোকর আদায় করত। আর যদি নাও পেত তবু ধৈর্য ধারণ করত এবং আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করত। তাদের মানবতা ও মনুষ্যত্ব মরে গেলেও তাদের আফসোস হতো না। তারা মোসাহেবী, চাটুকারিতা ও সুবিধাবাদিতার পথ ধরত।

এটা ছিল ইতিহাসের সেই আমল যখন প্রাচ্য খুব ফুলে ফেঁপে উঠেছে এবং সমাজের ওপর প্রভাব ফেলেছে। কাব্য, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি সব কিছুর ওপর প্রভাব ফেলেছে। আরবী গ্রন্থাগারগুলোর ওপরও এর গভীর প্রভাব পড়ে। আর এসব প্রভাবেরই একটি জীবন্ত এ্যালবাম হল 'আল্‌ফ লায়লা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ যা সেই যুগের ছবি এঁকেছে যখন বাগদাদের কোন খলীফা অথবা দামিশ্‌ক ও কায়রোর কোন সুলতান কিংবা বাদশাহ সব কিছু হতেন। তাঁর অবস্থানগত মর্যাদা হতো রূপকথার নায়ক এবং এর কেন্দ্রীয় চরিত্র।

এই যে যুগ যার চিত্র আঁকা হয়েছে আল্‌ফ-লায়লা-র কিসসা-কাহিনীতে এবং 'কিতাবুল আগানী'র ইতিহাস ও সাহিত্যে তা ইসলামী যুগ যেমন ছিল না, তেমনি তা যুক্তি-বুদ্ধির কষ্টিপাথরেও টেকে না। ইসলামের দৃষ্টিতেও গ্রহণযোগ্য নয় তা। জ্ঞান-বুদ্ধিও তা মানতে অস্বীকার করে। ইসলাম ছিল এই অস্বাভাবিক যুগের পতনের পয়গাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই যুগের নাম রেখেছেন জাহিলিয়াত যুগ। এ যুগকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন ও অভিশাপ দিয়েছেন। এর পতাকাবাহী ও শাসক কিসরা ও কায়সার (কাইজার)-এর পতনের সংবাদ জানিয়েছেন।



এই যুগ কোন কালে ও পৃথিবীর কোন অংশেই জীবনের যোগ্যতা ও টিকে থাকার অধিকার রাখে না। এ কেবল তখনই টিকে থাকতে পারে যখন মানুষ অবস্থার অসহায় শিকার অথবা জাগ্রত অবস্থা ও চেতনাবোধের মত সম্পদ থেকে মাহরূম হবে এবং তার প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যাবে।

এই অবস্থা জ্ঞান-বুদ্ধি বরদাশ্‌ত করতে পারে না। এমন কে আছে যে এই অবস্থা পসন্দ করতে পারে, হাতে গোণা গুটি কয়েক মানুষ উদর পূর্তি করে খাবে, পান করবে, অতিরিক্ত পান-ভোজনের ফলে পেটে বদহজম হবে, অপর দিকে হাজার হাজার মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ধুকে ধুকে জীবন দেবে? কার এ দৃশ্য ভাল লাগবে যে, একজন সম্রাট ও তার পুত্র-পরিজন ধন-সম্পদ নিয়ে পাগলের ন্যায় খেলবে, অপর দিকে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ধারণের জন্য দু' বেলা দু'মুঠো মোটা ভাত ও সতর ঢাকার জন্য এক টুকরো কাপড় জুটবে না? এ অবস্থা কে মেনে নিতে পারে, এক শ্রেণীর মানুষ যারাই সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, তারা কেবলই ফসল ফলাবে, উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বলদের মত খাটবে, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করবে, আর অপর দিকে হাতে গোণা কয়েক জন মানুষ রক্ত পানি করা ও ঘাম ঝরানো শ্রমের ফসল ভোগ করবে এবং এদের ওপর ছড়ি ঘোরাবে, অথচ ওদের মুখে তাদের জন্য কৃতজ্ঞতার সামান্য বাক্যটিও উচ্চারিত হবে না, এই মানুষগুলোর জন্য সামান্যতম সহানুভূতি ও দরদবোধও থাকবে না? এ অবস্থা কে সইতে পারে, কৃষক, শ্রমিক, কামার-কুমার, শিল্পী, জ্ঞানী-গুণীসহ সমাজের নানা স্তরের বিভিন্ন প্রকারের যোগ্যতার অধিকারী মানুষ যাদের কায়িক ও মানসিক শ্রমে ও অবদানে সমাজ ও রাষ্ট্র ধন্য ও সমৃদ্ধ, তারা সর্বদাই দুঃখ-কষ্টের ভার বইবে, নিত্য-নতুন যাতনা সইবে, অপর দিকে কিছু সংখ্যক লোক আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দেবে, মজা মারবে, ফুর্তি ওড়াবে, যারা অপব্যয় ও অপচয় ছাড়া আর কিছু জানে না, চেনে না, যারা অহরহ অন্যায় আর পাপচারের মধ্যে নিজেদেরকে আকণ্ঠ ডুবিয়ে রেখেছে, মদ পান ছাড়া যাদের আর কোন কাজ নেই? কার চোখ এই দৃশ্য দেখা পসন্দ করতে পারে, যোগ্যতাসম্পন্ন, জ্ঞান-গুণী, বিশ্বস্ত ও আমানতদার, উন্নত মস্তিষ্ক ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী লোকদের সঙ্গে অস্পৃশ্যের ন্যায় আচরণ করা হবে, পক্ষান্তরে রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীসহ শাসকবর্গের চারপাশে এমন একদল লোক ঘুর ঘুর করবে যারা প্রবঞ্চক ও বাটপার প্রকৃতির, খল স্বভাবের, মাথামুণ্ডুহীন, বিবেক বিক্রেতা, যাদের সবচে' বড় চিন্তা যেনতেন প্রকারে সম্পদ হাসিল ও প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার নিবৃত্তি, যারা এই দুনিয়াতে চাটুকারিতা ও মোসাহেবী করা এবং নির্দোষ ও নিরপরাধ লোকদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা ছাড়া

আর কিছু শেখেনি, যাদের চোখের পানি শুকিয়ে গেছে এবং চেতনা ও অনুভূতি যাদের নিঃশেষ হয়ে গেছে?

এ এক অস্বাভাবিক অবস্থা যা এক দিনের জন্যও টিকে থাকা উচিত নয়, বছরের পর বছর তো নয়ই। যদি ইতিহাসের কোন যুগে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং দীর্ঘকাল এ অবস্থা কয়েম থাকে তবে তা ছিল জাতির অলসতা, গাফিলতি ও বেপরোয়া মানসিকতারই ফল অথবা সে অবস্থা তাদের মর্জি ও পসন্দের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তাদের মাথার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং ইসলামের দুর্বলতা ও জাহিলিয়াতের শক্তির দরুন এমনটি হয়েছিল। কিন্তু যখন ইসলামের প্রভাত সূর্যের উদয় ঘটল, চেতনাবোধের উন্মেষ ঘটল এবং জাতির মধ্যে হিসাব গ্রহণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার শান সৃষ্টি হলো তখন মিথ্যার এসব প্রাসাদ তাৎক্ষণিকভাবে ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে গেল।

আজ যেসব লোক আল্‌ফ লায়লা'র জগতে বাস করছে তারা স্বপ্নের জগতে বাস করছে। তারা এমন ঘরে ডেরা গেড়েছে যা মাকড়সার জালের চাইতেও দুর্বল। তারা এমন ঘরে জীবন অতিবাহিত করছে যা সব সময় বিপদ-আপদ দ্বারা বেষ্টিত। কেউ বলতে পারে না, এর ওপর কখন কোদাল এসে পড়বে এবং কখন এর ছাদ ধসে পড়বে।

আল্‌ফ লায়লা'র যুগ সেই কবে চলে গেছে এবং তার দাবার বোর্ড কবে উল্টে গেছে। মুসলিম বিশ্বের আজ নিজেকে ধোঁকা দেওয়া উচিত নয় এবং গাড়ির সেই পায়ার সাথে নিজের ভাগ্যকে জড়ানো উচিত নয় যা ভেঙে গেছে। স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তি পূজা সেই ভোর রাতের প্রদীপের মত যার তেল ফুরিয়ে গেছে, তার সলতে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সে নিভে যাবে, তা দমকা বাতাস আসুক আর নাই আসুক।

ইসলামে এ ধরনের আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপরতার কোন সুযোগ কিংবা অবকাশ নেই। তার ভেতর ব্যক্তিগত প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা খান্দানী শ্রেষ্ঠত্ব বিস্তারের ও স্বার্থপরতার পা রাখারও জায়গা নেই যা আজ কোন কোন প্রাচ্য জাতিগোষ্ঠী ও মুসলিম দেশের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে সেই ব্যাপক বিস্তৃত ও সুসংবদ্ধ স্বার্থপরতারও কোন জায়গা নেই যা আজ য়ূরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ায় দেখা যাচ্ছে। য়ূরোপে এর রূপ ও আকৃতি একটি পার্টি ও দলের ক্ষমতা ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে এবং আমেরিকায় পুঁজিবাদের অবয়বের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত আর রাশিয়ায় তা সেই ছোট্ট দলের আকৃতিতে সামনে এসে হাজির হয় যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাসী। তা অধিকাংশ মানুষের ওপর যবরদস্তি পূর্বক জেঁকে



বসে আছে এবং কৃষক, শ্রমিক ও কয়েদীদের সঙ্গে এমন নির্মম, নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন আচরণ করে যার উদাহরণ ইতিহাসে মেলা ভার।

এই আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপরতা তার সকল আকার-আকৃতি নিয়ে নির্মূল ও নিঃশেষ হবেই। আহত মানবতা এর নির্মম প্রতিশোধ নেবেই। দুনিয়ার ভবিষ্যত ইনসাফ পসন্দ, রহম দিল, ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামের সঙ্গে জড়িত। তা স্বার্থপরতা ও আত্মসর্বস্বতা যদি আরও কিছু কালের অবকাশ পেয়েও যায় তাতেও অবস্থার হেরফের হবে না, চাই কি এর লাগাম কিছুটা ঢিলাও দেওয়া হয় এবং বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ, গোমরাহী ও সীমা লংঘনের মাঝে আরও কিছুদিন অতিবাহিত করার সুযোগ তার মিলেও যায়।

স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা তা সে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হোক অথবা খান্দানী ও পারিবারিক, দলীয় হোক অথবা শ্রেণীগত, জাতির জীবনে এক অস্বাভাবিক জিনিস যার হাত থেকে জাতিকে প্রথম সুযোগেই মুক্তি পেতে হবে। ইসলামে এর কোন স্থান নেই, স্থান নেই সেই সমাজেও যে সমাজ সাবালকত্বে ও ভালমন্দ চেনার বয়সে পৌঁছে গেছে। মুসলমানদের জন্য, আরবদের জন্য এবং তাদের নেতৃবৃন্দ ও শাসকদের জন্য এটাই ভাল হবে, তারা এর থেকে মুক্ত হবে, স্বাধীন হবে এবং তারা এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আর তা এর সাথে ডুবে মরার আগেই।

প্রাচ্যেও আজ সংকীর্ণ দৃষ্টির রাজত্ব চলছে। এরও বিদায় নেবার পালা এসে গেছে। তার সৌভাগ্য তারকা অস্তমিত হওয়া শুরু হয়ে গেছে। এটা যায়দ, আমর ও বকরের সমস্যা নয়। এটা একটা যুগের সমস্যা, যা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ একটা স্কুল অব থটের সমস্যা, যার মৃত্যু ঘণ্টা বেজে গেছে। যারা এখনও এর আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে বেঁচে রয়েছে তাদের এটা বোঝা দরকার, এই জাহাজ এখন ডুবতে বসেছে।

### শিল্প-প্রযুক্তিগত ও সামরিক প্রস্তুতি

মুসলিম বিশ্বের কাজ এখানেই শেষ হচ্ছে না। যদি তার ইসলামের পয়গাম প্রচারের আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং সে যদি দুনিয়ার নেতৃত্ব ও পথ প্রদর্শনের অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করতে চায় তাহলে তাকে বিশিষ্ট শক্তি ও প্রশিক্ষণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমরশাস্ত্রে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিতে হবে। তাকে জীবনের প্রতিটি শাখায়, প্রতিটি বিভাগে ও নিজের প্রতিটি প্রয়োজনে পাশ্চাত্যের হাত থেকে মুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে এবং তা এই পর্যায়ের হতে হবে, নিজের পরিধানের বস্ত্র ও জীবন ধারণের খাদ্যে সে যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। নিজেদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র যেন সে নিজেই তৈরি করতে পারে। নিজেদের

জীবনের যাবতীয় ব্যাপারের এন্তেজাম সে যেন নিজেই করতে পারে এবং তা যেন নিজেদের হাতেই থাকে।

নিজেদের যমীনের বুকে লুক্কায়িত খনিজ সম্পদ নিজেরাই যেন উত্তোলন করতে পারে এবং তা থেকে উপকৃত হতে পারে। নিজেদের সরকার নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের লোক দিয়েই যেন পরিচালনা করে। তার চতুর্দিকে বিশাল বিস্তৃত সমুদ্রগুলোতে তাদেরই সামুদ্রিক জাহাজ ও নৌবহর যেন বিচরণ করে। শত্রুর মুকাবিলা নিজেদের ডকইয়ার্ডে নির্মিত যুদ্ধ জাহাজ, কামান ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে করবে। তাদের আমদানীর চেয়ে রফতানী যেন বেশি হয় এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলোর কাছে ঋণ গ্রহণের জন্য যেন হাত পাততে না হয় আর তাদের কারোর পতাকাতলে যেন না যেতে হয় এবং কোন ব্লক কিংবা শিবিরে যোগ দিতে যেন বাধ্য না হয়।

যতদিন পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, রাজনীতি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী থাকবে পাশ্চাত্য তাদের রক্ত শোষণ করতে থাকবে, তাদেরই ভূখণ্ডের জীবনী-শক্তি তারা বের করে নেবে, তাদের ব্যবসা-উপকরণ ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রতিদিন মুসলিম দেশগুলোর বাজার ও পকেটগুলোতে হানা দিতে থাকবে এবং নিজেদের সরকার চালাতে, গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো পূরণ করতে, নিজেদের সেনাবাহিনীকে ট্রেনিং দিতে পাশ্চাত্যের লোকগুলোর দ্বারস্থ হতে থাকবে, সেখানকার বাণিজ্য ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি চাইতে থাকবে, তাদেরকে নিজেদের অভিভাবক, উস্তাদ, মুরুব্বী, শাসক ও সর্দার মনে করবে, তাদের নির্দেশ ও তাদের মতামত ছাড়া কোন কাজ করবে না ততদিন পর্যন্ত তারা পাশ্চাত্যের মুকাবিলা করা তো দূরের কথা, তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথাও বলতে পারবে না।

এই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-প্রযুক্তি ছিল জীবনের সেই শাখা যে সম্পর্কে মুসলিম বিশ্ব অতীতে অলসতা ও গাফিলতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল যার শাস্তি হিসেবে তাকে দীর্ঘ ও অবমাননাকর জীবনের স্বাদ ভোগ করতে হয় এবং তার ওপর পাশ্চাত্যের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় যারা পৃথিবীর বুকে ধ্বংস ও বরবাদী, হত্যা, খুন-খারাবী ও আত্মহত্যার রাজত্ব কায়েম করে। এখন আবার এই সময়ও যদি মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-প্রযুক্তির আবিষ্কার-উদ্ভাবনে ও নিজেদের ব্যাপারগুলোতে স্বাধীনতা সম্পর্কে গাফিলতির আশ্রয় নেয় এবং এবারও যদি তার দ্বারা এই ভুল সংঘটিত হয়ে যায় তাহলে দুনিয়ার ভাগ্যে দুর্ভাগ্য লিখে দেওয়া হবে এবং মানবতার পরীক্ষার মুদ্দতকাল আরও দীর্ঘ হয়ে যাবে।



## নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠন

মুসলিম বিশ্বের জন্য জরুরী হলো, শিক্ষা ব্যবস্থা এভাবে নতুন করে ঢেলে সাজানো যা হবে তার রূহ ও তার পয়গামের সঙ্গে সঙ্গতিশীল। মুসলিম বিশ্ব প্রাচীন পৃথিবীর (ইসলামের প্রথম কয়েক শতাব্দীর) ওপর তার জ্ঞানগত নেতৃত্ব কায়েম করেছিল এবং দুনিয়ার বুদ্ধিবৃত্তি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি (কালচার)-র অস্থি-মজ্জায় মিশে গিয়েছিল। সে দুনিয়ার সাহিত্য ও দর্শনের হৃৎপিণ্ডে তার বাসা বানিয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী সভ্য দুনিয়া তার বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করেছে, তার কলম দিয়ে লিখেছে এবং তারই ভাষায় লেখালেখি করেছে, গ্রন্থ প্রণয়ন করেছে। অনন্তর ইরান, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষের জ্ঞানী-গুণী লেখক যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বই-পুস্তক লিখতে চাইতেন তাহলে তা আরবী ভাষাতেই লিখতেন। কোন কোন লেখক মূল কিতাব আরবীতে লিখতেন এবং এর সংক্ষিপ্তসার ফারসী ভাষাতে লিখতেন। ইমাম গাযালী (র) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "কিমিয়াই-সা'আদত"-এর ক্ষেত্রে এটাই করেছেন। যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই আন্দোলন যা আব্বাসী শাসনামলের সূচনায় শুরু হয়েছিল, গ্রীস ও অনারব এলাকার জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং তা ইসলামী স্পিরিট ও ইসলামী চিন্তা-চেতনার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং এর মধ্যে জ্ঞানগত ও ধর্মীয় দিক দিয়ে কতিপয় ত্রুটি ও দুর্বলতা ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপন শক্তি ও সজীবতার কারণে গোটা দুনিয়ার ওপর বানের পানির মত তা ছেয়ে যায় এবং প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা এর সামনে অবশ ও বিবশ হয়ে থেকে যায়।

এরপর য়ূরোপের উন্নতি ও উত্থানের যুগ এল। সে তার প্রাচীন ব্যবস্থাকে আপন অভিজ্ঞতা ও তাত্ত্বিক সমালোচনা দ্বারা পুরাতন বর্ষপঞ্জী বানিয়ে দিল এবং সে স্থানে শিক্ষা ও পাঠ দানের নতুন ব্যবস্থা প্রণয়ন করল যা তার রূহ তথা প্রাণসত্তা, বুদ্ধিবৃত্তি ও মনস্তত্ত্বের ছিল সার্থক নমুনা। যেই শিক্ষার্থী এই শিক্ষার ও জ্ঞানগত পরিবেশ থেকে শিক্ষা সমাপনের পর বেরিয়ে আসত তার প্রতিটি শিরায় শিরায় এই স্পিরিট কাজ করত। দুনিয়া দ্বিতীয়বার এই শিক্ষা ব্যবস্থার সামনে আত্মসমর্পণ করল এবং মুসলিম বিশ্বকেও স্বাভাবিকভাবেই এর সামনে মস্তক অবনত করতে হলো যারা দীর্ঘকাল থেকে জ্ঞানগত অধঃপতন ও চিন্তার জগতে জড়তা ও স্থবিরতার শিকার ছিল এবং হীনমন্যতাবোধের কারণে নিজেদের মুক্তি কেবল য়ূরোপের অন্ধ অনুকরণের মধ্যেই নিহিত বলে মনে করত। সে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার যাবতীয় দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও কবুল করে নেয় এবং সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই আজ মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে জেঁকে বসে আছে।

এই ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি হলো, ইসলামী মনস্তত্ত্ব ও আধুনিক মনস্তত্ত্বের মধ্যে সংঘাত দেখা দিল। ইসলামী নীতি ও নৈতিকতাবোধ এবং পাশ্চাত্য নীতি-নৈতিকতাবোধের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলো। বস্তুসামগ্রী ও এর মূল্য ও মান নিরূপণের নতুন-পুরাতন নিক্তির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই ব্যবস্থার একটি ফল বের হলো, শিক্ষিত ও সভ্য শ্রেণীর মধ্যে সন্দেহ-সংশয় ও কপটতা, ধৈর্যহীনতা, জীবনের প্রতি ভালবাসা ও লোভ, বাকীর তুলনায় নগদকে অগ্রাধিকার প্রদানের মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে গেল, আর এভাবেই অপরাপর দোষ-ত্রুটিও সৃষ্টি হয়ে যায় যা পাশ্চাত্য সভ্যতার আবশ্যকীয় উপাদান।

যদি মুসলিম বিশ্বের খাহেশ থাকে, সে নতুনভাবে আবার গোড়া থেকে তার জীবন শুরু করবে এবং অন্যদের গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করবে, যদি সে বিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করতে চায় তাহলে কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বশাসিত ও স্বায়ত্তশাসিত হলেই চলবে না, তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব নিতে হবে এবং এটা খুবই জরুর আর এ খুব সহজও নয়। এ বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখার ও চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপকভাবে বই-পুস্তক রচনা করা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ময়দানে নতুনভাবে কাজ শুরু করা। এ কাজে যারা নেতৃত্ব দেবেন তারা সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে এতটাই ওয়াকিফহাল ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হবেন যা গবেষণা ও সমালোচনার স্তরে গিয়ে পৌঁছে এবং এরই সাথে সাথে ইসলামের মূল উৎস থেকে পরিপূর্ণ প্লাবিত ও ইসলামী রূহ তথা প্রাণসত্তা দ্বারা তার দিল্ ও দৃষ্টি পূর্ণ ও সমৃদ্ধ হবে। এটা সেই অভিযান যার পরিপূর্ণতা কোন দল কিংবা সংগঠনের জন্য কঠিন হবে। এ কাজ ইসলামী হুকুমতের, মুসলমানদের সরকারের। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল দল ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান কায়েম করতে হবে এবং এমন সব বিশেষজ্ঞ বাছাই করতে হবে যারা প্রতিটি বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং এমন শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস তৈরি করতে হবে যা একদিকে যেমন কুরআন-সুন্নাহ্র অটুট বিধান (محكمات) ও ধর্মের অপরিবর্তনীয় হাকীকতসম্বলিত হবে, অপর দিকে কল্যাণকর সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, এসবের বিশ্লেষণ, পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন অংশের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে হবে পরিবেষ্টনকারী। তারা মুসলিম তরুণ ও যুবকদের নিমিত্ত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে একেবারে গোড়া থেকে বিন্যস্ত করবেন যা হবে ইসলামের মূলনীতি ও ইসলামী প্রাণসত্তার বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে এমন সব জিনিস থাকবে যা হবে যুবক শ্রেণীর জন্য জরুরী, যা



দিয়ে তারা নিজেদের জীবনকে সংগঠিত করতে পারে এবং নিজেদের নিরাপত্তার হেফাজত করতে পারে। তারা পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হবে না, বরং তারা হবে আত্মনির্ভরশীল। তারা বস্তুগত ও মেধার যুদ্ধে পাশ্চাত্যের মুকাবিলায় যেন দাঁড়াতে পারে। তারা নিজেদের মাটির তলে লুক্কায়িত খনিজ সম্পদ থেকে যেন উপকৃত হতে পারে এবং নিজেদের দেশের সম্পদ কাজে লাগাতে পারে, ব্যবহারে আনতে পারে। তারা মুসলিম দেশগুলোর অর্থনীতি নতুনভাবে ঢেলে সাজাবেন এবং একে ইসলামী শিক্ষামালার আওতায় এভাবে পরিচালনা করবেন যে, সরকার পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির সংগঠনে য়ূরোপের ওপর ইসলামী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব যেন পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে এবং এর দ্বারা সেই সব অর্থনৈতিক সমস্যা ও সংকটের যেন সমাধান ঘটে যা সমাধান করতে না পেরে য়ূরোপ হাল ছেড়ে দিয়ে তার ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছে।

এই আধ্যাত্মিক, শিল্প-প্রযুক্তিগত, সামরিক প্রস্তুতি ও শিক্ষার স্বাধীনতার সাথেই মুসলিম বিশ্বের উত্থান ঘটতে পারে, নিজেদের পয়গাম পৌঁছাতে পারে এবং পৃথিবীকে সেই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে, মুক্তি দিতে পারে যা তার মাথার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। নেতৃত্ব হাসি ও খেল-তামাশার বস্তু নয়। এ খুবই গুরু-গম্ভীর বিষয়। এর জন্য প্রয়োজন সুশৃঙ্খল চেষ্টা-সাধনা, পরিপূর্ণ প্রস্তুতি, বিরাট কুরবানী এবং কঠোর কঠিন ও প্রাণান্তকর সাধনা।

## অষ্টম অধ্যায়

# আরব বিশ্বের নেতৃত্ব

### আরব বিশ্বের গুরুত্ব

বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে আরব জাহানের গুরুত্ব অপরিসীম। আরব বিশ্ব সেই সব জাতিগোষ্ঠীর লালন ক্ষেত্র ও দোলনা বিশেষ যারা মানব ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তার বুকে শক্তি ও সম্পদের এক বিপুল ভাণ্ডার সংরক্ষিত। তার আছে পেট্রোল যা আজ সামরিক ও শিল্পক্ষেত্রে সেই ভূমিকা পালন করে যেমনটি পালন করে শরীরের ক্ষেত্রে রক্ত এবং য়ূরোপ, আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যের মাঝে সংযোগ সেতু হিসেবে বিরাজ করছে।

আরব জাহান মুসলিম বিশ্বের স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড যার দিকে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় (دم بهرنا) দিক দিয়ে গোটা মুসলিম বিশ্বের গতি পরিচালিত হয়, যারা সব সময় তার আলোচনায় মুখর এবং তার প্রতি ভালবাসায় ও বিশ্বস্ততায় আপ্লুত। তার গুরুত্ব এজন্য আরও বৃদ্ধি পায়, এর পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান, আল্লাহ না করুন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের এ যেন রণক্ষেত্রে পরিণত না হয়! কেননা সেখানে শক্তিশালী বাহু আছে চিন্তা-ভাবনা করার মত, উপলব্ধি করার মত বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, যুদ্ধ করার মত শক্তিশালী দেহ আছে, আছে বড় বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ও কর্ষণযোগ্য উর্বর ভূমি।

মিসর আরব জাহানের বুকেই অবস্থিত যা উৎপদিত খাদ্যশস্যে, আয়-আমদানীতে, শ্যামল সবুজে ও উর্বরতায়, সম্পদে ও উন্নতি-অগ্রগতিতে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির ময়দানে এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত যার কোল দিয়ে নীলনদ প্রবাহিত। এখানেই আছে ফিলিস্তীন ও তার প্রতিবেশী দেশগুলো যা আবহাওয়ার শোভা-সৌন্দর্য ও দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের অপূর্ব সমাহারে ও সামরিক গুরুত্বে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

তার আছে ইরাকের মত দেশ যা আপন শৌর্যে-বীর্যে, কষ্ট সহিষ্ণুতায়, বীরত্বে, অটুট ইচ্ছাশক্তি ও মনোবলে অদ্বিতীয়। তদুপরি পেট্রোলের ভাণ্ডার হিসেবেও সে মশহূর।

এখানেই আছে আরব উপদ্বীপ (জযীরায়ে আরব) যা স্বীয় আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ও ধর্মীয় প্রভাবের দিক দিয়ে একক ও অনন্য যার হজ্জের মত বার্ষিক সমাবেশের



নজীর বিশ্বের বুকে আর নেই, যেখানকার তেল খনি সর্বাধিক পরিমাণ তেল উৎপাদন করে থাকে।

এসব জিনিসের কারণেই আরব জাহানকে পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের দৃষ্টিকেন্দ্র, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের নিমিত্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে যার প্রতিক্রিয়া হয়েছে, এসব দেশে আরব জাতীয়তাবাদ ও দেশপূজার তীব্র মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে গেছে।

### মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আরব জাহানের প্রাণ (রূহ)

একজন মুসলমান আরব জাহানকে যেই দৃষ্টিতে দেখে তার ভেতর এবং একজন য়ূরোপীয়ের দৃষ্টির মধ্যে আসমান যমীন পার্থক্য রয়েছে, বরং একজন দেশপূজারী আরব জাহানকে যে চোখে দেখে থাকে তা একজন মুসলমানের দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

একজন মুসলমান আরব জাহানকে দেখে থাকে ইসলামের লালন ক্ষেত্র হিসেবে, দোলনা হিসেবে, ইসলামের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে, বিশ্ব নেতৃত্বের মারকায হিসেবে, আলোর মিনার হিসেবে। সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মুহাম্মাদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরব জাহানের জান-প্রাণ, তার সম্মান ও গর্বের শিরোনাম এবং তার ভিত্তি-প্রস্তর। যদি এর থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আলাদা ও পৃথক করে দেওয়া হয় তাহলে যাবতীয় শক্তির ভাণ্ডার ও সম্পদের উৎস সত্ত্বেও তার অবস্থানগত মর্যাদা একটি নিষ্প্রাণ লাশ ও রঙহীন বর্ণহীন ছবির চেয়ে বেশি হবে না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামেরই বরকতময় সত্তা যদ্দরুন আরব জাহানের অস্তিত্ব লাভ ঘটেছে। এর আগে এই দুনিয়া বণ্টিত, খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত একক সমষ্টি, পরস্পরের সঙ্গে বিবদমান গোত্র, গোলাম জাতিসমষ্টি এবং যোগ্যতা ও সামর্থ্যের অপচয়কারীর আরেক নাম মাত্র ছিল। এর আকাশে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও গোমরাহীর ভরা মেঘ ছেয়ে ছিল। আরবরা কোনদিন রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হবে, এমন স্বপ্ন কস্মিনকালেও কেউ দেখেনি, দেখত না, দেখতে পারত না। এর কল্পনাও তাদের জন্য কঠিন ছিল। শাম (আজকের সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তীন ও জর্দানসহ) যা পরবর্তীকালে আরব জাহানের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অভিহিত হয়, একটি রোমান উপনিবেশ ছিল যা স্বেচ্ছাচারী স্বৈরতান্ত্রিক হুকুমত ও কঠোর একনায়কতন্ত্রের যাতাকলে শোষিত ও নিষ্পেষিত হতো। তারা তখন পর্যন্ত স্বাধীনতা ও সুবিচারের অর্থ কিংবা মর্ম কোনটাই বোঝেনি।

ইরাক ছিল কায়ানী রাজবংশের ইচ্ছা-অভিরুচি ও কামনা-বাসনার শিকার। নিত্য-নতুন ট্যাক্স ও করভারে সেখানকার সাধারণ মানুষের কোমর গিয়েছিল

বেঁকে। রোমকরা মিসরের সঙ্গে গরুর সাথে কৃত আচরণের মতই আচরণ করত। দুধ দোহন ও ফায়দা লোটার ক্ষেত্রে কোন কমতি ছিল না, কিন্তু প্রয়োজনীয় খাবার জোগাবার ক্ষেত্রে তারা বখিলী করত। এছাড়া রাজনৈতিক জোর-যবরদস্তি ও জুলুম-নিপীড়নের সাথে ধর্মীয় জোর-যবরদস্তি ও নিপীড়নও সমান তালেই চলত। এরপর হঠাৎ করেই বিভক্ত, বিক্ষিপ্ত ও নির্যাতিত পৃথিবীর বুকে ইসলামের বসন্ত সমীরণের একটি দমকা প্রবাহিত হলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। সে সময় এই আরবী বিশ্ব ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল তিনি তাদেরকে বাঁচতে সহায়তা করলেন। তাদের নাড়ির স্পন্দন স্তিমিত হতে চলেছিল, তিনি জীবন দান করলেন, নতুন আলো দিলেন, কিতাব ও হিকমতের তা'লীম দিলেন, আত্মিক পরিশুদ্ধির সবক শেখালেন। তাঁর আবির্ভাবের পর এই পৃথিবীর চেহারাটাই পাল্টে গেল। এখন আরব জাহান ইসলামের দূত। শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তাবাহক। সভ্যতা ও সংস্কৃতির পতাকাবাহী। পৃথিবীর তাবৎ জাতিগোষ্ঠীর জন্য দয়া ও করুণার পয়গাম। এখন আমরা সিরিয়ার নাম নিতে পারি। ইরাকের কথা উল্লেখ করতে পারি। আমরা মিসর নিয়েও গর্ব করতে পারি। যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম না হতেন আর যদি তাঁর পয়গাম না হ'ত, না হ'ত তাঁর দাওয়াত, তাহলে আজ যেমন সিরিয়ার কোন পাত্তা থাকত না, তেমনি ইরাকেরও কোন উল্লেখ পাওয়া যেত না। তেমনি ইতিহাসের পাতায় মিসরকেও খুঁজে পাওয়া যেত না। আরব জাহানই থাকত না। কেবল তাই নয়, দুনিয়াও সভ্যতা-ভদ্রতা, শালীনতা ও শিষ্টাচার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষ্টি-কালচার ও উন্নতি-অগ্রগতির এই পর্যায়ে এসে পৌঁছুত না। এখন যদি আরব জাতিগোষ্ঠী ও সরকারগুলোর মধ্যে কেউ ইসলাম ধর্মের হাত থেকে মুক্ত হতে চায় এবং নিজেদের মুখ পশ্চিমা দেশগুলোর দিকে ঘুরিয়ে নিতে ইচ্ছুক হয় কিংবা ইসলাম-পূর্ব প্রাচীন আরবের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চায় অথবা নিজেদের জীবন-ব্যবস্থা, রাজনীতি ও সরকার পদ্ধতিতে পশ্চিমা সংবিধান ও পাশ্চাত্যের আইন-কানুন ও বিধি-বিধান বলবৎ করতে চায়, অনুসরণ করতে আগ্রহী হয় এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের ইমাম, সর্দার, পথ-প্রদর্শক, আদর্শ ও মানদণ্ড হিসেবে মেনে নিতে না চায় তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নে'মত হিসেবে তাদের যা দিয়েছেন তা তাৎক্ষণিকভাবে তারা ফিরিয়ে দিক এবং ইসলাম-পূর্ব জাহিলী যুগে তারা ফিরে যাক যেখানে রোমক ও পারসিকদের রাজত্ব চলত, যেখানে জুলুম-নিপীড়নের বাজার ছিল গরম, যেখানে সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব চলত, যেখানে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও গোমরাহী চলত, যেখানে ছিল গাফিলতি ও নিষ্ক্রিয় জীবন, যেখানে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন অজানা অচেনা



এক কোণে এক অজ্ঞাত জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। এজন্য যে, এই শানদার ও আলোকোজ্জ্বল ইতিহাস, এই দীপ্তিমান সভ্যতা, এই সাহিত্যের সরগরম মাহফিল, এইসব আরব সাম্রাজ্য ও সরকার সে শুধুই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মুবারক আবির্ভাবের অবদান এবং তাঁরই শুভাগমনের ফল-ফসল।

## ঈমানই আরব জাহানের শক্তি

ইসলাম আরব জাহানের জাতীয়তা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার ইমাম ও নেতা আর ঈমান হলো তার শক্তির উৎস ও ভাণ্ডার যার ওপর ভরসা করে সে অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর মুকাবিলা করেছে এবং বিজয়ী হয়েছে। তার শক্তির রহস্য, তার কার্যকর অস্ত্র ও মোক্ষম হাতিয়ার কাল যা ছিল, আজও তাই আছে যা নিয়ে সে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে, নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে এবং অন্যদের পর্যন্ত নিজের পয়গাম পৌঁছুতে পারে।

আরব জাহানকে যদি কম্যুনিজম ও ইয়াহূদীবাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় কিংবা অন্য কোন শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলা করতে হয় তাহলে সে সেই সম্পদের ওপর নির্ভর করে যুদ্ধ করতে পারে না যা ব্রিটেন তাকে দেয় কিংবা আমেরিকা তাকে খয়রাত করে কিংবা পেট্রোলের বিনিময়ে সে লাভ করে। সে তার শত্রুর মুকাবিলা কেবল সেই ঈমান, সেই অর্থপূর্ণ শক্তি, সেই রূহ তথা প্রাণসত্তা ও স্পিরিটকে সাথে নিয়েই করতে পারে যেই স্পিরিটের সাথে কখনো তারা একই সঙ্গে রোম ও পারস্য সরকারকে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিল এবং জয় লাভ করেছিল। সে সেই হৃদয় নিয়ে যুদ্ধ করতে পারে না যে জীবনকে গভীরভাবে ভালবাসে এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করে। সেই শরীর নিয়ে মুকাবিলা করতে পারে না যা আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনে প্রিয় ও অভ্যস্ত। সেই বুদ্ধি-বোধ নিয়েও মুকাবিলা করতে পারে না যাতে সন্দেহ ও সংশয়ের ঘুন লেগেছে এবং যার চিন্তা-চেতনা ও কামনা-বাসনা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষরত। তাকে মনে রাখতে হবে, দুর্বল ঈমান, সন্দেহযুক্ত দিল্ ও ময়দানের সঙ্গ পরিত্যাগকারী শক্তি সাথে নিয়ে আর যা-ই হোক, যুদ্ধের ময়দান কখনো জেতা যায় না। আরবের নেতৃবৃন্দ ও আরব লীগের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, তারা আরবী ফৌজ, কৃষক, ব্যবসায়ী ও জনগণের প্রতিটি স্তরে ঈমানের বীজ বপন করুন, চারা রোপণ করুন। তাদের মধ্যে জিহাদী প্রেরণা, জান্নাতের প্রতি আগ্রহ এবং বাহ্যিক বসন-ভূষণ ও সাজ-সজ্জার প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা সৃষ্টি করুন। তাদেরকে প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা ও জীবনের কাঙ্ক্ষিত বস্তুসমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা, আল্লাহ্র পথে বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা এবং হাসিমুখে মৃত্যুকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও মৃত্যুর মুখে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ার সবক দিন।

## অশ্বারোহণ ঃ সৈনিক জীবনে এর গুরুত্ব

এ এক দুঃখজনক সত্য যে, আরব জাতিগুলো তাদের বহু সৈনিকসুলভ বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে ফেলেছে, বিশেষ করে অশ্বারোহণ তাদের জীবন থেকে একেবারে বিদায় নিয়েছে যা এক বিরাট বড় ক্ষতি এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজয় বরণ ও দুর্বলতার খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এর ফল হয়েছে এই, ঐসব জাতিগোষ্ঠীর ফৌজী স্পিরিট যা তাদের অনন্য জাতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তা খতম হয়ে গেছে। শরীর দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে গেছে। লোকে নায-নে'মতের মধ্যে জীবন যাপন করতে শুরু করেছে। ঘোড়ার স্থান দখল করেছে মোটর যান। ফলে যেই আরবীয় অশ্বের দুনিয়া জোড়া নাম তার অস্তিত্ব আজ আরব দেশগুলো থেকে মুছে যেতে বসেছে। মানুষ কুস্তি খেলা, অশ্বারোহণ, সামরিক অনুশীলন ও অন্যান্য দৈহিক ব্যায়াম ছেড়ে দিয়েছে এবং এমন সব খেলাধুলা গ্রহণ করেছে যার কোন উপকারিতা নেই। এজন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জগতে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের জন্য জরুরী হলো, আরব তরুণ ও যুবকদের মধ্যে অশ্বারোহণ, সৈনিক জীবন, অনাড়ম্বর ও সহজ সরল জীবন, স্থৈর্য ও অটুট সংকল্প ও দুঃখ-কষ্টকে ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে মুকাবিলা করার যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) অনারব দেশগুলোতে নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে লিখেছিলেন ঃ

اياكم والتنعم وزى العجم وعليكم بالشمس فانها حمام العرب وتمعددوا واخشوا شنوا واخلو لقوا واعطوا الركب اسنتها وانزوا نزوا وارموا الاغراض-

"অলস ও আরামপ্রিয় জীবন এবং অনারবীয় পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে সব সময় দূরে থাকবে, রৌদ্রে বসা ও পথ চলার অভ্যাস বজায় রাখবে। কেননা তা আরবদের হাম্মাম। সহনশীলতা, সহজ সরল জীবন, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ও মোটাসোটা কাপড় পরিধানে অভ্যস্ত থেকো। লাফিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করার অভ্যাস রাখবে। নিশানাবাজিতে হতে হবে অব্যর্থ (বাগাবী)।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

ارموا بنى اسمعيل فان اباكم كان راميا -

"হে আরবের বনূ ইসমাঈল! তোমরা তীরন্দাযীর অনুশীলন কর। আর তা এজন্য যে, তোমাদের পিতৃপুরুষ হযরত ইসমাঈল তীরন্দায ছিলেন (বুখারী)।"

অন্যত্র বলেন ঃ



الا ان القوة الرمى الا ان القوه الرمى -

"মনে রেখ, (কুরআন মজীদে যেই শক্তির প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে এবং তজ্জন্য তাকীদ দেওয়া হয়েছে) সেই শক্তি হলো তীরন্দাযী করা (মুসলিম)।"

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের এও অপরিহার্য দায়িত্ব যে, তারা এমন প্রতিটি জিনিস ও বিষয়ের মুকাবিলা করবেন যা পৌরুষ ও শৌর্য-বীর্যের প্রাণ-সত্তাকে দুর্বল করে এবং দুর্বলতা ও কাপুরুষতা সৃষ্টি করে। নগ্ন সংবাদিকতা, অশ্লীল ও খোদাদ্রোহী সাহিত্যের প্রতিরোধ করবেন যা তরুণ ও যুবকদের মধ্যে কপটতা, নির্লজ্জতা, অনাচার, পাপাচার ও যৌনতা প্রচার করছে। ঐসব পেশাদার লোকদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ফৌজী ক্যাম্পে প্রবেশ করতে দেবে না যারা মুসলিম বংশধরদের হৃদয় ও চরিত্রে অনাচার ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায় এবং অন্যায় ও অশ্লীলতাপ্রিয়তাকে কতকগুলো তুচ্ছ পয়সার বিনিময়ে খুবসূরত ও সুসজ্জিত করে পেশ করে।

ইতিহাস সাক্ষী যে, যখন কোন জাতির মধ্যে শৌর্য-বীর্য ও মানবীয় মর্যাদাবোধের পতন ঘটেছে, নারীরা তাদের নারীত্ব ও মাতৃপ্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বনি তুলেছে; পর্দাহীনতার পথ ধরেছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার কসরত চালিয়েছে, পারিবারিক জীবনের প্রতি ঘৃণা ও অলসতা বৃদ্ধি পেয়েছে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে অমনি সেই জাতির সৌভাগ্য তারকা অস্তমিত হয়ে গেছে এবং ক্রমান্বয়ে সে জাতির নাম-নিশানা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেছে, তাদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেছে। গ্রীক, রোমক ও পারসিক জাতিগোষ্ঠীর পরিণতি এই হয়েছে। আজ য়ূরোপও সে পথেই অগ্রসর হয়েছে যা তাদেরকেও উল্লিখিত পরিণতির দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আরব জাহানকে ভয় পাওয়া উচিত যেন তাদের অবস্থাও এমনটি না হয়।

## শ্রেণী বৈষম্য ও অপচয়ের মুকাবিলা

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এবং অন্যান্য আরও অনেক কারণে আরবদের মধ্যে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস, জীবনের অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতি সীমাতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান, অপচয়, ফূর্তি, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ, অহংকার ও সাজ-সজ্জার জন্য বাহুল্য খরচের অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে গেছে। এই আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্য এবং বেদেরেগ খরচের পাশাপাশি সেখানে দারিদ্র, অনাহার ও বস্ত্রের অভাবও বিদ্যমান। একজন মানুষ যখন বড় বড় আরব শহরগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকায় তখন তার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে। সে দেখতে পায় যে, একদিকে সেই সব মানুষ যাদের হাজারে বেজার নেই, প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য, বস্ত্র কোথায় রাখবে সেই

চিন্তায় ব্যস্ত, অপরদিকে তার দৃষ্টি এমন সব বেদুঈনদের ওপরও পড়ে যাদের ঘরে এক বেলার খাবার নেই, পরনে নেই লজ্জা ঢাকার মত এক খণ্ড বস্ত্র। আরব ধনিক-বণিক ও ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী যখন বায়ুবেগে ধাবমান মোটর যানে দীর্ঘ সফরে বের হয় ঠিক সে সময়ই হাড্ডিসার একদল শিশু চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় জীর্ণ শীর্ণ বস্ত্র পরিহিত, যেসব শিশু একটা পয়সার জন্য ওদের মোটরের পেছনে দৌড়ুচ্ছে।

যতদিন আরব দেশগুলোতে আকাশচুম্বী প্রাসাদ ও সর্বোত্তম মডেলের গাড়ির পাশাপাশি দীনহীন ঝুপড়ি, জীর্ণশীর্ণ বস্তি ও সংকীর্ণ পরিসরের অন্ধকারপূর্ণ কুটির চোখে পড়বে, যতদিন অনাহার ও দারিদ্রক্লিষ্ট হাড় লিকলিকে মানুষের সারি একই শহরে দৃষ্টিগোচর হবে ততদিন কম্যুনিজমের জন্য দরজা উন্মুক্ত।[১] হৈ-হাঙ্গামা, লড়াই-ঝগড়া তখন অবধারিতভাবে দেখা দেবেই। কোন প্রচার-প্রোপাগান্ডা ও শক্তি প্রয়োগের দ্বারাই তাকে রোখা যাবে না। সেখানে যদি ইসলামী জীবনাদর্শ তার সৌন্দর্য ও ভারসাম্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে আল্লাহর শাস্তি ও এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে সেখানে জুলুম ও নিপীড়নের রাজত্ব অবধারিতভাবে কায়েম হবেই।

### ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন

মুসলিম বিশ্বের মতই আরব জাহানের জন্যও জরুরী হলো, আরব দেশগুলো তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, শিল্প, কৃষি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হবে। সেখানকার বসবাসকারীরা সেই সব জিনিসই ব্যবহার করবে যা তাদের মাটিতে উৎপন্ন হয় এবং যেগুলো তাদের শিল্প ও শ্রমের ফসল। জীবনের প্রতিটি শাখা ও বিভাগে তারা পাশ্চাত্য থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হবে। নিজেদের সব রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, শিল্পজাত সামগ্রী, খাদ্য-বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, মেশিনারিজ, সামরিক যন্ত্রপাতি কোন জিনিসের জন্যই তারা যেন অন্যের কাছে হাত না পাতে এবং কোনভাবেই তাদের করুণাভিখারী ও অনুগ্রহভোজী না হয়।

এই মুহূর্তে অবস্থা হলো, আরব জাহান যদি কতকগুলো অনিবার্য অবস্থানের দরুন পাশ্চাত্যের সঙ্গে যুদ্ধে নামতেই চায় তাহলে তারা এজন্যই যুদ্ধ করতে পারবে না, তারা তাদের কাছে ঋণী ও তাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। যেই

১. মনে রাখতে হবে; যখন এ বই লেখা হয় তখন রাশিয়া ও চীনসহ বহু সংখ্যক দেশে প্রবল প্রতাপ নিয়ে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত। সে সময় একমাত্র কমুনিজমই প্রবল হুমকী হিসাবে বিরাজ করছিল। কম্যুনিজমের ব্যর্থতার পর সেই হুমকী কেটে গেছে। বর্তমানে পুঁজিবাদী বিশ্বের মোড়ল আমেরিকা বিভিন্ন মুখরোচক শ্লোগানের আড়ালে মুসলিম বিশ্বের সামনে আযাব ও গযব হিসেবে দেখা দিতে যাচ্ছে। —অনুবাদক।



কলমটি দিয়ে তারা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে সেই কলমটিও কোন পাশ্চাত্য দেশেরই তৈরী। যদি তারা মুকাবিলা করতেই চায় তবে যুদ্ধক্ষেত্রে সেই গুলিটাই ব্যবহার করবে যা পশ্চিমা দেশগুলোরই কোন না কোন কারখানাতে উৎপাদিত। আরব বিশ্বের নিমিত্ত এ এক বিরাট বড় ট্রাজেডী যে, তারা তাদের সম্পদের বিপুল ভাণ্ডার ও শক্তির উৎস থেকে ফায়দা লাভ করতে পারে না। জীবনের রক্ত তাদের উপকৃত করার পরিবর্তে তাদেরই শিরা-উপশিরা হয়ে অন্যের শরীরে গিয়ে পৌঁছে। তাদের সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ জোটে পাশ্চাত্যের এজেন্ট ও তাদেরই সামরিক অফিসারদের হাতে এবং সরকারের অপরাপর শাখা ও বিভাগও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। আরব জাহানের জন্য জরুরী হলো, তারা তাদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতিক সংগঠন, আমদানী-রফতানী, জাতীয় শিল্প, সামরিক প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি, সমরাস্ত্র তৈরির ব্যাপার সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে থাকবে। এমন সব লোকের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যারা হুকুমতের দায়িত্ব সামলাতে পারে এবং যারা সরকারী দায়িত্ব পরিপূর্ণ জ্ঞান, বিষয়গত নৈপুণ্য, সততা, আমানতদারী ও কল্যাণ কামনার সঙ্গে সম্পাদন করবেন।

### মানবতার সৌভাগ্যের নিমিত্ত আরবদের ব্যক্তিগত কুরবানী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব সে সময় হয়েছিল যখন মানবতার দুর্ভাগ্য চরম সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল। সে সময় মানবতার সংশোধনের সমস্যা ঐসব লোকের ক্ষমতার বাইরে ছিল যাদের জীবন বিলাস-ব্যসন ও প্রাচুর্যের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছিল, যাদের পরিশ্রম করবার, সইবার, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বরদাশত করার যোগ্যতা ও সামর্থ্য ছিল না এবং যাদের নিমিত্ত সার্বক্ষণিক ভোগ-বিলাস ও আমোদ-ফুর্তির উপকরণ বিদ্যমান ছিল। সে সময় মানবতাকে এমন সব লোকের দরকার ছিল যারা মানবতার খেদমতে নিজেদের ভবিষ্যত কুরবান করতে পারত এবং স্বার্থ চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের জান-মাল ও আরাম-আয়েশ এবং নিজেদের সব রকম জাগতিক স্বার্থকে বিপদের মুকাবিলায় পেশ করতে পারত। তাদের নিজেদের পেশা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা এবং যে কোন ধরনের আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপদের কোনরূপ পরওয়া ছিল না। যাদের নিজেদের বাপ-দাদা, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিষ্ঠিত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে হতাশায় পর্যবসিত করতে আদৌ কোন ইতস্তত বোধ ছিল না, ছিল না কোন প্রকার দ্বিধা কিংবা সংশয়। সালেহ আলায়হি'স-সালামকে তাঁর সম্প্রদায় যা কিছু বলেছিল সে কথাই তাঁদের সম্পর্কিত জনদের মুখে ফুঠে উঠত।

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا ـ

"হে সালেহ! এর আগে তুমি ছিলে আমাদের আশাস্থল।" (সূরা হূদঃ ৬২)

যতদিন দুনিয়ার বুকে এ ধরনের মুজাহিদ তৈরি না হবে ততদিন পর্যন্ত মানবতার স্থায়িত্ব ও মজবুতি এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ ও দাওয়াতের পক্ষে সফলতা লাভ করা সম্ভব হবে না। এ ধরনের কর্ম সম্পাদনকারী হাতে গোণা কয়েকজন মানুষ যাদেরকে দুনিয়ার বুকে বঞ্চিত ও হতভাগা মনে করা হয়, তাদের উন্নত মনোবল ও কুরবানীর আবেগদীপ্ত প্রেরণার ওপরই মানবতার কল্যাণ, সফলতা, সুখ-শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করছে। সেই হাতে গোণা কিছু লোক যারা নিজেদের জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে আল্লাহ্‌র হাজার হাজার বান্দাকে (আখেরাতের) চিরস্থায়ী মুসীবত থেকে বাঁচাবার উপলক্ষে পরিণত হন এবং দুনিয়ার এক বিরাট বড় গোষ্ঠীকে অকল্যাণ থেকে কল্যাণের দিকে টেনে নিয়ে আসেন। যদি কয়েক জন মানুষের বঞ্চনা ও ধ্বংস একটি গোটা জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য প্রাচুর্য ও সৌভাগ্যের কারণ হয় এবং সামান্য কিছু অর্থ-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির ক্ষয়-ক্ষতি যদি অসংখ্য ও অগণিত মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব কল্যাণের দরজা খুলে দেয় তাহলে একে সওদা হিসেবে সস্তাই বলতে হবে!

আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেন তখন তিনি জানতেন, রোম ও পারস্য ও দুনিয়ার অপরাপর সভ্য জাতিগুলো যাদের হাতে তৎকালীন বিশ্বের (ক্ষমতার) চাবিকাঠি ছিল, কখনোই নিজেদের আরাম-আয়েশ ও আমোদ-ফূর্তি ছাড়তে পারত না। তারা তাদের বিলাসী জীবনকে বিপদের ঠেলে দিতে পারত না। অসহায় ও দুঃস্থ মানবতার খেদমত, দাওয়াত ও জিহাদের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসীবত সইবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাদের ভেতর এমন সামর্থ্যও ছিল না, নিজেদের আড়ম্বর ও জৌলুসপূর্ণ জীবনের একটি মামুলী অংশও কুরবান করবে। তাদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না, যে নিজের কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, নিজের লোভ-লালসাকে রুখতে পারে এবং যে সভ্যতা-সংস্কৃতির আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ ও ফ্যাশনের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে যেটুকু না হলেই নয়, কেবল তার ওপর নির্ভর করে চলতে পারে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা ইসলামের পয়গাম ও নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যের জন্য এমন এক জাতিগোষ্ঠীকে নির্বাচিত করলেন যারা দাওয়াত ও জিহাদের বোঝা ওঠাতে পারত এবং ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় উজ্জীবিত ছিল, ছিল ভরপুর। এরা ছিল সেই আরব কওম, যারা ছিল শক্তিশালী, সহজ, সরল ও



অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত ও কঠোর পরিশ্রমী, যাদের ওপর কৃত্রিম সভ্যতা-সংস্কৃতির কোন আঘাতই কার্যকর হয়নি এবং দুনিয়ার চোখ ঝলসানো রঙীন চাকচিক্যের কোন যাদুই ক্রিয়া দর্শে নি। এ সমস্ত লোকই ছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবা যাঁরা হৃদয় সম্পদে সম্পদশালী, জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তায় ভরপুর এবং লৌকিকতা থেকে ছিলেন শত সহস্র যোজন দূরে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই আজীমুশশান দাওয়াত নিয়ে দাঁড়ালেন এবং তিনি কঠোর চেষ্টা-সাধনা ও প্রাণান্তকর পরিশ্রমের হক পরিপূর্ণরূপেই আদায় করেন। তিনি এই দাওয়াতকে এমন সব কিছুর ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন যা তাঁর জন্য বাধা ও প্রতিবন্ধকতার কারণ হতে পারত। তিনি কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিলেন। দুনিয়ার চিত্তাকর্ষক ও মন ভোলানো কোন কিছুই তাঁর চিত্ত বিভ্রম ঘটাতে পারে নি। এসবের কোন যাদুই তাঁর ওপর কোন ক্রিয়া করেনি। এগুলোই ছিল সেসব জিনিস যা দুনিয়ার জন্য 'সর্বোত্তম আদর্শ' (উসওয়ায়ে হাসানা) ও পথ-প্রদর্শনকারী হয়। কুরায়শ প্রতিনিধিবৃন্দ যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিল এবং সে সব জিনিসই তাঁর সামনে পেশ করেছিল যা একজন যুবকের চিত্ত বিভ্রম ঘটাতে এবং প্রবৃত্তির অধিকারী যে কোন মানুষের পরিতুষ্টি বিধান করতে পারত। যেমন ক্ষমতা ও রাজত্ব, ভোগ-বিলাস ও ধন-সম্পদ। তিনি সব কিছুকেই নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করলেন। ঠিক তেমনিভাবেই যখন তাঁর চাচা তাঁর সাথে কথা বললেন এবং চাইলেন তাঁর দাওয়াত বিস্তারে ও এতে অংশ গ্রহণে বাধা প্রদান করতে তখন তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন, "চাচাজান! আল্লাহ্‌র কসম, যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় তখনও আমি আমার এই কাজ থেকে বিরত হব না এবং আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রয়াস চালিয়ে যাব যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার এই প্রয়াসে সফলতা দান করেন এবং এই দাওয়াতকে বিজয়ী করেন অথবা এতেই আমি শেষ হয়ে যাই।" এই চেষ্টা-সাধনা ও ত্যাগ পার্থিব লাভ ও স্বার্থের সঙ্গে ছিল সম্পর্কহীন এবং আনন্দপূর্ণ জীবনের মুকাবিলায় কষ্টকর ও যাতনাপূর্ণ যিন্দেগীকে অগ্রাধিকার প্রদান দাওয়াত গ্রহণকারীদের জন্য চিরদিনের জন্য একটি নমুনা ও আদর্শে পরিণত হয়। তিনি এই ধারায় নিজের জন্য আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দরজা বন্ধ করে দেন। কেবল নিজের জন্যই নয়, বরং নিজের গোটা পরিবার-পরিজন, গৃহবাসী ও আত্মীয়-এগানার জন্যও আরাম-আয়েশ ও বিলাসী জীবনের মওকাগুলো থেকে উপকৃত হবার সুযোগ রাখেন নি। সে সব লোক যাঁরা ছিলেন তাঁর সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়জন, জীবনের আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে তাঁদেরই অংশ ছিল সবচে' কম, অথচ জিহাদের ময়দানে ও কুরবানীর ক্ষেত্রে তাঁদেরই রাখা হয়েছিল সবার আগে।

যখন তিনি কোন জিনিস নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে চাইতেন তখন তার সূচনাও করতেন নিজের গোত্র ও নিজের লোকদের দ্বারাই। যখন কাউকে তার প্রাপ্য অধিকার ও হক দিতে চাইতেন কিংবা কাউকে উপকৃত করতে চাইতেন তখন দূরের লোকদের থেকেই তা শুরু করতেন। এতে করে অনেক সময় তাঁর নিজের আত্মীয়-স্বজন ও গোত্রের লোকেরাই এ থেকে মাহরূম হয়ে যেত। যখন তিনি সূদী কায়-কারবার চিরতরে বন্ধ করার ইচ্ছা করলেন তখন সর্বপ্রথম তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কারবার বন্ধ করলেন এবং তাঁর সূদী কারবারের ভিত্তি উপড়ে দিলেন। এভাবেই জাহিলী যুগের প্রতিশোধ গ্রহণ ও দাবির প্রশ্ন যখন বাতিল করতে চাইলেন তখন রবী'আ ইবনে হারিছ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের রক্তের দাবি সর্বপ্রথম বাতিল করলেন। যাকাতের বিধান কার্যকর করতে গিয়ে (যা ছিল আর্থিক মুনাফা আহরণের এক বিরাট বড় মাধ্যম এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকার মত বিষয়) সর্বপ্রথম নিজের গোত্র বনী হাশিমের জন্য কিয়ামত অবধি যাকাত গ্রহণকে নিষিদ্ধ করলেন। মক্কা বিজয়ের দিন যখন আলী ইবনে আবী তালিব (রা) তাঁর কাছে বনী হাশিমের জন্য যমযমের পানির সাথে সাথে কা'বার চাবিরও অধিকার দাবি করলেন তখন তিনি তা প্রবলভাবে অস্বীকার করলেন এবং উছমান ইবনে তালহা (রা)-কে ডেকে কা'বার চাবি তাঁর হাতে তুলে দিলেন এবং বললেন, উছমান! দেখ, এই যে তোমাদের চাবি! নিয়ে নাও তুমি। আজ প্রতিদান ও সদয় ব্যবহারের দিন। আজ থেকে এটা তোমাদের পরিবারে সব সময় থাকবে, তোমাদের থেকে কেউ তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, কোন জালিম ছিনিয়ে নিতে চাইলে ভিন্ন কথা। তিনি তাঁর সহধর্মিনীদের যুহ্দ ও অল্পে তুষ্টি এখতিয়ারের এবং দুঃখ-কষ্টপূর্ণ ও স্বাদহীন স্ফূর্তিহীন জীবন অতিবাহিত করায় উৎসাহিত করেন এবং পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন, যদি তোমরা অনাহার ও দারিদ্রক্লিষ্ট জীবন যাপনের জন্য তৈরী থাক তাহলে আমার সান্নিধ্যে অবস্থান করতে পার। অন্যথায় প্রাচুর্য ও আরাম-আয়েশ চাইলে আমার সঙ্গে সহাবস্থান সম্ভব নয়। এ সময় তিনি আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ তাঁদের সামনে পাঠ করে শোনান!

يَٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ـ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও এর ভূষণ কামনা কর, তবে এস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা



আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখিরাত কামনা কর তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন" (সূরা আহযাব, ১৮-১৯ আয়াত)।

কিন্তু এই নির্বাচনে তাঁর গৃহবাসীরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকেই এখতিয়ার করেছেন। ঠিক তেমনি হযরত ফাতেমা (রা) যখন শুনতে পেলেন, তাঁর (আব্বার) কাছে কিছু গোলাম ও খাদেম এসেছে আর সে সময় যাতায় যব-গম পিষতে গিয়ে তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর আব্বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে গিয়ে বললেন, আব্বা! আমাকে একটি খাদেম দিন যাতে করে আমার কষ্টের লাঘব হয় এবং আমি একটু আরাম পাই। তিনি তাঁকে তসবীহ ও তাহমীদ (তসবীহে ফাতেমী) পাঠের উপদেশ দিলেন এবং বললেন, এ তোমার জন্য খাদেমের থেকে অনেক ভাল হবে। আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের সঙ্গে এ রকমই ছিল তাঁর আচরণ। এক্ষেত্রে যিনি যত ঘনিষ্ঠ ও নিকটজন হতেন ঠিক সেই পরিমাণ তার দায়িত্বও বেড়ে যেত।

মক্কার লোকেরা যখন ঈমান আনল তখন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাদের ব্যবসা মন্দার শিকার হয়, এমন কি অনেকে তাদের পুঁজিটুকুও খুইয়ে বসে যা ছিল তাদের সারা জীবনের সঞ্চয়। তাদের মধ্যে এমন লোকও ঈমান এনেছিল যারা আরাম-আয়েশ ও সাজ-সজ্জার উপকরণও শেষ করে ফেলেছিল, অথচ এর আগে তাদের বৈশিষ্ট্যসূচক অবস্থাই ছিল এমন, তারা আরাম-আয়েশ ও প্রাচুর্যপ্রিয় ছিল। তেমনি এমন লোকও অনেকে ছিলেন যাঁদের ইসলামের প্রচার-প্রসারে এবং এ পথের বাধা-প্রতিবন্ধকতা দূর করতে গিয়ে ব্যবসাই শেষ হয়ে যায়। আবার অনেকে পিতৃ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়।

ঠিক তেমনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করেন এবং আনসাররা তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করল তখন এর প্রভাব তাদের ক্ষেত-খামার ও কৃষি কর্মের ওপর পড়ে। এ সময় যখন তারা এ সবের দেখাশোনা ও পরিচর্যার জন্য সময় চাইল তখন তাদের এতে অনুমতি মেলেনি। আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়ঃ

وَاَنْفِقُوْافِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ـ

"আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজের হাতে নিজেদের ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ কর না" (সূরা বাকারা, ১৯৫ আয়াত)।

একই অবস্থা হয়েছিল আরব ও সেই সব লোকের যারা এই আহবানে প্রভাবিত হয়েছিল এবং এর অনুসরণে কোমর বেঁধে লেগেছিল। অনন্তর জিহাদের কষ্ট-কাঠিন্য ও জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকারে তাদের হিস্যা এত বেশি ছিল যে,

দুনিয়ার বুকে এত বেশি হিস্যা আর কারো ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্বোধন করে বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ۔

“বলুন, “তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না” (সূরা তাওবাঃ ২৪)।

অন্যত্র বলেন ঃ

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ط

“মদীনাবাসী ও ওদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত নয় আল্লাহ্‌র রসূলের সহগামী না হয়ে পেছনে থেকে যাওয়া এবং তার জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা” (সূরা তাওবাঃ ১২০)।

আর তা এজন্যে যে, মানবীয় সৌভাগ্যের প্রাসাদ ঐসব লোকদের কুরবানীর খুঁটির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এরই অপেক্ষা করা হচ্ছিল যে, এই সব মুহাজির ও আনসার নিজেদের অস্তিত্ব নিঃশেষ করে দিয়ে মানবতার সজীবতা এবং জাতিগোষ্ঠীসমূহের হেদায়েত ও কল্যাণের ফয়সালা লাভ করে নেবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط

“আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা ও ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব” (সূরা বাকারা, ১৫৫ আয়াত)।



অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ۔

“মানুষ কি মনে করে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ একথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না করেই অব্যাহতি দেওয়া হবে?” (সূরা আনকাবূত, ২ আয়াত)।

এখন আরবরা যদি এই সম্মাননা গ্রহণ করতে ইতস্তত করত এবং মানবতার এই মহান খেদমতে দ্বিধার আশ্রয় নিত তাহলে দুর্ভাগ্য ও বিশ্বব্যাপী অরাজকতার মুদ্দত আরও দীর্ঘায়িত হতো এবং জাহিলিয়াতের ঘনঘোর অন্ধকার বহাল তবিয়তেই দুনিয়ার বুকে ছেয়ে থাকত। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ۔

“যদি তোমরা তা না কর তবে দেশে ফেতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে” (সূরা আনফাল, ৭৩ আয়াত)।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে দুনিয়া এক দো-মাথা পথের ওপর দাঁড়িয়েছিল। সে পথ দু'টোই ছিল। তার একটা হলো, আরবের লোকেরা তাদের জানমাল তথা জীবন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়তম বস্তুকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হবে এবং দুনিয়ার সর্বপ্রকার উৎসাহবর্ধক ও আকর্ষণীয় জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সামাজিক কল্যাণের পথে নিজেদের সব পুঁজি কুরবান করে দেবে। এর ফলে দুনিয়ার ভাগ্যে সৌভাগ্য লাভ ঘটত এবং মানবতার ভাগ্যের পরিবর্তন হতো, জান্নাতের প্রতি আগ্রহ ঠেলে উঠত, ঈমানের প্রভাত সমীরণ প্রবাহিত হতো অথবা তারা নিজেদের কামনা-বাসনা, কাঙ্ক্ষিত আনন্দদায়ক বস্তুসামগ্রী, নিজেদের ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসকে মানবতার সুখ-সৌভাগ্যের ও কল্যাণের মুকাবিলায় অগ্রাধিকার দিত। এমতাবস্থায় দুনিয়া গোমরাহী, পথভ্রষ্টতায় ও দুর্ভাগ্যের পচা ডোবায় তলিয়ে যেত এবং গাফিলতি ও মাতলামীর মধ্যে পড়ে থাকত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষের কল্যাণ চাচ্ছিলেন। এজন্যই তিনি আরবদের মধ্যে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করলেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে ঈমানের রূহ সৃষ্টি করলেন এবং তাদেরকে আখেরাত ও এর অপরিমেয় সওয়াবের উৎসাহ দিলেন। এর ফলে তারা নিজেদেরকে মানবতার নিমিত্ত উৎসর্গ করবার জন্য পেশ করল এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সওয়াবের প্রতিশ্রুতি ও মানব জাতির সুখ-সৌভাগ্যের আশায় তারা দুনিয়ার যাবতীয় আরাম-আয়েশ থেকে চোখ বন্ধ করে নিজেদের জানমাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় ঠেলে দিল এবং সে সমস্ত জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল যেগুলোর দিকে মানুষ লোভাতুর দৃষ্টি

নিক্ষেপ করত। তাঁরা পরিপূর্ণ একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে নিজেদের জান-মাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দিল এবং মেহনত করল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করলেন। "আর আল্লাহ সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে ভালবাসেন।"

আজ দুনিয়া পেছনে হটতে হটতে আবার সেই একই জায়গায় গিয়ে উপনীত হয়েছে যেখানে সে খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ছিল। আজ আবার দুনিয়া সেই একই রূপ দোমাথা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে যেই দোমাথা পথের ওপর রসূলুল্লাহ (সা)-র আবির্ভাবের সময় ছিল। আজ আবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, আরব জাতি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে) আবার ময়দানে নেমে আসবে এবং পুনরায় দুনিয়ার ভাগ্য বদলাবার জন্য জীবনের বাজী ধরবে এবং নিজেদের যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও সম্পদ-সামর্থ্য, দুনিয়ার নে'মত, উন্নতি ও প্রাণ-প্রাচুর্যের অন্তহীন সম্ভাবনা ও সুখ-সৌভাগ্যের উপকরণরাজিকে বিপদের মাঝে ঠেলে দেবে যাতে দুনিয়া সেই বিপদ-মুসীবত থেকে নাজাত পায় যেই বিপদ-মুসীবতে সে গ্রেফতার এবং পৃথিবীর চিত্র পাল্টে যায়।

দ্বিতীয় সূরত হলো, আরবের লোকেরা নিয়মমাফিক নিজেদের নগণ্য স্বার্থ, ব্যক্তিগত উন্নতি-সমুন্নতি, পদ ও পদমর্যাদা, বেতন বৃদ্ধি, আয়-আমদানী বৃদ্ধি ও কায়-কারবারের শ্রীবৃদ্ধির চিন্তায় ডুবে থাকুক এবং আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের উপকরণাদির সরবরাহ নিয়ে মশগুল থাকুক। এর ফল হবে এই, দুনিয়া সেই বিষাক্ত ও পুঁতিগন্ধময় পুকুরে সাঁতার কাটতে থাকবে যার মাঝে সে শত শত বছর ধরে ধ্বংসের জাবর কাটছে। যদি ভাল ভাল মেধাবী ও তীক্ষ্ণধী আরব যুবকেরা বড় বড় নগর-বন্দরে প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে বসে থাকে, যদি তাদের জীবনের লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু হয় কেবল বস্তু ও পেট, এছাড়া যদি আর কোন চিন্তা-ভাবনাই তাদের না থাকে, যদি তাদের সকল চেষ্টা-সাধনা কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন ও প্রচলিত দায়মুক্ত যিন্দেগীর চারপাশে কলুর বলদের মত কেন্দ্রীভূত হয়, তবে এমত অবস্থায় মানবীয় সৌভাগ্যের আশা করাটাও দুরূহ ও কষ্টকর। কোন কোন জাহিলী সম্প্রদায়ের যুবক তো এদের চেয়ে অনেক বেশি উদ্যমী ছিল এবং তাদের মন-মানস এদের তুলনায় অনেক বেশি সমুন্নত ছিল যারা নিজেদের পসন্দনীয় লক্ষ্যের পথে নিজেদের যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, এমন কি নিজেদের ভবিষ্যত পর্যন্ত কুরবান করে দিয়েছে। জাহিলী যুগের কবি ইমরুল কায়েস এদের তুলনায় অনেক বেশি হিম্মতের অধিকারী ছিল। সে বলতঃ



ولوانى اسعى لادنى معيشتة-
كفانى ولم اطلب قليل من المال
ولكنما اسعى لمجد موتل-
وقد يدرك المجد الموتل امثالى-

"আমি যদি সাধারণ জীবনের জন্য চেষ্টা করতাম তাহলে অল্প সম্পদই আমার জন্য যথেষ্ট হত এবং সেজন্য এত কঠোর কঠিন প্রাণান্তকর পরিশ্রমের প্রয়োজন হত না।

"কিন্তু আমি তো এমনতরো সম্মান ও মর্যাদাপ্রার্থী যার গোড়া অত্যন্ত মজবুত। আর আমার মতো লোকেরাই এমনতরো মর্যাদা লাভ করে থাকে।"

দুনিয়ার সৌভাগ্য ও সফলতার মনযিল অবধি পৌঁছুবার জন্য জরুরী হল, মুসলিম তরুণ ও যুবকেরা নিজেদের কুরবানী দ্বারা একটি সেতু নির্মাণ করবে। সেই সেতু পার হয়ে দুনিয়া সর্বোত্তম জীবনের মনযিল পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে। মাটি তার উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য সারের মুখাপেক্ষী। কিন্তু মানবতার যমীনের সার যা দিয়ে ইসলামের ক্ষেত-খামার শস্য-শ্যামল হতে পারে তাহল সেই ব্যক্তিগত ও একক কামনা-বাসনা যা মুসলিম তরুণ ও যুবকেরা ইসলামের প্রাণ-প্রাচুর্য বৃদ্ধি এবং আল্লাহর যমীনে শান্তি ও নিরাপত্তার বিস্তার ঘটাবার জন্য কুরবান করবে। আজ মানবতার ঊষর ও অনুর্বর ভূমি সার চায়। এই সার হল আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নানা মওকা, ব্যক্তিগত উন্নতির সমূহ সম্ভাবনা ও বিলাস উপকরণ যেগুলোকে মুসলমানেরা বিশেষ করে আরব জাতিগুলো উৎসর্গ করার অভিপ্রায় গ্রহণ করুক। কয়েকজন মানুষের জীবনপণ চেষ্টা-সাধনা ও তাদের কুরবানীর দ্বারা যদি এই মানবীয় শস্য আগুনের পথ থেকে বেরিয়ে এসে শান্তি সুখের জান্নাতের পথ ধরতে পারে তাহলে এ হবে বড় সস্তা ব্যবসা। এজন্য যেই নে'মত জুটবে তা হবে খুবই মুল্যবান ও দুর্লভ সম্পদ এবং এজন্য যাই কিছুই কুরবান করতে হোক তা হবে এর তুলনায় খুবই মামুলী।

اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں
اك جاں كا زياں ہے سواب ازياں نہيں

মুসলিম বিশ্ব আরব জাহানের দিকে আশা-ভরসা নিয়ে তাকিয়ে আছে। আরব জাহান আপন বৈশিষ্ট্য, অবস্থানগত সুবিধা ও রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়ে ইসলামের দাওয়াতের যিম্মাদারী কাঁধে তুলে নেবার হকদার। তারা মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিক এবং পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পরই কেবল তারা য়ূরোপের (বর্তমানে আমেরিকা —অনুবাদক) চোখে চোখ রেখে কথা বলুক এবং নিজেদের ঈমান ও দাওয়াতের শক্তি এবং আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা করে তাদের ওপর বিজয় লাভ করুক। অতঃপর দুনিয়াকে মন্দ থেকে

ভালোর দিকে, ধ্বংস ও বরবাদী থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে নিয়ে আসুক ঠিক সেভাবে যেভাবে মুসলিম দূত ইয়ায্‌দাগির্দ-এর ভরা দরবারে বলেছিল ঃ

"মানুষের গোলামী ও দাসত্ব থেকে বের করে একক আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে, দুনিয়ার সংকীর্ণ কাল কুঠরী থেকে বের করে ধর্মের বিশাল বিস্তৃত অঙ্গনে এবং ধর্মের নামে কৃত জুলুম ও বেইনসাফী থেকে মুক্ত করে ইসলামের ন্যায় ও সুবিচারপূর্ণ জীবনে টেনে নিতে আমাদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছে।"

সমগ্র মানব বিশ্ব আজ মুসলিম বিশ্বের দিকে মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা হিসেবে তাকিয়ে দেখছে আর মুসলিম বিশ্ব আরব জাহানের দিকে তাদের লীডার ও রাহবার হিসেবে চোখ তুলে চেয়ে আছে। মুসলিম বিশ্ব কি সমগ্র মানব জগতের আশা-ভরসা পূরণ করতে পারে এবং এবং আরব জাহান কি মুসলিম বিশ্বের প্রশ্নের জওয়াব দিতে পারে? দীর্ঘকাল থেকে নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানবতা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত দুনিয়া ইকবালের ব্যথাপূর্ণ ও দরদ ভরা কণ্ঠে মুসলমানদের কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে। তার আজও নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যেই নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাপূর্ণ হাতগুলো কা'বা নির্মাণ করেছিল সেই হাতগুলোই দুনিয়াকে নতুন করে গড়ার দায়িত্ব বহন করতে পারে।

তাঁর আহবান হলোঃ

কা'বার নির্মাতা তুমি ঘুম থেকে জেগে ওঠো ফের<br>
হাতে তুলে নাও ফের দায়িত্ব গড়া এ বিশ্বের।

লখনৌর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম নদওয়াতুল-উলামা-এর রেকটর, ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম মুসলিম পার্সোন্যাল ল' বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যই এক বিরাট নেয়ামত ছিলেন। তাঁর বেশ কটি বই ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। একাধিকবার তিনি বাংলাদেশ সফরও করেছেন। তাঁর আত্মজীবিনীমূলক গ্রন্থ এ পর্যন্ত ৭ খন্ডে প্রকাশিত 'কারওয়ানে যিন্দেগী' শুধু তাঁর আত্মজীবনীমূলক নয়, এটা সমসাময়িক বিশ্বের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তির এক অপূর্ব আলেখ্যও বটে। তাঁর রচনায় আল্লামা শিবলীর অনবদ্যতা, আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সূক্ষ্মদর্শিতা, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানীর সতর্কতা, মাওলানা আশরাফ আলীর থানবীর তাক্ওয়া, সর্বোপরি তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র)-এর দরদ প্রতিফলিত হয়েছে। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (র), মাওলানা মনযূর নোমানী (র), ও রঈসুত-তাবলীগ মাওলানা ইউসুফ (র)-এর অনেক মুল্যবান গ্রন্থে তাঁর লিখিত সারগর্ভ ভূমিকাগুলো পড়বার মতো। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (র) এবং মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (র)-এর খলীফা। বিগত হিজরী ১৪২১ সনের ২২ শে রমযান জুম'আর পূর্বে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াতরত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। রায়বেরেলীর পারিবারিক কবরস্থানে রওযায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ্য় তাঁকে দাফন করা হয়।